সুবোধ ঘোষ

ঝিনুক কুড়িয়ে মুক্তো

অপ্রকাশিত রচনাসম্ভার

মডার্ন কলাম
১০ / এ, টেমার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

☐ প্রথম প্রকাশ ঃ এপ্রিল ১৯৬৩

☐ প্রকাশিকা ঃ লতিকা সাহা। মডার্ন কলাম। ১০/২এ, টেমার লেন, কলকাতা-৯

☐ মুদ্রাকর ঃ অনিল কুমার ঘোষ। নিউ ঘোষ প্রেস। ৪/১ই, বিডন রো, কলকাতা-৬

☐ প্রচ্ছদ ঃ অনুপ রায়
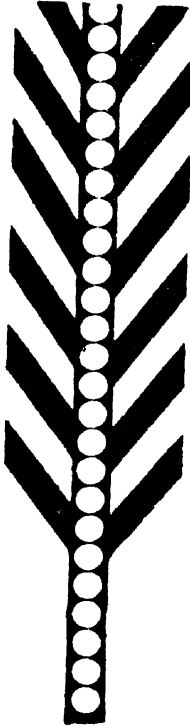
স্মৃতিমন্থন

সেদিনের আলোছায়া ১১

উল্লেখযোগ্য দিনলিপি

দিনলিপি ২৯

পশু : প্রেম : প্রকৃতি

তিনপাহাড়ীর বুড়ো বট ৭৫

সিমারিয়ার বনবালা ৮১

একজন দ্বিতীয় জনমেজয় ৯২

মিঠুয়া জঙ্গলের সবই মিষ্টি ১০৩

শ্রীমতী নিনা ভরদ্বাজ ও হরিণী ১১৭

মধুগঞ্জের স্মৃতি ১৩২

জগমোতির পাহাড়ী ময়না ১৪৬

জগনপুরের দীপালি রায় ১৬১

ডায়েনা ও মালতী ১৮২

হরেন বাবুর হরিণী মেয়ে ১৯৯

□ স্মৃতিমন্থন □
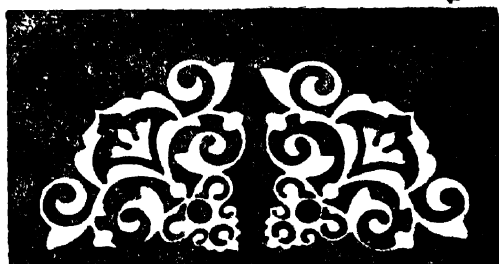
সেদিনের আলোছায়া

লোকের কাছে আজ আমার পরিচয় এই যে, আমি একজন লেখক। কিন্তু লেখক হওয়ার জন্য আমার জীবনে কোন আকাঙ্ক্ষার তাগিদ কোনদিনও ছিল না। আজ থেকে পঁয়ত্রিশ বছর আগে, যখন আমার বয়স ত্রিশ-একত্রিশ, তখন আমি প্রথম একটি গল্প লিখেছিলাম। সেই গল্প পত্রিকাতে প্রকাশিতও হয়েছিল। তার আগে আমি কোনদিন গল্প লিখতে চেষ্টা করিনি। হঠাৎ দরকার হয়েছিল, তাই হঠাৎ লিখে ফেলেছিলাম। এছাড়া আমার গল্প লেখার ঘটনা অন্য কোন কার্য্য-কারণ সম্বন্ধের ক্রিয়াফল নয়। ঘটনাটা বস্তুত আকস্মিক, কোন অনুশীলিত প্রয়াসের পরিণাম নয়। মাঝে মাঝে ব্যক্তিগত দরকারে বাংলা ভাষায় চিঠি-পত্র লিখতে হতো; এছাড়া বাংলা-লেখার কোন চেষ্টা ও চর্চার অভিজ্ঞতা আমার ছিল না? সদাগরী অফিসের কেরানী হিসাবে ইংরেজী ভাষায় অনেক কারবারী চিঠি অবশ্য লিখতে হয়েছে। বলা বাহুল্য, এ ধরনের বাংলা ও ইংরেজী চিঠি লেখবার সামান্য সাধারণ বৃত্তির মধ্যে ভাষার ও লেখার কোন সৌকর্যের ছায়াও ছিল না, সুযোগও ছিল না। হাজার হাজার সাধারণ মানুষের হাতের কলমের যে অভিজ্ঞতা হয়ে থাকে, আমার অভিজ্ঞতা তার চেয়ে বেশী কিছু ছিল না। তাই আজ থেকে পঁয়ত্রিশ বছর আগে প্রথম একটি গল্প লিখে আমি নিজেই প্রথম বুঝতে পেরেছিলাম এবং বিস্মিত হয়েছিলাম যে, আমি সেই লেখাও লিখতে পারি, যাকে সাহিত্যের রূপ ও রীতির অনুমোদিত লেখা বলে স্বীকার করা হয়ে থাকে। আমার প্রথম লেখা ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে একটি ছোট নিবন্ধ। দ্বিতীয় লেখা, একটি গল্প; নাম 'অযান্ত্রিক'। পাঠক ও সমালোচক অনেকেরই এই প্রশংসার গুঞ্জন শোনা গেল, 'অযান্ত্রিক' গল্পে বিলক্ষণ অভিনবতার স্বাদ আছে। আমার লেখা দ্বিতীয় গল্পটির নাম 'ফসিল'। 'ফসিল' গল্প প্রকাশিত হবার পর পাঠকের প্রশংসার কলরোল শোনা গেল। আনন্দবাজার পত্রিকার বার্ষিক সংখ্যায় 'অযান্ত্রিক' প্রকাশিত হয়েছিল। 'অগ্রণী' নামের একটি মাসিক পত্রিকায় 'ফসিল' প্রকাশিত হয়েছিল। কয়েকটি পত্রিকায় 'ফসিল' গল্পটিকে উদ্ধৃত করা হয়েছিল। গণনাট্যের ব্রতী তরুণদল ফসিল গল্পটিকে নাটকরূপে প্রচারিত করে ও 'অঞ্জনগড়' নাম দিয়ে

অভিনীত করলেন। সেই অভিনয় আমি দেখিনি। শুনেছি ওভারটুন হলে 'অঞ্জনগড়' নাটকের উদ্বোধন করেছিলেন প্রবীণ সুধী শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত। লেখক হিসাবে আমার সেদিনের বিস্ময়ের স্মৃতি আজ অনেকটা অস্পষ্ট হয়ে গেলেও একেবারে মুছে যায়নি। পাঠক জনের পরিতৃপ্ত মনের বিপুল সমাদরের হর্ষে ফসিল গল্পের যে সুখ্যাতি উচ্ছ্বসিত হয়েছিল, সেটা যেন স্থিরনীর নদীর আকস্মিক উচ্ছলতার ম'তো একটা ঘটনা। চিন্তাতে কল্পনাতে ও আকাঙ্ক্ষাতে আমি এমন ঘটনা দেখবার জন্যে প্রস্তুত ছিলাম না। তাছাড়া, প্রথম প্রয়াসের ফল একটি-দুটি গল্প পাঠকজন ও সমালোচকের কাছ থেকে বড় রকমের কোন অভ্যর্থনা পাবে, এটাও নিতান্ত বিরল, বস্তুত প্রায়-অসম্ভব ঘটনা বলে ধারণা ছিল। কিন্তু যেটা আশা করতে পারিনি, সেটাই পেলাম। বেশ-একটু বেশী করেই পেলাম। সেদিনের স্মৃতির মধ্যে আমর নিজের মনের প্রসন্নতার ছোট একটি ছবি দেখতে পাই। সেই প্রসন্নতার মধ্যে যেন একটা ভয়ও মুখ ঢাকা দিয়ে লুকিয়েছিল। ভয়টা দুরু-দুরু একটা প্রশ্নের ভয়। তবে কি আমি সত্যিই একজন লেখক হয়ে গেলাম? আরও লিখতে হবে? সাহিত্যকে যদি একটি মন্দির বলে কল্পনা করি, তবে বলতে পারি, মন্দিরের খোলা দ্বার দেখতে পেয়েই সেদিন ভয় পেয়েছিলাম। মনে হয়েছিল, দ্বার বন্ধ দেখতে পেলেই ভাল ছিল। ভিতরে প্রবেশ করলেই তো ধূপ-দীপ জ্বালতে হবে। সেটা আমার যোগ্যতায় সম্ভব হবে কি হবে না, কে জানে!

ভেবেছিলাম, না, আর নয়। এই প্রথম সোপান থেকেই ফিরে চলে যাওয়া উচিত। আর কখনও কোন গল্প লিখবো না। কিন্তু আমার এই সংকল্পের জোর ভেঙে দিলেন আমারই পরিচিত ও অন্তরঙ্গ কয়েকজন সাহিত্যিক ও সাংবাদিক বন্ধু। এক স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য ছাড়া সেই বন্ধুদের সবাই আজও আছেন। মন্মথনাথ সান্ন্যাল, অরুণ মিত্র, বিনয় ঘোষ, পুলকেশ দে সরকার, সাগরময় ঘোষ ও বিজন ভট্টাচার্য। আমার লেখা গল্পের সুখ্যাতিতে আমি আর কী এমন খুশি হয়েছিলাম। আমার চেয়ে শতগুণ বেশী খুশি হয়েছিলেন তাঁরা, আমার ওই ছয়-সাত জন অন্তরঙ্গ বন্ধু। আমার লেখা গল্পের সুখ্যাতি যেন তাঁদেরই একটি প্রিয় আকাঙ্ক্ষার সফল কৃতিত্বের পরিণাম। কারণ তাঁদেরই ইচ্ছা ও অনুরোধের নির্দেশে আমি গল্প লিখতে বাধ্য হয়েছিলাম। বাধ্য হওয়ার ছোট একটি ইতিবৃত্ত আছে, যা উল্লেখ না করলে আমার গল্প লেখার প্রথম চেষ্টার ইতিকথাটি অনুক্ত থেকে যায়। বন্ধুরা প্রতি মাসের দুই রবিবারে কোন এক বন্ধুর বাড়িতে সমবেত হতেন! উদ্দেশ্য, সাহিত্যের আলোচনা ও নিজের লেখা পাঠ করা। সেই লেখার ভাল-মন্দ গুণের বিচার করা হতো। এই সমাবেশের একটা নাম ছিল, অনামী সঙ্ঘ। আলোচনা শেষ হলে অনামীরা আর-একটি আনন্দের স্বাদে পরিতুষ্ট হতেন, ভোজনানন্দ। পালা করে বন্ধুদের বাড়িতে অনামী সঙ্ঘের বৈঠকী সমাবেশ হতো। অনামী সঙ্ঘের সদস্য হয়েও আমার আচরণে রীতিগত একটি ব্যতিক্রমের ব্যাপার ছিল। বৈঠকে

আমার উপস্থিতি ছিল নিতান্ত একটা উপস্থিতি, শুধু অপরের লেখা মন দিয়ে শোনা, ও মন দিয়ে খাওয়া-দাওয়ার আনন্দ গ্রহণ করা। আমি কোনদিনও সাহিত্যের মতো করে কোন লেখা লিখিনি, সুতরাং অনামী সঙ্ঘের বৈঠকে আমার নিজের কোন রচনা পড়বার প্রশ্ন থাকতে পারে না। আমার এই অভিমতের যুক্তিকে আমল না দিয়ে স্বর্ণকমলবাবু প্রথম একটি কড়া অনুরোধের চাপ দিলেন: সাহিত্যের মতো করে লিখতে পারুন বা না-পারুন যা ইচ্ছা হয় এবং যা পারেন, যেমন-তেমন কোন একটা নিজের লেখা অনামী সঙ্ঘের বৈঠকে আপনাকে পড়তেই হবে। নইলে ভাল দেখায় না। বুঝতে দেরী হয়নি আমার, নিজের কোন লেখা পাঠ না করে শুধু খাওয়া-দাওয়া করা ভাল দেখায় না। বুঝেছিলাম, যেটা অনুরোধের চাপ সেটা বস্তুত একটা অভিযোগের চাপ। সুতরাং অনামী সঙ্ঘের পরবর্তী দুই বৈঠকে নিজের লেখা দুটি গল্প পড়লাম। দুটিই গল্প, অযান্ত্রিক ও ফসিল। সন্ধ্যাবেলাতে বৈঠক, আমি দুপুর বেলাতে অর্থাৎ বিকেল হবায় আগেই মরিয়া হয়ে সাত-তাড়াতাড়ি গল্প দুটি লিখে ফেলেছিলাম। আশা ছিল, এইবার অনামীদের কেউ আর আমার সম্পর্কে রীতিভঙ্গের অভিযোগ আনতে পারবেন না। কিন্তু একটুও আশা করিনি যে, বন্ধু অনামীরা আমার লেখা ওই দুই গল্প শুনে প্রীত হতে পারবেন। পঁয়ত্রিশ বছর আগের ঘটনা হলেও, অনামী বন্ধুদের সুপ্রীত চিত্তের সেই হর্ষধ্বনি আমি আজও শুনতে পাই, তাঁদের দুই চোখের সেই উজ্জ্বল পরিতৃপ্তির দৃষ্টি আজও আমার স্মৃতির মধ্যে যেন একটি দ্যুতিচ্ছবির মতো মাঝে মাঝে জেগে ওঠে। অনামী বন্ধুদের আন্তরিক আনন্দের প্রকাশ ও উৎসাহবাণী আমার সাহিত্যিক কৃতার্থতার প্রথম মাঙ্গলিক ধান-দুর্বা। আমার নিজের অনুভবের মধ্যেও সেদিন অনেক বিস্ময় গুঞ্জরিত হয়েছিব, সে বিস্ময়ের মধ্যে একটি বড় প্রশ্নও নিহিত ছিল। আমার মতো অনভিজ্ঞ এক আনাড়ীর পক্ষে এক চেষ্টাতেই গল্প লেখা সম্ভব হলো কী করে? ব্যক্তির জীবনে যোগ্যতাও কি একটা আকস্মিক আবেগের সৃষ্টি?

সেদিন আমার মনের বিস্ময়ের মধ্যে যে প্রশ্ন ছিল, আমার গল্প লেখার এই ইতিবৃত্ত পাঠ করে অনেকের মনে সেই প্রশ্ন দেখা দিতে পারে। কোন ব্যক্তির আকস্মিক কৃতিত্বের ব্যাপারটা কি বিনা চেষ্টার একটা ম্যাজিক? সেদিন যে বাস্তব সত্যতার নিয়মটাকে স্পষ্ট করে ধরতে ও বুঝতে পারি নি, আজ সেটা খুব স্পষ্ট করে ধরতে ও বুঝতে পেরেছি বলেই বলতে পারি, না, আমার গল্প লেখার কৃতিত্বটা বিশুদ্ধ আকস্মিকতার একটা ইন্দ্রজালের জাল নয়। ভাবনা কল্পনা ও অনুভবের মধ্যে জীবন-বৈচিত্র্যের যে ছবি আগেই রূপান্তিত হয়েছিল, তারই প্রতিচ্ছবি একদিন গল্পরূপে বিমূর্ত হয়েছিল।

প্রসঙ্গত আর-একটি ঘটনার খুব ছোট একটি ইতিবৃত্ত স্মরণ করতে পারি, সেটা আমার প্রথম গল্প লেখার দ'তিন মাস আগের একটি অভিজ্ঞতার। আনন্দবাজার

পত্রিকার রবিবাসরীয় সাহিত্য বিভাগের একজন কর্মী হয়ে কাজ করতে গিয়ে বহু-জনের প্রেরিত গল্পের ফাইল হাতড়ে একটি যোগ্য গল্প বাছতে হতো। যে-সব লেখকের কম-বেশী নাম-ডাক ছিল, শুধু তাদের লেখা নয়, অখ্যাত লেখকের গল্পও রবিবাসরের আনন্দবাজারের সাহিত্য-পৃষ্ঠায় প্রকাশ করা হতো। অখ্যাত লেখকের গল্পকে আমার বুদ্ধিবিচার অনুযায়ী মাজা-ঘষা ও ওলট-পালট করে, এমন কী গল্পের মধ্যে নতুন বর্ণনা ও নতুন সংলাপও যুক্ত করে দিতাম। এই রকম কয়েকটি গল্প প্রকাশিত করবার পর লেখকের ধন্যবাদ এবং পাঠকজনের প্রশংসার চিঠিও এসেছিল। লেখকের ধন্যবাদের চিঠিতে মন্তব্য থাকতোঃ আপনারা আমার লেখা গল্পটির চমৎকার সংশোধন করেছেন। পাঠকজনের প্রশংসা ও চিঠিতে মন্তব্য থাকতোঃ এই রবিবারের আনন্দবাজারে প্রকাশিত গল্পটি খুবই সুন্দর হয়েছে। এই রকম আরও গল্প ছাপুন। ব্যাপার দেখে আমার মনে একটি দুঃসাহসিক বাসনার প্রশ্ন কয়েকবার ঝিলিক দিয়েই মিলিয়ে গিয়েছিল। ইচ্ছে করলে ও চেষ্টা করলে আমিও কি একটা আস্ত ভাল গল্প লিখে ফেলতে পারি না? বাস্, ওই পর্যন্ত, প্রশ্নটা এর বেশী কোন মানসিক চঞ্চলতা সৃষ্টি করতে পারেনি। অনামী বন্ধুদের তাগিদে বাধ্য না হবার আগে আমি কোন গল্প লিখতে চেষ্টা করিনি।

কবি বলেছেন—ছিন্ন তুষারের প্রায়, .বাল্য বাঞ্ছা দূরে যায়। এটা কিন্তু মনোবিজ্ঞানের মনঃপূত ধারণার কথা নয়। বাল্য বাঞ্ছার আবেদন ব্যক্তির অন্তশ্চেতনায় সঞ্চিত হয়ে থাকে। ব্যক্তির কল্পনা ভাবনা ও অনুভবের স্বভাব তৈরি করে দেবার ব্যাপারে বাল্য বাঞ্ছারও হাত থাকে। কবি কালিদাস প্রাক্তনজন্মবিদ্যার কথা বলেছেন। পূর্বজন্মের অধিগত বিদ্যা পরজন্মের ব্যক্তির জীবনে সঞ্চারিত হয়ে সহজ প্রতিভা সৃষ্টি করে কি না, সেটা নিগূঢ় এক বিবাদীয় দার্শনিক তত্ত্বের প্রশ্ন। জন্মান্তরবাদও বাদ-প্রতিবাদের সংঘাতে অভিভূত একটি তত্ত্ব। ওই প্রশ্নের জবাবে আমার বিশ্বাস ও ধারণার কথার মধ্যে হ্যাঁ কিংবা না, দু'য়ের কোনটিই নেই। আমার বিশ্বাস এই যে, শুধু বাল্য বাঞ্ছা নয়, কৈশোর ও যৌবনেরও ভাবসঞ্চয় ব্যক্তির চিন্তার সৃষ্টিশীল প্রকৃতি নির্মাণ করে। এটা কবি কলা-শিল্পী ও কথা-শিল্পীদের সম্পর্কে আরও বেশী প্রযোজ্য একটি সত্য। জীবনের বিচিত্র রূপ রহস্য ও বিস্ময়ের সঙ্গে যার যেমনতর মায়িক সম্বন্ধ ঘটে, তার মনের বৃত্তি ও প্রকৃতি ঠিক তেমনতর মায়িক সে কর্ষ লাভ করে। নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ আকস্মিক প্রকারে সম্ভব হতে পারে, কিন্তু নির্ঝর স্বয়ং একটি আকস্মিক সৃষ্টি নয়। তার ইতিহাস আছে। খুব সরল করে বলা চলে, সেটা অভিজ্ঞতারই ইতিহাস। লেখক হবার আগে জীবনের আলো-ছায়া ও অন্ধকারের অনেক রূপ ও অনেক ঘটনা দেখবার অভিজ্ঞতা আমারও ছিল। শ্মশানের ভয়ানক ধোঁয়ার কুজ্ঝটিকা ও শালবনের মাথার উপর পূর্ণ চাঁদের জ্যোৎস্না বিস্তার, দুইই দেখবার অভিজ্ঞতা। পনেরো বছর বয়সের জীবনে রোজ সকালে এক মাইল পথ হেঁটে

উকিলবাবুর বাচ্চা ছেলেদের পড়াতে গিয়ে কঠোর এক সাংসারিক সত্যের স্বাদ পেতে হয়েছে। দশ টাকা মাইনের মাস্টারের একদিনের গরহাজির ক্ষমা করতে পারলেন না বিত্তবান ও সম্ভ্রান্ত উকিলবাবু। পাঁচ আনা কেটে রেখে ন' টাকা এগার আনা দিলেন। আবার অন্য ঘটনায় এর বিপরীত সত্যের প্রকাশও দেখতে হয়েছে। ক্ষুদ্র এক ধর্মশালার পাঁচ টাকা মাইনের দারোয়ান তার দুপুরবেলার আহারের দু'টি মোটা-মোটা বজরা রুটির একটি আমার হাতে তুলে দিয়ে বলে গেল—আপনি আজ এখনও কিছু খাননি বলে মনে হচ্ছে, তাই আমিও খেতে পারছি না। রুটিটা এখনই খেয়ে নিন। আমার বিশ্বাস, এ রকম অনেক ঘটনার ভিতরে ও নিকটে থাকবার অভিজ্ঞতা আমার অনুভব ও প্রত্যয়ের সম্বল সৃষ্টি করেছে। কৈশোর কালের আর একটি প্রাপ্ত সম্বলের কথা মনে পড়ে, যার রূপটা বস্তুত রূপকথারই মতো একটি আবেশ দিয়ে গড়া। পিতামহের বন্ধু রায়বাহাদুর পার্বতীনাথ দত্ত, যিনি ভারতের জিওলজিক্যাল সার্ভের প্রথম ভারতীয় ডিরেক্টর, তিনি নদী পাহাড় সমুদ্র ও পাথরের অনেক মজার-মজার গল্প বলতেন, বড়-বড় প্রাণীর হাড় পাথর-চাপা পড়ে ফসিল হয়ে যায়। মহিলা কবি কামিনী রায় আমাদের বাড়িতে আসতেন। তিনি তাঁর লেখা দু'টি বই, 'গুঞ্জন' ও 'অশোক সঙ্গীত' উপহার দিয়েছিলেন। অর্থ বুঝতে পারিনি, কিন্তু কবিতার কথাগুলি মনের মধ্যে যে ঝংকার জাগিয়ে তুলতো তার মধুরতা অনুভব করতে কোনই অসুবিধা হতো না। আমরা দীক্ষিত ব্রাহ্ম না হলেও আমাদের বাড়িতে ব্রহ্মোপাসনা প্রায়ই হতো। আচার্যের প্রার্থনায় ভাব ও ভাষার অনেক কিছু বুঝতে না পেরেও মুগ্ধ হতাম। পিতামহের টেবিলের উপরে রাখা একখণ্ড 'ব্রহ্ম সঙ্গীত' আদ্যোপান্ত বারবার পড়েছি। বয়সটা তখন যদিও সেইসব সঙ্গীতের তত্ত্ব ও তাৎপর্য বুঝবার মতো যোগ্যতার বয়স নয়, তবু একটা নতুন রকমের তৃপ্তি বোধ করতাম। আমার ধারণা, আচার্যদের প্রার্থনার ভাষা ও ব্রহ্ম-সঙ্গীতের ভাষা আমার সেই কিশোর মনের মধ্যে একটি সুষ্ঠু ভাষার সম্বল তৈরি করে দিয়েছিল। পরবর্তীকালে দার্শনিক মহেশচন্দ্র ঘোষের লাইব্রেরি ছিল আমার নিজের ইচ্ছানুচালিত শিক্ষার একটি বড় সহায়। আমার এই আত্মনির্ভর শিক্ষার সিলেবাসে কাহিনী-সাহিত্যের কোন স্থান একরকম ছিলই না বললেই চলে। ইতিহাস ও দর্শন ও ধর্মতত্ত্বের বই পড়বার দিকে আমার বেশী ঝোঁক ছিল। রাঁচী নিবাসী বিখ্যাত নৃতাত্ত্বিক শরৎচন্দ্র রায়ের প্রত্যক্ষ সান্নিধ্যে উপস্থিত হবার কোন সুযোগ হয়ে ওঠেনি, তাঁর লেখা আদিবাসী-জীবনের বৃত্তান্ত পাঠ করে নৃতত্ত্ব সম্বন্ধে আমার কৌতূহল উদ্বোধিত হয়েছিল। আমি তখন হাজারিবাগ সেন্ট কলাম্বাস কলেজের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। নৃতাত্ত্বিক শরৎচন্দ্র রায়ের ছেলে রমেশ ছিল আমার সহপাঠী কলেজবন্ধু। রমেশের মুখ থেকে তার পিতার গবেষণা ও নৃতাত্ত্বিক নিদর্শনের সংগ্রহ সম্পর্কে কিছু পরিচয়ের কথা শুনেছিলাম। যে-টুকু শুনেছিলাম তারই মধ্যে যেন আবেদনময় একটি সঙ্কেত

ছিল। কৃতী নৃতাত্ত্বিক হবার একটি আকাঙ্ক্ষার সংকেত। যা-ই হোক, আকাঙ্ক্ষা থাকলেও নৃতাত্ত্বিক হতে পারিনি। ভূতাত্ত্বিক কিংবা সঙ্গীত-রচয়িতা কবি হতেও পারিনি। কিন্তু বিশ্বাস করতে পারি, সেদিনের সেইসব আবেশ আগ্রহ ও কৌতূহলের সঞ্চয় আমার গল্প-লেখা ও উপন্যাস-লেখা প্রয়াসেরই একটি সহায়ক সম্বলে পরিণত হয়েছে।

মাইকেল মধুসূদনের একটি কবিতার বাণীর মধ্যে কান্ত সাহিত্যের মনস্তাত্ত্বিক নির্মাণের রীতি সংজ্ঞায়িত হয়েছে বলে মনে করা চলে। ফুটি যেন স্মৃতিজলে, মানসে মা যথা ফলে, মধ্যময় তামরস···।' ভৌগোলিক মানস হ্রদের সঙ্গে তুলনা না করে বলা চলে যে, মানুষের মনের রূপায়তনও একটি হ্রদ, এবং স্মৃতি তার জল। কান্ত সাহিত্যের প্রত্যেকটি সৃষ্টি, কবিতা ও কাহিনী, বস্তুত স্মৃতিজলে ফুটে ওঠা তামরস। গল্পলেখক হিসাবে আমার অভিজ্ঞতারও আবিষ্কার এই যে, স্মৃতি যেন আপন আগ্রহের বেদনায় একটি কান্তি সৃষ্টি করে পরিতৃপ্ত হয়। গল্প-লেখা তাই সাহিত্যক জীবন নামে স্বতন্ত্র ও ভিন্নতর একটা জীবনের কাজ নয়। এবং কান্ত সাহিত্য সৃষ্টি করবার যোগত্যা নিছক পাণ্ডিত্যের অধিগম্য কোন কৃতিত্ব নয়। এই যেগ্যতার ষোল-আনা ভাগের বারো-আনা ভাগই বস্তুত আন্তরিক সংবেদনার কোন জিজ্ঞাসার সৃষ্টি, বুদ্ধিবৃত্তির কোন তাগিদের সৃষ্টি নয়। নিজের ইচ্ছার তাগিদে হোক, কিংবা পত্র-পত্রিকার সম্পাদকের অনুরোধের চাপে হোক, যখনই গল্প লিখেছি তখনই বুঝতে পেরেছি যে, বিশেষ একটি জিজ্ঞাসার প্রেরণা ছাড়া গল্প লেখা সম্ভবই নয় যদিও গল্পের মতো চেহারার একটা বাক্-সামগ্রী নির্মাণ করা সম্ভব। আমি জানি, এবং আমার স্বীকার করতে একটুও আপত্তি নেই যে, আমার লেখা কিছু গল্পও বস্তুত গল্পের মতো চেহারার বাক-সামগ্রী মাত্র বিশেষ কোন আন্তরিক জিজ্ঞাসার রূপ নয়। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, আমার লেখা এ ধরনের কয়েকটি অযথার্থ গল্প বিজ্ঞ সমালোচকের উচ্চকণ্ঠ প্রশস্তি লাভ করেছে, যদিও সাধারণ পাঠকের কাছ থেকে পাওয়া চিঠির ভাষাতে তার আশাভঙ্গের দুঃখ বিবৃত হয়েছে যে: আপনার লেখা এই গল্পটিকে পড়ে কোন সুখ পেলাম না। গল্পটি কেমন যেন খাপছাড়া।

আমার গল্পের গুণাগুণ নির্ণয় করবার যে পদ্ধতিকে আমি সবচেয়ে নির্ভর-যোগ্য ও নির্ভুল বলে মনে করি, সেটা হলো সাধারণ পাঠকের কাছ থেকে পাওয়া অজস্র চিঠির অভিমত। সাধারণ পাঠকের অভিমতের উপর আমার এই আস্থার একটি বড় কারণ হলো বারো বছর বয়সের একটি বালকের প্রশ্ন—আপনার 'ঠগিনী' আর 'পরীক্ষিৎ ও সুশোভনা' কিন্তু একই গল্প, দু রকম করে লিখেছেন, তাই না? এ রকম প্রশ্ন, বিশেষ করে এত অল্প বয়সের এক বালক-পাঠকের মুখে উচ্চারিত হতে পারে ধারণা ছিল না। শুনে চমকে উঠেছিলাম, কারণ আমি লেখক হয়েও কোনদিন ভেবে দেখিনি কিংবা বুঝতেই পারিনি যে, ওই দুই গল্প জীবনের একই

অনুভব ও হৃদয়বৃত্তির দুই ভিন্ন সাজের দুই রূপ। সেদিন থেকে আমার এই বিশ্বাস আরও দৃঢ় হয়েছে যে, পাণ্ডিত্যময় প্রবীণতার দুই চোখের দৃষ্টিতে স্বচ্ছতার অভাব থাকে, ভাব অনুভব ও রসের সহজ সত্যের প্রতিভাস সেই চোখে ফুটে উঠতে পারে না। কিন্তু যাদের আন্তরিক বৃত্তির সহজ সৌষ্ঠবের কোন বিকার ঘটেনি, কান্তকলার যথার্থ রূপেব বিচার করবার মানসিক যোগ্যতা তাদেরই বেশী। এটা আমার দীর্ঘকালের তথাকথিত সাহিত্যিকজীবনের একটি অভিজ্ঞার কথা। সাহিত্যের সমালোচক বলে পরিচিত ও খ্যাত তিন গুণী ব্যক্তির ভিন্ন-ভিন্ন তিন নিবন্ধে আমার লেখা একটি গল্পের তিন রকম অদ্ভুত তাৎপর্যের পরিবেষণ দেখে আতঙ্কিত হয়েছিলাম, যেন তিনটি ভয়াবহ কুঝ্‌টিকা কথা বলছে। একদিন প্রাথমিক স্কুলের এক শিক্ষিকার চিঠি পেলাম: আপনার গল্পটির অর্থ কি এই নয় যে, মানুষের জীবন এক বিবাহের (মনোগেমি) সম্বন্ধের মধ্যে সবচেয়ে বেশী সুখী হয়? ঠিক প্রশ্ন, মনোগেমি অর্থাৎ প্রকবিবাহ প্রথা বলে অখ্যাত সামাজিক শীলাচারের মনস্তত্ত্ব এই গল্পে মর্মায়িত হয়েছে। এই চিঠির প্রশ্নে এক মুহূর্তেই আমার সেই আতঙ্কের ঘোর কেটে গিয়েছিল।

সমালোচনার এইসব বিচিত্র ও অদ্ভুত রকম-সকমের অনেক নমুনার উল্লেখ করতে পারি। কিন্তু না, অলমতি বিস্তরেণ। শুধু বলতে হয় যে, অক্ষম ও স্থূল প্রকারের সমালোচনা, প্রশস্তি হোক বা ভর্ৎসনা হোক, সাহিত্যের পরিবেশ আবিল করে। আমার উপলব্ধি ও অভিজ্ঞতার স্মৃতি যদি কথা বলে, তবে এই কথাই বলবে যে, অক্ষম সমালোচনা হলো কিন্ন এক জঞ্জাল, সাহিত্যের সুস্থতার একটি বড় ভয়। সমালোচনার দীনতা রিক্ততা ও কৌতুককর প্রগলভতার এই রকম কয়েকটি নমুনা আমার স্মৃতিলোকের কয়েকটি সামান্য বিষাদের নমুনা ছাড়া আর কিছু নয়। সত্যিকারের গুণান্বিত সমালোচনার অনেক নমুনা আমার স্মৃতিলোকের প্রসন্নতার মধ্যে শুভাবহ সঙ্কেতের মতো মুদ্রিত হয়ে রয়েছে। সাহিত্যের সুহৃদ হবার মতো গুণ ও শক্তি এমন অনেক সমালোচনার সাক্ষাৎ পেয়েছি।

এই পঁয়ত্রিশ বৎসরের মধ্যে মাঝে-মাঝে একটানা অনেক বৎসর এবং অনেক .মাস বাদ গিয়েছে, গল্প লেখবার ইচ্ছা ও চেষ্টা দুই-ই স্তব্ধ হয়ে যেন সাময়িক বিরাম উপভোগ করেছে। একবার একটানা পুরো চার বছর এবং একবার একটানা পুরো দু বছর একটিও গল্প লিখিনি। কিন্তু সেই সময় সমালোচকের নিবন্ধে খিন্ন মেজাজের মন্তব্য ধ্বনিত হয়েছে: সুবোধ ঘোষ আজকাল বড় বেশী লিখছেন। এত বেশী লেখালেখি ভাল নয়, এতে লেখার উৎকর্ষের হানি হয়।

সাহিত্যের লেখক হিসাবে আমার বিশেষ একটি সৌভাগ্যের সত্য এই যে, আমাকে কোনদিনও নিজের ইচ্ছার তাগিদে কোন পত্রিকা-সম্পাদকের বরাবরেষু আমার কোন লেখা পাঠাতে হয়নি। নিজের লেখা গল্প ও উপন্যাস বই করে

বের করবার ইচ্ছায় আমাকে কোনদিন কোন প্রকাশকের কাছে গিয়ে দাঁড়াতে হয়নি। প্রকাশক স্বয়ং আগ্রহী হয়ে আমার গল্পগ্রন্থ অথবা উপন্যাস প্রকাশ করবার প্রস্তাব করেছেন, তবেই আমি সাড়া দিয়েছি কিংবা দিইনি। কিন্তু উপযাচক হয়ে কোন প্রকাশকের কাছে বই ছাপাবার কোন অনুরোধ আমাকে কখনও করতে হয়নি। বন্ধু সাহিত্যিক খুশি হয়ে বলেছেন : আপনিই ভাল আছেন। আপনার বই বিক্রী হোক বা না হোক, বইয়ের বাজারের ধুলো আপনাকে গায়ে মাখতে হয়নি। জানবেন, এটা আপনার সাহিত্যিক জীবনের একটি বিশেষ পুরস্কার। বলা বাহুল্য, বন্ধু সাহিত্যিকের এই ধারণার সঙ্গে আমার নিজের ধারণার একটুও অমিল নেই।

আমার স্মৃতিকথার এই প্রসঙ্গটি কারও কারও কাছে অহমিকার প্রকাশ বলে বোধ হতে পারে। কিন্তু আমার কাছে এটা স্নিগ্ধ একটি উপলব্ধির বিনীত নিবেদন। ভাবতে সত্যিই আনন্দ পাই যে, বাজারের ধুলো গায়ে মাখবার দুর্ভাগ্য আমার হয়নি। অধ্যাপক শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য একদিন বলেছিলেন—আপনার দাম্ভিক বলে দুর্নাম আছে। থাকতে পারে। সেদিন যেমন ছিল আজও বোধহয় তেমনই আছে। ঝলমলে আসরের মধ্যে প্রবেশ না করে এক পাশে একটু আবছায়ার মধ্যে আলগা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা, কিংবা ভিড়ের চক্র দেখে দূরে সরে থাকা যদিও বস্তুত একপ্রকারের নিরীহ নির্লেপ তবু সেটা দম্ভ বলে অপবাদিত হয়ে থাকে। শুনেছিলাম, যে ব্যক্তি কোন দলে থাকে না, যে ব্যক্তি কোন সঙ্ঘবদ্ধ স্বার্থের পক্ষভুক্ত নয় তাকে সকলেই পছন্দ করে। আমার অভিজ্ঞতার যে-কথা আজও স্মৃতির ঘরে একটি অদ্ভুত ও অভাবিত বিস্ময়ের কলরবের মতো বাজে, সেটা এই যে, এহেন দলহীন ও অপক্ষভুক্ত ব্যক্তিকে সবাই অপছন্দ করে, তার সম্পর্কে কারও কোন মমতার কর্তব্য নেই তার সম্পর্কে যথেচ্ছ অপবাদ রটনা করাই একটা লোকাচার। এ ধরনের লৌকিক অমান্যতার অপঘাতে আমার সাহিতিক-জীবনের শান্তি মাঝে মধ্যে ব্যথিত হলেও বিচলিত হয়নি। শুধু বিস্মিত হয়েছি কিন্তু বিদ্বিষ্ট হতে পারিনি। শ্রীপ্রমথনাথ বিশী একবার আমার সম্পর্কে এক ব্যক্তির উদ্দীপ্ত রোষের কথা জানিয়ে দিয়ে আমাকে সভয় একটু সতর্ক হতে বলেছিলেন। উচ্চপদস্থতার বিক্রমে মোহান্বিত সেই ব্যক্তির প্রতিজ্ঞা, তিনি আমার চাকরি খাবেন এবং আমার সাহিত্যিক আকাঙ্ক্ষার ছটফটানি একেবারে ঠাণ্ডা করে ছেড়ে দেবেন। প্রথমবাবুকে আমি বলেছিলাম তিনি ক্ষতি করুন, সেজন্য আমি ভীত নই। কেন? জিজ্ঞাসা করে ছিলেন প্রমথবাবু। আমি বলেছিলাম : জীবনে আমি কোনদিনও কারও ক্ষতি করিনি, তাই আমি ক্ষতিচারী কোন ক্ষমতাবানকেও ভয় করি না। কারও কারও মনে হতে পারে যে, স্মৃতিকথা লেখবার ছলে আমি বেশ কিছুটা আত্মগরিমার কথা বলে নিচ্ছি। না, তা নয়। আমি আমার এই পঁয়ত্রিশ বছর বয়সের লেখকতার জীবনে কোনদিনও আমিত্বে চিহ্নিত করে কিংবা আমিত্ব প্রসারিত করে কোন নিবন্ধ লিখিনি। নির্ভয়ের

ওই তত্ত্ব আমার একটি অভিজ্ঞতার উপহার, একটি ঘটনার শিক্ষা। সেই ঘটনার স্মৃতিচ্ছবির মধ্যে আজও স্পষ্ট করে দেখতে পাই, ধবধবে ফর্সা ও অত্যন্ত রোগা চেহারার এক পাঠকজী ঘন-সন্ধ্যার অন্ধকারে তুলসী-মণ্ডপের চাতালের উপর একটি বাতি রেখে রামায়ণ পড়ছেন। সহসা এক ব্যক্তি ছুটে এসে চেঁচিয়ে উঠলো, ভাগিয়ে পাঠকজী, ওরা রওনা হয়েছে, ওরা আজ রাত্রিতেই অপনাকে খুন করবে। ওরা মানে, পাঠকজীর দেশ-গাঁয়ের তিন জ্ঞাতি-ব্যক্তি যারা পাঠকজীকে তাদের ভূসম্পত্তির একটি সমস্যা বলে মনে করে। পাঠকজী বললেন—আসুক ওরা। আমি এখান থেকে নড়বো না। প্রশ্ন করেছিলাম: আপনার ভয় করছে না? পাঠকজী বললেন: শোন বাবা, আমি জীবনে কারও কোন ক্ষতি করিনি। তাই আমি কাউকে ভয় করি না। হ্যাঁ, শুধু এক ভগবানকে ভয় করি; যদিও ভালবাসি। তোমারও কোনদিন কাউকে ভয় করবার দরকার হবে না, যদি জীবনে কারও কোন ক্ষতি না কর। মনে পড়ে, পাঠকজীর কথার আবেশ যেন আমার প্রাণের উপর সঞ্চারিত হয়ে সেদিন আমাকে একটি পরম বিশ্বাসে দীক্ষিত করে দিয়েছিল। চোখ নিষ্পলক হয়েছিল গা শিউরে উঠেছিল, যেন একটা আলোর স্রোত বুকের ভিতরে সঞ্চারিত হয়েছে। আমার লেখা একটি উপন্যাসে এই পরম সন্তুষ্ট ও পরম নির্ভয় পাঠকজী আছেন। শ্রীরতনমণি চট্টোপাধ্যায় একদিন খুশী হয়ে বললেন -উপন্যাসটি পড়েছি; প্রর্থনা করি, পাঠকজীর মতো মানুষের সন্তোষ ও নির্ভয়ের পুণ্যকথা শোনাবার জন্য ভগবান আপনাকে দীর্ঘকাল বাঁচিয়ে রাখুন।

জীবনে বহু ঘটনা যেমন আপনি দেখা দিয়ে সত্য-মিথ্যার নির্ণয় স্পষ্টতর করে দিয়েছে, তেমনই মাঝে-মাঝে যেন প্রাণের এক-একটি জিজ্ঞাসার আহ্বানে ঘটনা এসেছে ও শিক্ষা দিয়ে দিয়েছে। মনুষ্যত্ব মহত্ত্ব ও মরালিটি, এই তিনটি সুকৃতি একই সুত্রে গাঁথা, কোনটিও কারও সম্বন্ধ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিছক এককতায় সত্য হয়ে উঠতে পারে না। দর্শন ও ধর্মতত্ত্বের প্রত্যেকটি মৃদু অথবা কঠিন অনুজ্ঞা এই শিক্ষাই দিয়ে থাকে। আমিও গুরু চিন্তার অনেক বই লঘু প্রকারে পাঠ করেও এই সুদৃঢ় প্রত্যয় লাভ করেছিলাম যে হ্যাঁ ওই মরালিটি ও মনুষ্যত্ব এবং মহত্ত্ব একই সম্বন্ধিত ত্রিভুজের তিন বাহু। একটি ছাড়া অন্য দুটির কেউই সত্য হতে পারে না। মরালিটি বলতে সাধারণ অর্থে চারিত্রিক শুচিতা বোঝায়। এবং চারিত্রিক শুচিতা বলতে বিশেষভাবে কী বোঝায়, সেটা অজ্ঞ অদার্শনিক জনেরও অজানা নয়। চল্লিশ বছর আগের একটি ঘটনার স্মৃতিচ্ছবির মধ্যে হাজারিবাগের যে সুরেশদাকে আজও দেখতে পাই, তাঁর মাথায় টাক ছিল, আর গায়ে ছিল আধ-ময়লা একটি টুইল কাপড়ের কামিজ। কামিজের দুই আস্তিন গোটানো থাকতো বলেই স্পষ্ট করে দেখতে পেতাম, ত্রিশ বছর বয়সের সুরেশদার হাত দুটি একটু রোগা হলেও বেশ মজবুত। চলতি মতের সাধারণ অর্থে যাকে চারিত্রিক শুচিতা বলে, তার সামান্যতম খ্যাতিও সুরেশদার জীবনে ছিল না। মদের একটি পাইট বোতলের

ভাবে তাঁর কামিজের একটা পকেটে ঝুলে থাকতো। রাতের পাহারাদার পুলিশ সুরেশদাকে প্রায়ই পতিতা-পল্লীর আনাচে-কানাচে হল্লা করে ঘুরে বেড়াতে দেখতে পেত আর ধরে নিয়ে গিয়ে থানার হাজত ঘরে ঢুকিয়ে দিত। এহেন সুরেশদার চিমড়ে মুখটাকেই একদিন পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর পুরুষের মুখ বলে মনে হয়েছিল। সে-রাতে কুমোরপাড়ার একটা বাড়ির চালাতে আগুন লেগেছিল। বাঁশের ঠাট দিয়ে তৈরী চালাটা দাউ-দাউ করে জ্বলছিল। কুমোরপাড়ার আর্ত চিৎকারে মাঝরাতের ঘুম আর স্তব্ধতা ভেঙে গিয়েছিল বলেই শহরের অনেক মানুষ ছুটে এসে কুমোরপাড়ার আগুন-লাগা বাড়িটার কাছে, তার মানে নিরাপদ ব্যবধানে রেখে একটু দূরে এসে ভিড় করেছিল। সেই ভিড়ের মধ্যে কে না ছিলেন? বিশ্বান অধ্যাপক, সেবা মিশনের সন্ন্যাসী, উকিলবাবু ও ডাক্তারবাবু কলেজের ছাত্র, লাঠিয়াল বলে সুখ্যাত ডোম ও গয়লা, এবং থানার দারোগা ও সাত-আটজন পুলিশ কনেস্টবল। নৈষ্ঠিক ভক্তি ও সাত্ত্বিক বিশ্বাসের জন্য শহরের সবাকার শ্রদ্ধান্বিত তিন যুবকভদ্রলোকও ছিলেন। আমিও ছিলাম। সকলেরই মনে ও মুখে একটি প্রশ্ন হায়-হায় বিলাপের রব তুলে ছটফট করছিল, আগুন-লাগা ওই বাড়ির একটা ঘরের ভিতরে সব্জীওয়ালা সেই বুড়ো ও তার বুড়িকে পুড়ে মরবার দুর্ভাগ্য থেকে রক্ষা করবে কে? আগুন যে কুমোরপাড়াকে প্রায় ঘিরে ফেলেছে। উদ্বিগ্ন অথচ অলস সেই বিলাপমুখর জনতার বিলাপ আরও একটু প্রবল হতেই দেখা গেল, এক ব্যক্তি দুরন্ত বেগে ছুটে এসে আর চেঁচিয়ে হাঁক দিচ্ছে—আমার হাতে একটি টাঙি দাও। আর-কিছু চাই না, শুধু একটা টাঙি। ভিড়ের একটি লোক দৌড়ে গিয়ে, ভিনপাড়ার এক বাড়ি থেকে একটি টাঙি যোগাড় করে আবার ফিরে এল। সুরেশদা সেই টাঙির তিন কোপে জ্বলন্ত ঘরের দরজার কপাট তিনটুকরো করে ভেঙে দিলেন। ধোঁয়াভরা ঘরের ভিতরে ঢুকলেন সুরেশদা; বেহুঁশ এক বুড়ো ও তার বুড়ির দুই দেহভার দুই কাঁধের উপর তুলে নিয়ে সুরেশদা আবার বের হয়ে এলেন। বেহুঁশ বুড়ো-বুড়িকে খাটিয়াতে তুলে নিয়ে হাসপাতালে চলে গেল পুলিশ। আর সুরেশদা সড়কের পাশে নালার কিনারার ঠাণ্ডা ঘাসের উপর মুখ থুবড়ে পড়ে রইলেন অনেক্ষণ। আমরা ডাক দিলাম—সুরেশদা বলুন, আপনার কি কোন কষ্ট হচ্ছে? সুরেশদা উঠে বসলেন আর বললেন— ওরে তোরা আমার জন্যে ভাবছিস কেন? আগে বল, বুড়োটা আর বুড়ীটা বেঁচে আছে কিনা। আমরা বললাম, হ্যাঁ, ডাক্তারবাবু বললেন, বেঁচে আছে। সুরেশদা বলেন, বাস, তাহলেই হলো।

আমার লেখা গল্প ও উপন্যাসের অনেক ঘটনাতে এই সুরেশদা সামান্যভাবে কিংবা বিশেষভাবে আত্মপ্রকাশ করেছেন। প্রশ্ন জেগেছে মনে, মনুষ্যত্ব ও মহত্ত্বের গৌরবে সুরেশদাকে ছাড়িয়ে যেতে পারেন, এমন পূতচরিত্র মানুষ এই সাধারণ মানবতার সংসারে কতজন আছেন? সেই প্রশ্নের এই উত্তর পেয়েছি যে, ওই

মরালিটি, অর্থাৎ তথাকথিত ওই চারিত্রিক শুচিতা সত্যিই একটি শুচিতা এবং ব্যক্তিত্বের একটি বৈভব বটে, কিন্তু মনুষ্যত্ব ও মহত্ত্ব অন্য কোন সত্যের দান।

সুরেশদাকে যেমন মনুষ্যত্ব ও মহত্ত্বের একটি গূঢ় রহস্যের প্রতিনিধি-পুরুষ বলে মনে হয়েছে, তেমনই জীবনের নানা ঘটনার পথে এমন কিছু চোখের জলের ও স্মিতহাসির সাক্ষাৎ পেতে হয়েছে, যার রূপ ও বিচিত্রতা নিয়মের শাসনবন্ধন থেকে বিচ্ছিন্ন একটি রহস্যের প্রকাশ বলে মনে হয়েছে। পরেশনাথ পাহাড়ের কাছে প্রখ্যাত ট্রাংক রোডের উপর ডুমরির ডাক বাংলার সামনে গিরিডি-ধানবাদ সার্ভিস বাস ক্ষণবিরামের জন্য থেমেছে; বিশ বছর বয়সের বাস-কণ্ডাক্টর জেলা-বোর্ডের ছোট্ট হাসপাতাল ঘরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে ডাক্তারবাবুর মেয়ের কাছে এক গ্লাস জল চেয়েছে। ডাক্তারবাবুর মেয়ে পাটনার কলেজে পড়ে, এখন গ্রীষ্মের ছুটি, তাই সে এখন ডুমরিতে আছে। দুজনের কেউই আগে কখনও কাউকে দেখেনি। আজ এই প্রথম সাক্ষাৎ। জল খেয়ে নিয়ে বিশ বছর বয়সের বাস কণ্ডাক্টর আরও পাঁচটা মিনিট চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল, আর, ডাক্তারবাবুর সেই কলেজে-পড়া মেয়েও পাঁচ মিনিটকাল শূন্য গেলাস হাতে নিয়ে, কিন্তু নীরব হয়ে ও অন্যদিকে তাকিয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে রইল। সার্ভিস বাসের হর্ন বেজে ওঠে; চলে যাবার সময় হয়েছে। কাজেই বিশ বছর বয়সের সেই বাস কণ্ডাক্টরকেও তখন হাসপাতালের বারান্দা ছেড়ে ও ব্যস্ত হয়ে চলে যেতে হলো। কী আশ্চর্য, ডাক্তারবাবুর মেয়ের দুই চোখ জলে ভরে গিয়ে ঝাপসা হয়ে গেল। না, এটা তো নিয়ম নয়, নিতান্ত অনিয়ম। কিন্তু স্বীকার না করে উপায় নেই যে, মানুষের অন্তর সত্যিই একটি রহস্যের জগৎ, তার হাসি অশ্রু বিষাদ ও উল্লাস সব সময় নিয়ম মেনে চলে না।

জীবনে এ রকম অনিয়মের বিস্ময় অনেক দেখেছি বলেই আমার লেখা অনেক গল্পের মধ্যে সেই বিস্ময়ের আবেগ খুবই সহজে সঞ্চারিত হয়েছে। ডাক্তারবাবুর সেই মেয়েকে হৃদয়বৃত্তির যে বিস্ময় বলে মনে করা চলে, সে বিস্ময় আমি আমার গল্পের অনেক নায়িকার ভালবাসার প্রাণে সঞ্চারিত করতে চেষ্টা করেছি। অনিয়মের বিস্ময় অথবা বিস্ময়কর এই অনিয়ম অদ্ভুত হয়েও জীবনের যত নিয়মিত মধুরতার চেয়ে অনেক বেশী মধুর। জঙ্গলের মাথার উপর চাঁদ হাসছে, জঙ্গলের ভিতরে গাছের পাতার ফাঁকে-ফাঁকে ছেঁড়া-ছেঁড়া জ্যোৎস্না ঝরে পড়ছে, মাঝ রাতের নিরেট নীরবতার মধ্যে বাতাসের শব্দ যেন জঙ্গলের বুকের ভিতরে লুকিয়ে-থাকা একটা অপার্থিব মায়ার মদবিহ্বল ইচ্ছার উচ্ছ্বাস। এ হেন পরিবেশের মধ্যে দাঁড়িয়ে একদিন বুঝতে হয়েছিল, হ্যাঁ, এও এক অনিয়মের বিস্ময়। মানুষের গা ঘেঁষে আর স্তব্দ হয়ে বসে রইল বাঘ, চেনা-জানা একটি পোষা বাঘ। জঙ্গলের মায়ার আহ্বান তাকে টেনে নিতে পারলো না। শিকল-বাঁধা ও খাঁচা-বন্দী জীবনের বিড়ম্বনা থেকে মুক্ত করে দেবার ইচ্ছায় সেই পোষা বাঘকে জঙ্গলের ভিতরে ছেড়ে

দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সেই মুক্তি মেনে নিতে পারলো না বাঘ, বলিষ্ঠ এক প্যান্থার। তার গায়ের উষ্ণ স্পর্শটা আমার স্মৃতির বুকে আজও লেগে আছে। একটি গল্প লিখে এই অনুভূতির তর্পণ করেছি।

নবীনচন্দ্র লিখেছেন—ধন্য আশা কুহকিনী তোমার মায়ায়, অদ্ভুত মানবচক্র ঘোরে নিরবধি। কবির উক্তি বস্তুত বিষাদ-বিজল্পিত একটি দার্শনিক উপলব্ধির প্রতিধ্বনি। কিন্তু সামান্য রকমের একটা আর্থিক রোজগার ঘটিয়ে দিতে পারে, এ রকম একটি জীবিকার আশাও যে কী ভয়ানক কুহকিনী হতে পারে, সেটা ত্রিশ বছর বয়সের কোঠায় পা দেবার আগেই হাড়ে-হাড়ে বুঝতে হয়েছিল। কিন্তু দেখে নিজেই আশ্চর্য হয়েছি, হাড়গুলি ভাঙ্গেনি। কর্মভাগ্যটা যেন নিদারুণ এক হেয়ালির আহ্বানে চঞ্চলিত হয়ে স্থান থেকে স্থানান্তরে ও দেশ থেকে দেশান্তরে ঘুরেছে। কিন্তু নিশ্চিন্ত হবার মতো কোন স্থিতি পায়নি। সেই দুরন্ত জীবিকা-সংগ্রামের মধ্যে অনেক জ্বালাকর দুঃখ ক্লেশ আর কষ্ট ছিল, কিন্তু খুবই স্নিগ্ধ একটি শিক্ষাও ছিল। ভাগবতের অবধূতের সাতাশ গুরু ছিল, সাতাশটি মানবেতর প্রাণী। সেই সব মানবেতর প্রাণীর সহজ প্রবৃত্তি ও জৈবিক আচরণের রূপ থেকে নৈতিক সত্যের শিক্ষা আহরণ করেছিলেন অবধূত। আমিও নিতান্ত সাধারণ মাণুষের সহজ মহত্ত্বের এক-একটি আত্যন্তিক পরিচয় পেয়ে বিস্মিত হয়েছিলাম। উপমা দিয়ে বলা চলে, বৈশাখ মাসের জঙ্গলের পথে ক্লান্ত কাঠুরিয়ার তেষ্টা হঠাৎ একটা ঝরনা দেখতে পেয়ে যেমন বিস্মিত হয়। শত শত যেসব মানুষের সংসর্গে আমার নানা রূপের ও রকমের জীবিকা-কর্মের দিনগুলি কেটেছে তারা সমাজবিজ্ঞ পণ্ডিতের ভাষায়, নিম্ন-সাধারণ মানুষ। আমার শিক্ষায় ও অভিজ্ঞতায় বলে' তারা উচ্চ-সাধারণ মানুষ।

আমার 'ফসিল' গল্প সুখ্যাত হলেও কোন প্রকাশক ফসিল ও অন্য কয়েকটি গল্পকে বই করে ছাপতে ও প্রকাশ করতে আগ্রহ বোধ করেননি। তাঁদের অনাগ্রহের যুক্তি এই যে, গল্পের বই বিকোয় না। 'ফসিল' গল্পগ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন একজন অ-প্রকাশক ভদ্রলোক, বন্ধু ক্ষেত্রনাথ রায়ের বন্ধু রবীন্দ্রনাথ পাল। অ-প্রকাশকের দ্বারা প্রকাশিত 'ফসিল' বইটির প্রথম সংস্করণ কিন্তু দুতিন মাসের মধ্যেই বিকিয়ে গিয়ে নিঃশেষ হয়েছিল।

ছেলেবেলা থেকে শালবন পাহাড় আর জংলী ঝরনা-নদীর সঙ্গে মেলামেশার আনন্দ আমার জীবনে একটি মহৎ সঞ্চয়। সে আনন্দের মধ্যে যে কঠিন একটি জিজ্ঞাসা নিহিত ছিল, তার পরিচয় বয়স না বাড়বার আগে ঠিক বুঝতে পারিনি। শালবন পাহাড় আর জংলী ঝরনা-নদীকে চমৎকার এক রহস্যের মায়াচ্ছবি বলে বোধ হতো। এ কিসের মায়া? বয়স বাড়লে এই জিজ্ঞাসার কথাটা ভাবনার ঘরে মাঝে মাঝে একটু বেশী সরব হয়ে উঠতো। ওয়াডসোয়ার্থের কবিতা পাঠ করবার ও তার অর্থ বোঝবার অনেক আগেই অনেকদিন ও অনেকবার মনে হয়েছিল, শালবনের

বাতাস আর ঝরনার নদীর শব্দ যেন কথা বলছে। কে জানে কী কথা! সেদিনের অনুভবের আবেশ কিন্তু বয়স বাড়তেই ঠিক তেমন করে ফুরিয়ে যায়নি, রোদ বাড়লে ঘাসের শিশির যেমন শুকিয়ে যায়। তত্ত্বের গ্রন্থে এই জিজ্ঞাসা ও আবেশের সরল অর্থপরিচয় পাওয়া যায়ঃ সৃষ্টির বিস্ময় অনুভব করে স্রষ্টাকে জানবার ইচ্ছা। কিন্তু বাস, ওইটুকু বুঝেই জীবনের কৌতূহল যেন লুকিয়ে গিয়েছিল। ব্রহ্মোপাসনা ও হরিসংকীর্তন শুনতে অভ্যস্ত ছেলেবেলার জীবনে যে ঈশ্বর-বিশ্বাস খুবই সহজ ও স্বাভাবিক একটি প্রাপ্তি হয়ে কাছে এসেছিল, সেই ঈশ্বরবিশ্বাসকে একটা যুক্তিহীন প্রত্যয় বলে ধারণা করে খুব খুশি হয়েছিল জীবনের যৌবনকাল। বিবেকানন্দ-সাহিত্য অতি আগ্রহ ও নিষ্ঠা নিয়ে পাঠ করে করে যে ঈশ্বর-বিশ্বাস আবার অন্তরতর ভাবনায় বিমূর্ত হয়েছিল, তাও আবার নানা সন্দেহে ভঙ্গুর হয়ে শেষে একবারে নিশ্চিহ্ন হয়েই গিয়েছিল। বিশ্বাসের এরকম সংকট অথবা বিপর্যয়ের ঘটনা অন্য অনেকের জীবনেও দেখতে পেয়েছি। নানা মুনির নানা মতের তত্ত্ব থেকে শেষ পর্যন্ত এই শিক্ষা পাওয়া গেল যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সত্য বলে প্রমাণিত করবার যুক্তি,আর মিথ্যা বলে প্রতিপন্ন করবার যুক্তি, দুই-ই সমান ভারী। না, যুক্তি দিয়ে ঈশ্বরের অস্তিনাস্তি করা সম্ভব নয়। সংশয়াপন্ন মনটা দীর্ঘকাল এই সিদ্ধান্ত পুষে রেখেছিল যে, যদি কোন অলৌকিক ঘটনা দেখতে পাই তবেই বুঝবো যে, লৌকিক প্রত্যয়ের ওপারে সত্যিই কেউ একজন নিশ্চয়ই আছেন। কিন্তু হঠাৎ একদিন আমার ইচ্ছার এই দাবিটা যেন নিজেরই অট্টহাসির ঠাট্টায় চূর্ণ হয়ে গেল। ঠাট্টা করেছিল একটা ঘটনা, ঝড়ের হাওয়ায় যেমন বন্ধ কপাটের কড়া নেড়ে ঠাট্টা করে। বিখ্যাত দার্শনিক যেমন বলেছেন, আমার নতুন উপলব্ধির বিস্ময়টাও প্রায় তেমনই করে বলেছিল মিরাকেল কাকে বলে? তোমার তুচ্ছতার ঠেলায় কেঁদে ফেলেও শিশুটি দুই হাত বাড়িয়ে তোমার গলা জড়িয়ে ধরে, আর অন্ধকারের পথে তোমার পায়ের কাছ থেকে সাপটা নিজেই সরে যায়— এইসব নিতান্ত লৌকিক ঘটনা কি বিস্ময় হিসাবে কম অলৌকিক? ফুল ফোটে, পাখি ডাকে, ভালবাসার আবেগ ওষ্ঠপুটের রক্তিমা আরও নিবিড় করে তোলে, এইসব নিতান্ত লৌকিক সত্যের রূপ দেখে কেউ মুগ্ধ হতে পারতো না, যদি এর মধ্যে অলৌকিক বিস্ময়ের প্রকাশ না থাকতো।

সাহিত্যিক জীবনের স্মৃতিকথার মধ্যে ঈশ্বর-বিশ্বাসে পুনর্বাসিত হবার কথা কেন? পাঠকজনের এই প্রশ্নের জবাবে আমার কথা এই যে, আমার সাহিত্যকর্মের সাধ আজ ঈশ্বর-বিশ্বাসের নতুন প্রদীপের কাছে এসে নতুন আলোর অভিষেক খুঁজছে। তাই থমকে থাকতে হচ্ছে। যদি সেই অভিষেক পাই, তবেই রূপে গুণে ভাবে ও প্রকারে নতুন বলে বোধ হবে এমন গল্প ও উপন্যাস লিখতে পারবো নইলে পারবো না। মানুষের জীবনে সবচেয়ে বড় শক্তি ও আনন্দের সম্বল যে ঈশ্বর-বিশ্বাস, তার সমহিম প্রেরণার অনুগত বিস্ময় ও বৈচিত্র্যের পরিচয় রূপায়িত করে

এতদিন কেন অনেক গল্প ও উপন্যাস লিখিনি, নিজের সম্পর্কে এই অভিযোগ আজ একটি কষ্টকর আক্ষেপ হয়ে মনের ভিতর বাজে। গল্প ও উপন্যাস লেখার সাহিত্যিক কর্ম এক ধরনের রিচুয়াল তথা বিশ্বাসের তর্পণ বলে মনে হয়েছে। গল্প উপন্যাস ও কবিতা জীবনের অভিজ্ঞতাত সত্যের প্রতি শ্রদ্ধাময় বিশ্বাসের নৈবেদ্য। কল্পনা করতে পারি, ঈশ্বর-বিশ্বাসের অনুগত প্রেরণার সৃষ্টি হয়ে আগামীকালের কান্তসাহিত্য ও রম্যকলা কী বিপুল আনন্দের নিবেদন সত্য করে তুলবে।

আমার প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস 'তিলাঞ্জলি'র ইতিকথার মধ্যে আকস্মিকতার কোন বিস্ময় নেই। বিশেষ উদ্দেশ্য এবং বিশেষ অবস্থার একটি দুর্বার প্রয়োজনের তাগিদে তিলাঞ্জলি লিখতে হয়েছিল। তিলাঞ্জলি যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, সেটাছিল বিকট নিন্দা ও বিপুল প্রশস্তির সংঘাতে উদ্বেলিত একটা উত্তেজনার আবর্ত। ব্রিটিশের শাসকীয় প্রভুত্ব তখন ভারত-রক্ষা আইনের তূণীর থেকে প্রায় একশো অর্ডিন্যান্সের বাণ বের করে ভারতীয় জনজীবনের ক্লিষ্ট কপালটাকে আরও ক্ষতাক্ত করে চলেছে। ডিনায়াল পলিসি, অর্থাৎ শত্রুপক্ষকে কোন। সুবিধার সম্বল সংগ্রহ করবার সুযোগ না দেবার নীতি অনুযায়ী ধান-চাল অপসারিত করে বাংলার পূর্ব ও দক্ষিণ প্রান্তের জেলায় জেলায় একটা দুঃসহ রিক্ততা সৃষ্টি করা হয়েছে। মুনাফাখোর এক শ্রেণীর দেশীয় ব্যবসায়িক সুযোগ বুঝে ধান-চাল মজুদ করে দরের ফাট্‌কা খেলতে মেতে উঠেছে। ধান-চালের এই অবরোধের ফলে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে। জাতীয় কংগ্রেস বে-আইনী বলে ঘোষিত ও নিষিদ্ধ হয়েছে। জাতির রাজনীতিক স্বাধীনতা দাবি করে সংগ্রাম করবার পরিকল্পনা করেছিলেন যাঁরা, জননেতা এবং আরও কয়েক লক্ষ কর্মী সাধারণ, তাঁরা কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়েছেন। ব্রিটিশরাজ বলেছেন, এ সময় কেউ স্বাধীনতার দাবি করো না। যুদ্ধ প্রচেষ্টায় মন প্রাণ ও অর্থ দিয়ে সাহায্য কর। এই সময় ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টিও বললেন, যুদ্ধ প্রচেষ্টায় বাধা দিতে নেই বরং সাহায্য করাই উচিত। কারণ, এটা হলো জনযুদ্ধ। এ সময় স্বাধীনতার দাবি করে ব্রিটিশরাজকে বিড়ম্বিত করা উচিত নয়। ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক কথা, যার সম্যক অর্থ হলো, সেদিনের স্বাধীনতার দাবি ও সংগ্রামের বিরোধিতা করা, এবং যুদ্ধ প্রচেষ্টাকে সাহায্য করবার জন্য একটি নৈষ্ঠিক অনুগত্যের তত্ত্ব প্রচার করা।

আগস্ট সংগ্রামের জ্বালামুখীর আগুন তখন নিবু-নিবু হলেও তার ধোঁয়াতে যথেষ্ট জ্বালা ছিল। সেই সময়ে লেখা আমার প্রথম উপন্যাস 'তিলাঞ্জলি' হলো জাতির জীবনের বেদনাক্রান্ত রূপ ও অবস্থার একটি প্রতিচ্ছবিত পরিচয়। উপন্যাসে ব্রিটিশরাজ ও কম্যুনিষ্ট পার্টির কথা কাজ ও নীতির প্রতিবাদ আছে। জাতির স্বাধীনতার দাবি ও সংগ্রামের সমর্থন এবং প্রশস্তি আছে। সুতরাং কম্যুনিস্ট পার্টির মানুষ এবং যাঁরা পার্টির অনুগতজন তাঁরা তিলাঞ্জলির প্রতি বিদ্বিষ্ট হবেন,

এটা স্বাভাবিক। কিন্তু এঁরা ছাড়া আর সকলেই 'তিলাঞ্জলি'কে বিপুল আগ্রহে অভিনন্দিত করেছিলেন।

'তিলাঞ্জলি' উপন্যাসের লেখা শুরু করবার কয়েক মাস আগে আমার লেখা 'নতুন শালিক' নামে একটি গল্পের প্রতিবাদ করেছিলেন শ্রীমানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রতিবাদের পদ্ধতিতে অভিনবতা ছিল। মানিকবাবু পাল্টা জবাব কিংবা প্রতিবাদ হিসাবে একটি গল্প লিখলেন—হ্যাংলা। কবির লড়াইয়ের মতো এধরনের গাল্পিকের লড়াইয়ের দ্বিতীয় কোন ঘটনার নমুনা আছে কি না, জানি না। যা-ই হোক, আমি বুঝতে পারিনি এবং আজও বুঝতে পারি না, আমার 'নতুন শালিক গল্পের প্রতিবাদ কেন করেছিলেন মানিকবাবু। 'নতুন শালিক' গল্পটি দীন সাধারণের শ্রেণীস্বার্থের একতাযুক্ত সংহতির সমর্থন। এবং সংগ্রামের পুরোভাগে কপট-বিপ্লবী বুর্জোয়ার চতুর অনুপ্রবেশের প্রতিবাদ। এমন বক্তব্যের গল্প মানিকবাবুর পক্ষে ভাল না লাগবার কথা নয়। জানি না, তিনি কী ভেবে ও কী কারণে আমার লেখা ওই গল্পটির প্রতিবাদ করেছিলেন।

যেমন আমার প্রথম লেখা গল্পের বই 'ফসিল' (ও অন্যান্য) প্রকাশ করেছিলেন অ-প্রকাশক ভদ্রলোক তেমনই আমার লেখা প্রথম উপন্যাস তিলাঞ্জলিও প্রকাশ করেছিলেন এক অ-প্রকাশক ভদ্রলোক, বন্ধুবর সাগরময় ঘোষ। কিন্তু একই প্রকারের দুই ঘটনার মধ্যে দুই ভিন্ন কারণ নিহিত ছিল। ইংরাজের ভারত-রক্ষা আইন 'তিলাঞ্জলির' ইংরাজ বিরোধী আর যুদ্ধবিরোধী মুখরতা সহ্য করবে না এবং কড়া রকমের শাস্তি দেবে, এই ভয়ের কারণে উদ্যোগী প্রকাশকের উৎসাহ বিষণ্ণ হয়ে গিয়েছিল। তাই উপন্যাসটি সাগরবাবুকে প্রকাশক বলে ঘোষণা করে প্রকাশিত হয়েছিল। তিলাঞ্জলির ইতিকথা এখানেই সমাপ্ত করে দিয়ে লেখকের অদৃষ্টের একটি সমস্যার কথা উল্লেখ করতে হয়। আনন্দবাজার পত্রিকার স্বত্বাধিকারী, অমার বিশেষ শ্রদ্ধার আস্পদ সুরেশবাবু একদিন হঠাৎ আমাকে ডাকলেন, বিষণ্ণভাবে কয়েকটি মুহূর্ত আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন, তারপর বললেন, তুমি এখনই গিয়ে মিস্টার রাওয়ের সঙ্গে দেখা কর। মিস্টার রাও আই সি এস, তাঁর পুরো নামটা আজ আর স্মরণে নেই। আলিপুরে গিয়ে তাঁর বাড়িতে তাঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্য উপস্থিত হতেই তিনি একটি ফাইল হাতে নিয়ে ও কাছে এসে বসলেন। তাঁর স্ত্রী, বাঙ্গালী মহিলা মনোরমাও একটি চেয়ার নিয়ে কাছে বসলেন।

মিস্টার রাও বললেন—আপনার সম্পর্কে সরকারের কাছে অভিযোগ এসেছে, আপনি আসামে গিয়ে শত্রুপক্ষ জাপানের সামরিক গোয়েন্দাদের সাহায্য করেছেন, অনেক খবর জুগিয়েছেন। সত্যিই যদি এরকম কাজ করে থাকেন, তবে··· ।

আমি বললাম—আমি জীবনে কোনদিনও আসামে যাইনি।

মিস্টার রাও— অ্যাঁ ? ঠিক বলেছেন ?

আমি—হ্যাঁ—ঠিক বলছি। আমি প্রমাণ দিতে পারি যে, আমি আসামে কোনদিনও যাইনি।

উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন মিস্টার রাও, তার চেয়ে বেশী উৎফুল্ল হলেন মনোরমা। ফাইলের কাগজে তখনি মন্তব্য লিখে দিলেন মিস্টার রাও, সম্পূর্ণ মিথ্যা অভিযোগ।

মনোরমা উঠে গিয়ে চা নিয়ে এলেন, আমার লেখা কয়েকটি গল্পের প্রশংসা করলেন। বললেনঃ আমি ওঁকে অনেকবার বলেছি যে, ওই ফাইলের সবই মিথ্যে কথা।

রাও বললেন—আমারও তাই মনে হয়েছিল। তবু···যাক, এখন আর আপনার ভয় করবার কিছু নেই।

মনোরমা বললেন—নিশ্চয় আপনার কোন ভয়ানক শত্রু আপনার বিরুদ্ধে এরকম সাংঘাতিক একটা চুগলি করছে।

চা খেয়ে নিয়ে ও রাও-দম্পতির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যখন আবার পথের উপর এসে দাঁড়ালাম। তখন আলিপুরের গাছের মাথার উপর বিকেলের রোদ মিইয়ে এসেছে। কার্জন পার্কের কাছে এসে একটি নিরালার ঠাণ্ডা ঘাসের উপর অনেকক্ষণ বসে রইলাম। সন্ধ্যা ঘনিয়ে উঠলো। তিলাঞ্জলিরই মন্তব্যের কয়েকটি কথা বারবার মনের ভিতরে যেন চেঁচিয়ে উঠছে—ওই তো, সন্ধ্যের অন্ধকারে লালবাজার থানার ফটকের কাছে যেন নতুন এক জুডাসের প্রেতাত্মার ছায়া ঘুরঘুর করছে। শত্রুচরকে হাতে পেলে সামরিক কম্যাণ্ড কী করে, সেটা জানা ছিল। চট পটসংক্ষিপ্ত বিচার, আর চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ফাঁসি। কাজেই মনের চিন্তাটা উত্তপ্ত হয়ে মাথাটাকেও বেশ উত্তপ্ত করে তুলছিল। বুঝতে দেরি হয়নি, এটা দুঃসহ একটা অস্বস্তির উত্তাপ। ছা-পোষা একটা সংসার আছে, বুড়ো বাপ-মা আছে, এহেন এক মানুষের ভাবনাতে দুঃসহ রকমের একটা অস্বস্তি এভাবে উত্তপ্ত না হয়ে পারে না। বোধ হচ্ছিল, চুগলিটা শুধু একা আমাকে নয়, এদেরও সবাইকে ফাঁসি দিতে চাইছে। এই উত্তপ্ত অস্বস্তির প্রকোপ ক্রমশ শান্ত হতে হতে যেদিন ঘুম-ভাঙা দুঃস্বপ্নের মতো মরে গিয়ে একেবারে বাতাসে মিশিয়ে গেল, সেই দিনটা হলো ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট।

□ দিনলিপি □
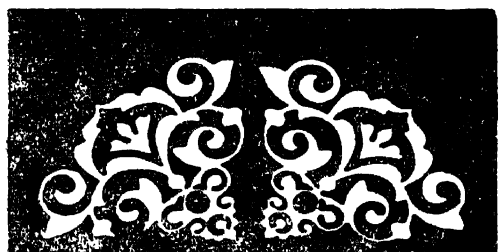
হোলির দিন ২৮/২/৫৩

(১) দেখলাম কালিঘাট পার্কের রেলিঙ এর পাশে এক ভিখারিনী বুড়ী তার হাঁড়ি আর নোংরা কাপড়ের পুঁটুলি নিয়ে বসে আছে। একদল ছেলে এসেছে বুড়ির গায়ে রঙ দিতে। আপত্তি করে না বুড়ী।

(২) কাঁকুলিয়া রোডের পেছনে যাদবপুর যাবার পথের পাশে রাজার পুকুর। সেই পুকুরে ডুবেছে ছোট একটি ছেলে। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও জলের ভেতর থেকে তাকে পাওয়া গেল না। পুকুরের দুপাশে লোকের ভীড়। সুসজ্জিতা (?) মেয়ের দল বসে আছে, গল্প করছে।

সকলে চলে গেছে। ছেলেটি জলের ভেতরেই আছে। হয়তো কাল সকালে লাশ ভেসে উঠবে।

রাত্রিবেলা। পূর্ণ চাঁদের জ্যোৎস্না। পুকুরের জল শান্ত। চারদিকে হোলির গান আর রেডিওর গান। কিন্তু ছোট ছেলেটির দেহ তখনও জলের নীচেই আছে। জাল ফেলা হয়েছে। জালে মাছ উঠেছে, সেই মাছ কেনার জন্য এবং বাগাবার জন্য দর্শকভীড়ের উল্লাস ও ব্যস্ততা প্রবল হয়ে উঠলো।

* * *

তথ্য

১। বৈজ্ঞানিক ডাক্তার তাঁর এক নতুন ঔষধের ফল পরীক্ষার জন্য বস্তিবাসী গরীব, জেলের কয়েদী, অনাথাশ্রমের বালকদের দেহে প্রয়োগ করেছে।

২। ঝি এসে বলল, অমুক বাড়িতে আমার একদিনের মাইনে কাটছে। বড়লোকের বাড়ি। মাসে ৮ টাকা মাইনে। একদিনের অনুপস্থিতির জন্য দেড় টাকা কেটেছে। ঝি তাই জানতে চায়, একদিনের মাইনে কত দাঁড়ায়?

৩। বিশিষ্ট ব্যক্তির মৃত্যুসংবাদে অথবা রোগ সংবাদে বিশ্বের বাজারে দর ওঠা-নামা করে। স্টালিনের অসুখের সংবাদে কলিকাতা বাজার:

Indian iron declined to Rs 25/8 from Rs 25/15

Silver started at 166/8 and finished at 164/15

['ইণ্ডিয়ান আয়রন হলো বাজারের ব্যারোমিটার']

৫. ৩. ৫৩.

৪। দীর্ঘকাল বেঁচে থাকার প্রয়াস মিঃ স্টালিন ডাক্তারের পরমর্শে 'Soda bath' নিচ্ছিলেন। তার ফলে রক্তের red corpuscles তরুণ ও active থাকে। ফলে জীবনদীর্ঘতর হয়।

৫। এক ব্যক্তি আত্মহত্যা করবে ঠিক করে মোটা টাকার জীবনবীমা করেছে।

বীমা করার পর বৎসরের পর বৎসর ফুরায়। বীমার টাকা দিতে হিমসিম খায়। অথচ আত্মহত্যা করতে পারেনা।

কিংবদন্তী

Ref : নদীয়া কাহিনী

১। শান্তিপুর ও বয়রার মধ্যবর্ত্তী স্থান 'বক্তারের ঘাট', বক্তিয়ার খিলজি গঙ্গা পার হয়েছিলেন।

২। নবদ্বীপের বিল্বপুষ্করিণীর দক্ষিণে লক্ষণসেনের প্রাসাদের ধ্বংসস্তুপ।

সাইকো-গল্প

১। পুণ্যকার্যে এক ব্যক্তি চলেছেন অতি প্রত্যুষে। প্রতিবেশী রসিকতা করেন—কি মশাই, কোন মধুর সন্ধানে চললেন। আড়ালে নিন্দা এবং সন্দেহ করলেন।

যে ঘটনা জানা থাকে না, সে বিষয়ে নিন্দা করতেই হবে, এ কেমন মনসস্তত্ব ?

২। অনশনী বৈদ্যনাথ ভৌমিক অনশন ভঙ্গ করে (৯/৫/৫৩)। কম্যুনিষ্ট ও কংগ্রেসী উভয়েই একই গেলাসে এক সঙ্গে হাত দিয়ে ধরে খেতে দিল। লেবুরস খেয়ে অনশন ভঙ্গ করলেন।

৩। গ্রামের মেয়ের নাম জঞ্জালী (পরে লাইনটি কেটে দেওয়া হয়েছে)

৪। প্রুফ-রীডারের পড়া—"বাঁয়ে ধবল, ডাইনে কুষ্ঠ, নীচে ভগন্দর, মাথায় পোড়া ঘা" অবশ্য বিজ্ঞাপন পড়া হচ্ছে।

৫। গড়িয়াহাটা বাজারে ফুল কিনছেন ভদ্রলোক।—দু'পয়সার ফুল দাও। দোকানী দেয় না। বলে দু'পয়াসার ফুল হয় না। বিষণ্ণ ভদ্রলোক চলে যান।

* * *

Ref তথ্য

১। এক নরহন্তার পুত্র জন্মলাভ করেছে। পুত্রকে খুব ভালবাসে নরহন্তা। কিন্তু ভাবে—একজনের প্রাণ হরণ করা হয়েছে। সে-ই কি এল পুত্র হয়ে ?

২। কুড়িয়ে পেয়েছি একটি দুল। কার কানের দুল ?

৩। পাশাপাশি দুই বাড়ি। দুই ভাড়াটে পরিবার। এক বাড়ির বধুর ১৫ দিন বয়সের এক সন্তান হারিয়েছে। কাঁদছে। পাশের বাড়ির বুড়ি সান্ত্বনা দিচ্ছে উঠানে দাঁড়িয়ে। রোজই এই ঘটনা চলে। সংলাপ - [কি করবে মানিক বল ? তোমার তো জিনিস নয়, যার জিনিস সেই নিয়ে গেল।]

৪। অনুরূপ দুই প্রতিবেশীর বাড়ি। এক বাড়ির জানালায় কতগুলি ছোট ছোট ছেলে। আর এক বাড়ির উঠানে বুড়ি। বুড়িকে ঠাকুমা বলে ছেলেরা।

বুড়ি ও এই প্রতিবেশী নাতিদলের মধ্যে হাসাহাসি চলছে। সুকুমার রায়ের ছড়া কাটছে ছেলেরা। ছড়ার মধ্যে বেশ আক্রমণ আছে। ছেলেরা বলে এবং ঐ কবিতারই লাইন তুলে প্রত্যুত্তর দেয় বুড়ি।

৫। এক বধূ বাঁশ পুঁতে কুমড়োলতা চড়িয়ে দিচ্ছে। গরীবের বধূ। গানে খুব সখ, বিলাসিনীও বটে। কিন্তু আজ হঠাৎ কুমড়ো-লতার ওপর এই স্নেহ কেন?

৬। নিরুদ্দেশের খবর ছাপা হয়েছিল। 'মা, কোথায় আছেন, সহৃদয় ব্যক্তি সংবাদ দিন।' জনৈক জুয়াচোর এল। টাকা নেবার জন্যে বলে—দেখেছি, অমুক জায়গায় আছেন।

কিন্তু সেই পরিবারে মানসিক অবস্থা আর দরিদ্র অবস্থা দেখে শেষ পর্যন্ত টাকা নিল না, যদিও টাকা দেওয়া হল।

শেষ পর্যন্ত সত্যি সত্যিই খুঁজতে বের হয়ে গেল। [বিবেকের ডাক]

৭। জনৈক ফাঁসীর আসামী মৃত্যুর পূর্বদিনে চাইল—নারীসঙ্গ করতে চাই। এল জনৈকা সুন্দরী বেশ্যা। বেশ্যার মনোভাব। মৃত্যুপথযাত্রীকে সুখ দান করা।

সাইকো-গল্প

১। ঝি-এর মুখের ভাষায় প্রবন্ধ লিখলো অনাদি। একেবারে বস্তির ভাষা। কিন্তু রাজশেখর বসু উচ্ছাসিত প্রশংসা করলেন। বললেন অনাদি হল 'হুতোমের নাতি। বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী আসন পাবে এই ভাষা।

২। মানবতাবাদী এক কৃষ্টি সংঘের সদস্যদের বৈঠক। সম্মেলনে কাকে সভাপতি করা যায়। হরপ্রসাদ বাবুকে সভাপতি করা যায় না। কারণ তার অনেক দোষ। অসাম্প্রদায়িক, অহিংসাদর্শী, গান্ধীভক্ত, ঐতিহ্যবিশ্বাসী, ঈশ্বরসমর্থক, প্রাদেশিকতা মানে না, বিশ্বশান্তির সমর্থক, যুদ্ধবিরোধী।

খুঁজছেন তাঁরা বিশুদ্ধ মানবতাবাদী। অর্থাৎ এই সব নীতির সম্পূর্ণ বিরোধী বিশুদ্ধ একজন অমানবতাবাদীকে।

৩। জনৈক বক্তার দুর্দশা। সংস্কৃতিহীন শ্রোতার দল। নাচ-গান শুনতে তারা চায়। বক্তা তত্ত্বকথা বলছেন। উদ্যোক্তারা সময় সংক্ষেপ করে দিলেন। শ্রোতারা প্রতিবাদ করে বলেন—থামুন, থামুন।

এইভাবে বিশ্বকবির স্মৃতিসভা যাপিত হল।

৪। বিশ্বকবির স্মৃতিসভায় কবির চিন্তার বিরুদ্ধ সব কথাই বলা হলো এবং প্রশংসিত হল বক্তার দল।

৫। কংগ্রেসভবনের পাঠচক্র নিয়ে জনৈক সাহিত্যিকের অভিজ্ঞতা।

৬। জার্নালিস্টিক সততা। দাসগুপ্ত একজন মন্ত্রীর তোষামোদ করে লিখে থাকে এবং আত্মীয়ের চাকরী-বাকরীর সুবিধা করে নেয়।

৭। একজন বুদ্ধতত্ত্ব সম্বন্ধে উপদেশ দিচ্ছেন। গুরুর মত মনোভাব তাঁর। কিন্তু তেমন কিছুই জানেন না। যাঁকে বলছেন তিনিই বরং অনেক কিছু জানেন। প্রতি প্রসঙ্গে সংশোধন করে দিচ্ছেন শ্রোতা, এবং বক্তা তারপর তাঁর বক্তব্য বলতে পারছেন। কিন্তু আশ্চর্য, শেষে এই অল্পবিদ্যা বক্তাই কৃতবিদ্য শ্রোতাকে বললেন—এইবার এতক্ষণে বুঝলেন তো?

Ref : গ্রাম্যজীবন

১। জনৈক নিঃসন্তান গ্রামবাসীর পালিত পুত্র ছিল। পরে নিজের পুত্র হয়। নিজপুত্র জন্মবধি রুগ্ন হয়। তান্ত্রিক সাধু পরামর্শ দেয়, পালিত পুত্রকে বলি দিলে নিজপুত্র সুস্থ হবে। নতুন কাপড় পরিয়ে পালিত পুত্রকে বলি দেওয়ার ব্যবস্থা হল। এই সময় জানাজানি হওয়ায় ধরা পড়ে যায়।

[যুগান্তর ২০/৫/৫৩]

২। গ্রাম্যদেবতা— নিশানাথ ঠাকুর। রাত্রির ভয় নিবারণ করেন। নড়াইল প্রভৃতি অঞ্চলে এই ঠাকুরের বটতলা আছে। রণরঙ্গিনী এর বোন। ভূষণায় মন্দির আছে। মোচড়া সিংহ, গাবুর ডালনা প্রভৃতি একাদশ ভ্রাতা আছে।

৩। গ্রাম্যদেবতা—জ্বরনারায়ণ। সেনহাটি, খুলনা, জ্বরের ঠাকুর।

তথ্য

স্তোকবাক্যের চরম— বৈদ্যদেবের তাম্রশাসনে কুমার পালের (রামপালের পুত্র) প্রশস্তি আছে। সমুদ্রের যতগুলি গুণ আছে, সবই কুমারপালের আছে। কিন্তু না, সমুদ্রের সঙ্গে এক জায়গায় মিল নেই। সমুদ্রে সেতুবন্ধন করে রাম সমুদ্র লঙ্ঘন করেছিলেন। কিন্তু কুমারপালকে কেউ লঙ্ঘন করতে পারে নি।

Ref : তথ্য

১। নাথ ব্যাঙ্ক ফেল পড়েছে। লিকুইডেটর শ্যামাপ্রসাদ মাসে ২ হাজার টাকা পান। priority পাইয়ে দেন নিজের ভাইকে। Overdraft যার আছে ৪০ হাজার, তার বিরুদ্ধে যেন মোকদ্দমা না করে ব্যাঙ্ক ; যার জন্য কৌশলে সুপারিশ করেন, আপষ করা হোক ; অজুহাত Party'র কোন সম্পত্তি নেই।

২। ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ দাবী, বিহারের অঞ্চল দাবির মিটিং। সভাপতি চপলাকন্ত। বক্তা বলে—১৯৪৭ সালের বীরেরা এগিয়ে এস (অর্থাৎ যারা মুসলমান হত্যা করতো)। বিবেকানন্দ বলে—আগুন লাগাও। মোহিত মৈত্র বলে—ট্রাম পোড়াও। সুখেন্দুর অনশন ভাঙতে দিতে কেউ রাজী নয়। শ্রীকুমার বলে—অন্তত সরকারের ৫ কোটি টাকার ক্ষতি কর, তবে মানভূম পাওয়া যাবে।

Ref : তথ্য

১। বীমা করবার সময় বয়স কমাবার কৌশল। পুরাতন কোষ্ঠী দাখিল। একদল জ্যোতিষী আছে যারা অতি পুরাতন কীটদষ্ট কাগজে পুরাতন কালি দিয়ে কোষ্ঠী লিখে দেয়। ভুল জন্ম তারিখ দিয়ে বয়স কমানো হয়।

২। Indian Airlines Corporation-এর সার্ভিস বিমান—Skymaster, Dakota, Vikings.

৩। "The Centre of the universe is situated some where in Scotland"-স্কচ বিশ্বাস।

৪। সিংহলের মন্দিরে প্রবেশের সময় রানী এলিজাবেথ ও ডিউক অব এডিনবরা

জুতো খুলে রেখেছিলেন বলে Scotland-এর চার্চগুলি রানীর আচরণের বিরুদ্ধে মন্তব্য ও সমালোচনা করে।

Ref : Typical Sentiments.

১। এক ব্যক্তি সৎপথে থেকে কষ্ট পাচ্ছে। দেখতে পাচ্ছে অসৎপথিরাই বেশ জয়যুক্ত হচ্ছে এবং ভাল আছে। হেরে যাচ্ছে সে নিজে। মনের দ্বন্দ্ব। এবার অসৎপন্থা গ্রহণ করাই কি উচিৎ?

২। বহু চেষ্টার ও সাধনায় গড়া একটি সুদৃঢ়তা কল্যাণ, সুভাব বা শ্রী এক ঘণ্টার মধ্যে একজন ইতরের চেষ্টাতে ব্যর্থ হয়ে গেল। এক বৎসরের সু-প্রচেষ্টার সুফল এক মুহূর্তের কু-প্রচেষ্টায় নষ্ট হয়ে যায়। এ কেমন নিয়ম?

৩। অতি দীন অবস্থা থেকে একজন মেয়ে নিজেকে পরিকল্পিতভাবে উন্নতির দিকে নিয়ে চলেছে। আকাঙ্খার অভিযান। সে ছিল ঝি, ধীরে ধীরে গবর্ণরের প্রসাদে নিমন্ত্রিতার স্থান লাভ। বহু ব্যক্তিকে প্রণয়ে অভিভূত করে এগিয়ে চলেছে এই নারী।

Ref : Plots

১। হাসপাতালের ও কলেজের ছাত্রদের অ্যানাটমি পাঠের জন্য একটি শব চাই। এল রামজীবনের লাশ।

২। বাড়ী থেকে উচ্ছেদ করার জন্য আদালতের লোক উপস্থিত। শেরিফের ক্রোকী পরোয়ানা নিয়ে এটর্নি উপস্থিত। স্বত্ব পেয়েছে অন্য লোক, মামলায় তার জিত হয়েছে। অতএব উচ্ছেদ।

বাড়ীতে কান্না। শিশু ঘুমোয়। ঠাকুর পুজো বাকী আছে। দেয়ালে আঁকা আছে প্রাচীন স্মৃতি।

এই অবস্থায় জিনিসপত্র টেনে নিয়ে ফুটপাথে জড়ো করা হচ্ছে। বৃষ্টি নামছে।

৩। ছেলেদের ফুটবল খেলার মাঠ। একটি খোঁড়া ছেলে এসে বসেছে মাঠের পাশে খেলতে চায় সে। বন্ধুরা ডাকে—আয় খেলবি।

৪। জনৈক আহত ডাকাতের dying declaration-মরবার আগে যন্ত্রণার মধ্যে জীবনের অনেক কথা, প্রধান কথা বলছে।

৫। ঘাটবাবু। শ্মশানের মড়া রেজিস্টরার। রাত জেগে কাজ করেন। শ্মশানবাসী। মৃত আসে, বৃদ্ধ যুবক শিশু তরুণী। অমাবস্যা পূর্ণিমা কষ্ট শীতে। কুয়াশা। হরিধ্বনি। পাগল, সন্যাসী, কাপালিক, ভৈরবী, অঘোর অবধূত। কীর্তন গান।

Ref : স্থূলরুচি

১। কলিকাতার কালীপুজো, সরস্বতীপুজো, দুর্গাপুজোয় মূর্তিতে কলের

কারসাজি। খড়্গ থরথর করে, ডাকিনী জিভ নাড়ে, বিদ্যুতের আলোকচক্র কাঁপে ইত্যাদি।

২। বড়লোকের বাগান গাছপালা জন্তুর আকারে ছাঁটা। মালাবার হিলে দেখা যায়।

৩। গৃহসজ্জা। বড় বড় পুতুল। নিগ্রোর মূর্তিতে ঘাড়, চোখ পট্‌পট্‌ করে। বাঘ জিভ চাটে। হনুমানের লোম কাঁপে। [বিকানীরে মারোয়াড়ী বড়লোকের বাড়ী]

৪। বড়লোকের বাগান। বিলাতী ফুলের গাছের গায়ে গরম কোট আর ক্যানভাসের জ্যাকেট পরানো, শীতের সন্ধ্যায় এবং গ্রীষ্মের মধ্যরাতে।

Strange Facts

১। রাসসুন্দরী দাসী পর্দানশীনা। স্বামীর ঘোড়া দেখে লজ্জায় জিভ কেটে ঘোমটা টেনে পালিয়ে গিয়েছিলেন।

২। নিষ্ঠাশীলা নিরামিষাসিনী বিধবা, কিন্তু অন্য লোককে মাছের মুড়ো খাবার জন্য পীড়া পীড়ি করেন। নিজের তৃপ্তি পরোক্ষে সাধন করেন।

৩। তন্ত্ররত্নাকর বলে—নিহত ত্রিপুরাসুর তিনরূপে জন্মগ্রহণ করে। শচীতনয় চৈতন্য, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত। "উপন্নকায় লোকানাং নারী ভাবমুপাদিশৎ" [বটুক ভৈরবের প্রতি গণদেবের উক্তি, উক্ত তন্ত্রে]

৪। "তরকারী কাট"—এ কথা গোঁড়া বৈষ্ণবেরা বলে না। বলে– তরকারী বানাও।

৫। নরবলি। ত্রিপুরার প্রাচীন রাজারা ত্রিপুরেশ্বরীর নিকট শত্রুদের বলি দিতেন। দায়ুদ খাঁর আত্মীয় মমায়ক খাঁকে চতুর্দশ দেবাতার কাছে বলি দিয়েছিলেন ত্রিপুরার পুরোহিত চণ্ডাই থিতুঙ্গ। মনিপুরের বাঙাল জেনারেলের আদেশে জল্লাদ ধর্নসিংহ চারজন ইংবাজকে দেবমন্দিরে বলি দিয়েছিলেন, কুইন্টান, স্কীম, সিমসন ও কলিস।

কিংবদন্তী

.১। কুমিল্লার ১২ মাইল পশ্চিমে বড়কামতা। এখানে একটি স্থানের নাম এখনো বিহার মণ্ডল নামে পরিচিত (বড়কামতার উত্তরে)। ঐতিহাসিক কর্মান্তিনগর। হুয়েনসাং এসেছিলেন। অশোকস্তম্ভ আছে। খড়বংশীয় রাজত্ব—রাজারা বৌদ্ধ। চারদিকে স্থানের নাম পাটিকারা। ১১ শতকে পাটিকারার রাজকুমার পেন্ডরাজা কিংমিথার মেয়েকে বিয়ে করেন।

১৮ ভুজ নটেশ্বর ও মন্দির। ৩০ টি সংঘারাম।

২। গৌড়ীয় সৈন্য পরিহাস কেশব ভারতে গিয়ে কাশ্মীরের রামস্বামীকে চূর্ণ করেছিল। প্রভু হত্যায় প্রতিশোধ. কারণ ললিতাদিত্য গৌড়েশ্বর জয়ন্তকে হত্যা করেন। জামিন ছিলেন পরিহাস কেশব। [রাজতরঙ্গিনী]

৩। বারেন্দ্রভূমির এক পল্লীতে নাকি আছে পরমভট্টারক গোপালদেবের সমাধি। কৃষকরমণীরা সমাধিতে বাতি দেয়। [অক্ষয় মৈত্রেয়]

৪। দ্বিতীয় বিগ্রহপাল ছিলেন চিত্রশিল্পী। যশোবর্মার পুত্র ধর্মদেব কনৌজ হতে সসৈন্যে এসে বিগ্রহপালের পত্নীকে নিয়ে চলে যায়। ১০০২ খৃঃ অব্দের ঘটনা। ধর্মদেব পরপত্নী বিলাসী।

[তাম্রশাসনে উল্লিখিত আছে]

৫। মহীপাল দীঘি। রংপুরের নিকটে। ধানভাঙতে মহীপালের গীত। ধনী বণিককন্যা নীলাকে ভালবাসেন মহীপাল। ঐ দীঘিতে সাঁতার কাটতে এসেছে নীলা। মহীপাল তাকে অপহরণ করে নিয়ে গেলেন। [সুলতান মামুদ তখন উত্তরাপথ ধ্বংস করছেন। মথুরা, লোপাদ্রি ও সোমনাথ ধ্বংস] মহীপাল নিশ্চিন্ত।

৬। পাটনা সিটির দক্ষিণে কুমরাহার গ্রামে ছিল অশোকের প্রসাদ।

৭। কৈবর্ত ভীমের বিরুদ্ধে অভিযানে রামপালের সহায়ক ঃ—

(ক) তৈলকর্ম্মের অধিপতি রুদ্রশিকর [মানভূমের তেলকুপি]

(খ) 'অজেয় চেকরী'র প্রতাপসিংহ। বীরভূমের অজয় চেকুর—ইছাই ঘোষ।

৮। কুমিল্লার পাটিকারা গ্রামাঞ্চলের রাজা মাণিকচাঁদের প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ। গোপীচাঁদের সন্ন্যাস [রবিবর্মার ছবি] অদ্দুলরানীর আবেদন।

মাণিকচাঁদের ছেলে গোপীচাঁদ। মাণিকচাঁদ রানী ময়নামতীকে তাড়িয়ে দিয়ে এক সুন্দরীর পাণিগ্রহণ করেন। ময়নামতী যোগী গোরক্ষনাথের শিষ্যা হন।

মাণিকচাঁদের মৃত্যুর পর ময়নামতীর বিরুদ্ধে কুৎসা। ছেলে গোপীচাঁদকে সিংহাসন থেকে সরিয়ে রাজ্য শাসনের সংকল্প। [Ref E দুর্লভ মল্লিকের পল্লীগাথা]

গোপীচাঁদ (গোবিন্দচন্দ্র) সাভারের (ঢাকাজেলা) রাজা হরিশ্চন্দ্রের দুই মেয়ে অদুনা পদুনাকে বিয়ে করেছিলেন।

৯। ধলেশ্বরীর কিনারায় সাভার। ঢাকার আট মাইল উত্তর। হরিশ্চন্দ্রের প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ।

১০। বজ্রযোগিনীর পশ্চিমে সুরাপুর ও নাম্না গ্রামে উঁচু ঢিপির নাম— 'রাজসনের ভিটা।'

Strange Facts

১। বৌদ্ধ নৈয়ায়িক চন্দ্রগোমিন। বারেন্দ্রভূমি জন্মস্থান। বারেন্দ্র রাজকন্যার সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাব। কন্যার নাম তারা। চন্দ্রগোমিনের উপাস্য তারা। সুতরাং বিবাহে তাঁর আপত্তি। বারেন্দ্র রাজ শাস্তি দিলেন। বরিশালের

অট্টানে (?) এসে বাস করেন। তাই এ স্থানের নাম চন্দ্রদ্বীপ। সিংহলে গিয়েছিলেন। গ্রন্থ—ন্যায়ালোকসিদ্ধি।

২। তাম্রশাসনে আছে—রাজা বলিরাম, গোঁপের রেখা প্রথম দেখা দিয়েছে এই উপলক্ষে ২১ খানি গ্রাম ও ৪১ লক্ষ টাকা ব্রাহ্মণকে দান করেন।

৩। রামকেলী গ্রামে রূপগোস্বামী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত রূপসাগরের জল হিন্দুর অব্যবহার্য ছিল সেদিনও। কারণ, মুসলমান সাহচর্যে বহুদিন লালিত রূপ সম্বন্ধে হিন্দুর বিদ্বেষ ছিল।

৪। 'সিন্দুকী—প্রাচীনকালে ময়মনসিংহের এক শ্রেণীর ভাড়াটিয়া দালাল। হিন্দু গৃহের সুন্দরী নারীর পরিচয় নবাবের কাছে পাঠানো ছিল কাজ। [পূর্ববঙ্গ গীতিকা]

৫। 'মাঘমাসে মুলো খেলে ব্রহ্মবধের সমান পাপ হয়।' রঘুনন্দনের ফতেয়া।

৬। বিদ্যুৎপ্রভা হলো গঙ্গানটের পুত্রবধূ। লক্ষণসেনকে দেহ দান করে এবং নৃত্যগীতে খুশী করে করে অর্থ উপার্জন। শ্বশুর খুশি। কলিঙ্গের অঙ্গনাদের সঙ্গে লক্ষণসেন 'কুমারলীলা' করতেন।

৭। ব্রাহ্মণদের অভিশাপ ; বাংলা ভাষার প্রতি ঃ

অষ্টাদশ পুরাণানি রামস্য চরিতানি চ
ভাষায়াং মানবাঃ শ্রুত্বা রৌরবং নরকং ব্রজেৎ

রামায়ণ মহাভারত মুসলমানকুলে বাংলা ভাষায় লেখার উদ্যোগ হলে ব্রাহ্মণেরা অভিশাপ দিয়েছিলের।

৮। কুলার্নবতন্ত্রে আছে ঃ শিব উপদেশ দিচ্ছেন উমাকে ঃ

বাদুড় এবং ছুঁচের মাংস, চণ্ডালরমণীর ব্যভিচারদুষ্ট বস্ত্র, শবের উত্তরীয়··· লইয়া এই সব বীভৎসতা করিবে।

৯। 'রোমথা প্রথা'। হিন্দুরাজত্বে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিকে অগ্নিকুণ্ডে বা শূলে দেওয়া হতো। এদের ওপর ঔষধ পরীক্ষার অধিকার চিকিৎসকেরা লাভ করত। উল্কি দিয়ে কপালে এঁকে দেওয়া হতো—রোমথা।

১০। আপস্তম্বের গৃহ্যসূত্র সামাজিক রীতিতে উদারতা Sanction করেছে।

সাইকো গল্প

১। পুকুরে কাকচক্ষু H_{20}, কি সুন্দর·· হাওয়া, জলে রুই ঘাই মারে। আকাশে ফটিক জল হাঁকে চাতক (Latin নাম)। সামনে এসে দাঁড়ালো সুমিত্রা —বিচিত্র একা Dolicouplulic (?) সেশটারিয়ন এলোচ্চিচি (latin) মেডিটারেনিয়ান স্কাল। ভাষা—Anglo-Anatic —চোখে হরিণের দৃষ্টি।

সাইকো গল্প

(i) 'জোরখেনসেনে'র Sex transformation-এর তুলনায়। সুজাতা ও রমেশের Sex transformation। কিশোর বয়সে প্রেমের সময় সুজাতার মধ্যে

নারীসুলভ Charm ছিল, আর রমেশের মধ্যে ছিল পৌরুষ। এখন সুজাতা হয়েছে দেশনেত্রী—রুক্ষ, রূঢ় ও কর্কশ, পুরুষের চেয়েও বেশি পুরুষ। তারই domination-এ রমেশ ক্রমশ গৃহকর্মনিপুণা। শান্তশিষ্ট নিরীহ। বধূর মতই মেয়েলি।

২। একটি পুস্তক সমালোচনা। সমালোচক লিখেছেন যে, এই কাহিনীতে 'প্লট, ঘটনার চমৎকারিতা ভাষার ঐশ্বর্য ইত্যাদি কৃত্রিমতা নেই।'

(৩) নাতি জিজ্ঞাসা করছে এক ঠাকুমাকে—শত্রু মানে কি? ঠাকুমা বলেন—'তুমি যখন রাজা হবে, তখন তোমাকে সিংহাসন থেকে নামিয়ে দিতে, টাকা সোনা কেড়ে নিতে চেষ্টা করবে যারা…অর্থাৎ ঐ 'কমলরা আর সামন্তরা হল শত্রু।'

৪। প্রথম রটনা করা হলো, লোকটা ভয়ানক মাতাল। কিন্তু মাতালের কোন লক্ষণ দেখা যায়না। তখন রটনা করা হলো, এক পিপে মদ খেলেও লোকটার পা টলেনা। কিছু বোঝা যায় না, এমনই পাকা মাতাল।

Plot

১। 'মা ঝড় বড় সুন্দর।' জাহাজের নাবিক বা খালাসী হয়ে ছেলে চলে যাচ্ছে সাগরে। মার মনের উদ্বেগ। সমুদ্রের ঝড়কে বড় ভয়। চিঠি এল ছেলের—ঝড় বড় সুন্দর। [ছেলেকে বিদায়ের দিনে যত সব লক্ষণ দেখে উদ্বিগ্ন হন মা। কাক কেন ডাকে? ছায়াটা ওরকম করে কেন? জবা ফুল ফিকে কেন?]

২। এক ডাক-কেরাণী, সুনন্দা নামে প্রতিবেশিনীর প্রেমের চিঠে পোষ্টাপিসেই খুলে পড়ে। এই তার অভ্যাস। মেয়েটি সন্দেহ করে। একদিন চালাকি করে মেয়েটিও চিঠি দিল—'ওগো সুনন্দা এস গঙ্গার জলে ডুবে মরবো।' এই চিঠি পড়ে কেরানীর দুশ্চিন্তা। গেল বাধা দেবার জন্য। সুনন্দা হাসে, ধরা পড়ে গিয়েছে কেরানী।

৩। চৌরঙ্গীতে ভিক্ষা করছে একটি যুবতী মেয়ে। সুপুষ্ট দেহ। দুই হাত ও দুই পা কাটা। এই মেয়ে যখন গর্ভবতী হলো, তখন কি অবস্থা ও সমস্যা দাঁড়ালো?

৪। দাদু সখ করে নাতির নাম নারায়ণ রেখেছেন। কারণ নাতিকে ডাকলেই ভগবানের নাম করা হবে। কিন্তু নাতির মৃত্যু হল। দাদু এখন আক্ষেপ করেন, নারায়ণ বলে ডাকতে যে আর পারি না। ঠাকুরের বদলে নাতির কচি মুখের কথাই যে মনে পড়ে। কী দুঃসহ বেদনা! গল্প 'দেবতারে প্রিয় করি'

৫। সত্যবালা বিশ্বাস, দরিদ্রা, সদ্যপ্রসূত সন্তানকে এক জঙ্গলের ঝোপের আড়ালে ফেলে। দুইজন কনস্টেবল দেখতে পায়, স্ত্রীলোক পালিয়ে যাচ্ছে। রক্ত সিক্ত বস্ত্র গায়ে। একজন কনস্টেবল বাচ্চাকে পাহারা দেয়। আর একজন সত্যবালাকে ধরে। থানা অফিসার মাতা-পুত্রকে হাসপাতালে পাঠায়। [হাসপাতালের স্বাচ্ছন্দ্য, আরাম এবং বাচ্চার শান্তি স্ফূর্তি] মামলায় অপরাধ

স্বীকার করে সত্যবালা। অনুতাপ প্রকাশ। কিন্তু ব্যারাকপুরের মুন্সেফ ম্যাজিস্ট্রেট শাস্তি দান করেন। তিন মাস বিনাশ্রম কারাবাস। 'Mercy will be misplaced if' শুধু সাময়িক ধরে ছেড়ে দেওয়া হয়। [H. S. 3/7/54] * গল্প 'আবিষ্কার' Hindusthan Standard.

৬। ১৪/১৬/১৩ বৎসর বয়স, তিনটে মেয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে কাঁদে। বলে, অনাথ, চাকরী চাই, বাসন মাজবো। দয়ার্দ্র ব্যক্তিরা বাড়িতে নিয়ে গিয়ে রাখে। এরা হলো চোরের দলের লোক রাত্রে দরজা খুলে দেয়। (ঐ)

Sketches

১। একটি উপন্যাসের সমালোচনা পড়লাম। সমালোচক প্রশংসা করে বলেছেন—'প্লটের বাঁধুনি, ভাষার ঐশ্বর্য, ঘটনার চমৎকারিতা ইত্যাদি লোকভুলানো কৃত্রিমতা এই উপন্যাসে নেই।'

২। ধার্মিক মালিক। সকলকে উপদেশ দেন—ভগবানকে ভুলবে না। দিনে অন্তত পাঁচবার (নমাজ) প্রার্থনা করবে। কর্মচারী ও শ্রমিকেরা দিনে পাঁচবার প্রার্থনা শুরু করে। মালিক দেখলেন আট ঘণ্টার মধ্যে এক ঘণ্টার কাজ ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। অতএব…অন্য ব্যবস্থা করলেন।

৩। তুলনা কর স্মৃতির সঙ্গে বাস্তব। দেখেছিলাম পঁচিশ বছর আগে এক চঞ্চল, উৎফুল্ল ও দুরন্ত শিশুকে। ফুলের জীবন। জীবন ওকে টানতো।

আজ তাকেই দেখছি সংসারের দাস। হেলায়, অভাবে, জীবনভারে পীড়িত। এখন সেই জীবনই ওর ভার।

এ যুকের সম্পর্কে এই মন্তব্য।

Facts

১। নিদ্রিত মায়ের কোল হইতে শিশু নিখোঁজ। চাপড়া, নদীয়া। সাতমাসের শিশু। পিঁড়াতে ঘুমিয়েছিল মাতা। জন্তুতে শিশুকে নিয়ে যায়। এক ঝোপের জঙ্গলে শিশুর মাথার খুলি ও গলার সুতাবাঁধা মাদুলি পাওয়া গিয়াছে। (জনসেবক ১৬/৭/৫৪)

২। কৃষ্ণনগরে উকীলের বাড়ির সামনে ড্রেনে প্রাণহীন ভ্রূণ। বাসনা হল এই বাড়ির ঝি। বয়স ১৬ বৎসর মাত্র। কয়েকদিন পরে ফাঁসিতে লটকানো বাসনার মৃতদেহ দেখা যায় ঘরের ভিতরে।

৩। গুশিতপাড়া ইউনিয়নের অন্তর্ভূক্ত দীঘি (বিল)। কৃষকের এবং জেলের উপকারী। বন্যাশাসনকারী এক বাঁধ আছে। সেচ করা এবং মাছ, পাট-পচানো, এই সব উপকার দেয়। জেলেরা এই বিলকে পূজা করে। এক দেবী আছে এই বিলের নামে। চণ্ডিকা।

Plot

১। Ch. Chaplins life. বিখ্যাত ও ধনী হয়ে দেশে ফিরছে এক যুবক।

বহু পত্র আসছে। এর মধ্যে একজন লিখলেন—'তুমি আমার ছেলে, তোমাকে চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল।'

মহিলা বলে 'আমার কুমারীকালের সন্তান তুমি।'

মহিলা একজন ধূর্ত ঠগিনী। কিন্তু ছেলেটির মনের reaction—সত্যিই কি এই মহিলা আমার মা? আমি কি আমার সেই মায়ের পালিত পুত্র? (গল্প 'কৌস্তুভ')

২। এক দরিদ্র ভদ্রলোক ঠিক করে নিয়েছে, সপ্তাহের এক একটি দিনে এক একজন পরিচিত বন্ধুর বাড়িতে খাবার সময়ে উপস্থিত হতে হবে এবং খেতে হবে। ত্রিশটা বাড়ি ঠিক করা হয়েছে এবং এক বাড়িতে এক বেলা করে খেয়ে যাচ্ছেন ভদ্রলোক। কোন উদ্বেগ নেই।

৩। এই টাউনে প্রতি বৎসর গরমের সময় নতুন পাগল আসে। বাসের ড্রাইভার স্টেশন থেকে তুলে নিয়ে এসে টাউনে ছেড়ে দেয়।

কাপালিক তান্ত্রিকের চিৎকার ঃ—

না লাগে টাকাকড়ি, না লাগে ধন—
বাবা ব্যোম ব্যোম ব্যোম।
না লাগে দয়ামায়া, না লাগে মন—
বাবা ব্যোম ব্যোম ব্যোম।

ভিক্ষুক—All powerful Sirdars control begger business :

(ক) বেশ্যালয়ে ছোট মেয়ে বিক্রয় করে।
(খ) ভিক্ষাতে নিয়োগ করে।
(গ) শিশুকে সন্তানহীন ব্যক্তির নিকট বিক্রয়।
(ঘ) অঙ্গহানি করিয়ে ভাল ভিক্ষুককে পরিণত করা হয়!
(ঙ) রাজ্যের বাইরে চালান।
(চ) সাধু ভিক্ষুকেরা পলাতক আসামী।

* * *

Plot

১। শিল্পীদের কাছে উলঙ্গ হয়ে বসে জনৈকা তরুণী মডেল হিসাবে। মাইনে ৮০ টাকা। এরই জীবন সম্বন্ধে কাহিনী।

২। জনৈকা সাধারনী নারী, প্রেম করে করে উচ্চপদস্থা হচ্ছে। স্বামী ছাড়ছে পর পর। নতুন স্বামী বেশি ধনী ও পদস্থ।

৩। জনৈকা পতিতার স্বীকৃতিঃ ঘর বাঁধবার কল্পনা। বাবুকে বলে, ঝি-গিরি করতে পারবো না। আজ আপনার কোলে বসছি, কাল আপনার বাসন মাজবো কেমন করে? রাত্রে রুটি খায় দিনে ভাত, নাড়ি হালকা হয় এত লোককে বুকে চড়াতে হয় বলে। প্রস্রাবের স্বাচ্ছন্দের জন্য ডাব খায়। ভোরে নেবুজল মদ্যপানের

Effect কাটানোর জন্য। বাবুরা এসে একদিনে রাজা করে, ডাকাত-বাবুরা কত প্রতিশ্রুতি দিয়ে তারপর গলার হার নিয়ে পালায়। লেখাপড়া শিখলে নার্সের কাজ, নয়তো কোন অফিসে কাজ নিতাম। 'ঘুশীক' (?) অনেকেই থাকে, তবুও তো সম্মান থাকে। লুকোচ্চে হাঁড়ির খবর আর মাগিকে বাড়ির খবর দিতে নেই। ঘর করতে পারলে বিধবার সাজানো উপোস-টুপোস আর পুজো করবো। পাপ কাটাতে হবে তো। যদি কোন ভাল লোক থাকে, তবে তার ছেলেকে সব দিয়ে যাব। সে বলে— খুনেরা আমাদের জীবনের বন্ধু ; আগের জন্মে বন্ধু ছিল তাই এই দুঃসহ জীবন থেকে মুক্তি দেয়।

কলকাতা হতে টাটানগর ও প্রত্যাবর্তন।

জামশেদপুর বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন। ১৪/১১/৫৪

১। লালমাটির অঞ্চল বড় সুন্দর। নিকটে তিন-চারিটি রঙের সমাবেশ। লাল মাটি' সবুজ শালবন, কালো-নীল পাহাড় আর ফিকে নীল আকাশ।

২। পথের পাশে আকন্দ ফুল (?) বেগুনি রঙ গ্রামোফোন চোঙের মতো গঠন। অশ্বত্থ গাছ—আজ ধবলদেহ। ছাগলের বাচ্চা, সাদা রঙ, চার পায়ে কালো রঙ, যেন হাফ-মোজা পরানো।

৩। ধান ক্ষেতে ধান কাটে সারি সারি নারী, উর্বরতার প্রতীক, দেখে ছোট ছোট ধরিত্রী বলে মনে হয়।

৪। জঙ্গলের ধারে ছাগল চরায় এক মেয়ে, আর একদল ছাগল চরায় এক ছেলে। দুই পালের ছাগ ও ছাগীর কাম-সংসর্গ। ঐ দুই ছেলে ও মেয়ের কাম-সংসর্গের জৈব রোম্যান্স।

৫। পলাতক ব্যক্তি অনেক রাত্রে বাড়ি ফিরছিল, পুলিশের নজর এড়িয়ে। খুনের দায়ের আসামী সে। ধানক্ষেতের মধ্যে লুকিয়ে ছিল, দেখল রক্তাপ্লুত ভ্রূণ। তার নিজেরই স্ত্রীর ভ্রূণ, অবশ্য তার নিজেরই সন্তান। ছিন্নভিন্ন। এখন স্ত্রী অন্যের আসক্ত হয়েছে।

৬। এক নারী তার অবৈধ প্রণয়ীকে দেহ দান করতে চায়। কিন্তু নির্জন জায়গা পায় না। অবশেষে ঠিক করলো, শিবমন্দিরের মণ্ডপে, গভীর রাত্রে।

(ক) নারী অস্পৃশ্য জাতের মেয়ে।

(খ) দেবতার বিরুদ্ধে ঘৃণা ও বিদ্রোহ।

৭। সাইরেন বেজেছিল, জাপানী বিমান এসেছিল। A. R. R. আশ্রয়ে দুজনের দেখা। এক ব্যক্তি দরখাস্ত নিয়ে (ঘুষের টাকা নিয়ে)অনেকদিন থেকে সুপারিন্ট্যাডেন্ট ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্টকে খুঁজছিল। এইখানে সাক্ষাৎ। আসন্ন মৃত্যুর গর্জন উপরে নিয়েও তারা দর কষাকষি করছে, এবং ঘুষ দেওয়া-নেওয়া করছে।

৮। স্টেশনে একটি দরিদ্র লোক। বুকটা যেন পাঁজরের অশোকচক্র। কেন্দ্র হতে পাঁজরগুলি ব্যাসার্ধের মতো ছড়িয়েছে বৃত্তাকারে।

৯। দোপাটি, গাঁদা আর কসমস ফুটেছে, নভেম্বর মাস।

১০। এক কৃষক রমণী। সন্তানের মৃত্যু হয়েছে। শোকাহত। কিন্তু ভাগ্যকে জয় করবার স্পৃহা। সেই শোকের রাত্রিতেই ধানক্ষেতে, বনের নিভৃতে প্রণয়ীর সঙ্গে অথবা পতির সঙ্গে সঙ্গম করলো সন্তান লাভের আশায়।

উপন্যাসে বিবৃত তত্ত্বের মূল বিষয়গুলি

১। দুঃখ ও দুর্ভাগ্যের বিরুদ্ধে জীবনের বিদ্রোহ। পরাভব অস্বীকার কর।

২। জীবন রহস্যময়, সুন্দরতার সন্ধান, বিরাট ও বিপুল এক যাদু যেন চরাচরে বিবৃত, প্রাণী উদ্ভিদ ও প্রকৃতি জড়ের সঙ্গে ঐক্যবোধ, অনন্ততার ধারণা।

৩। আকাঙ্খার উচ্চতায় তৃপ্তি নেই, জীবন শুধু গতি নয়, ব্যালান্স অনুসন্ধান করে, একজনের গতি উদ্দাম, কিন্তু দায়িত্বহীন, আর একজনের গতি দায়বন্ধ। এর মধ্যে নির্ভুল কে? সুখী কে?

Climacteric Situation

১। মাতা কন্যার দেহবিক্রয়ের লাভে জীবনযাপন করে। লম্পট প্রতি রাত্রে মেয়েটাকে ডেকে নিয়ে যায়। একদিন জ্বর হয়েছে মেয়েটার কিন্তু এক বড়লোকের কাছ থেকে আহ্বান এসেছে। ঘরে অভাব, পয়সা চাই। বৃদ্ধা দালালকে বলে ঠিক করে, সে নিজেই যাবে। অন্ধকার ঘরে সঙ্গম। মেয়ে কাঁদছিল যে, সে আজ পারবে না, মরে যাবে যদি সঙ্গম হয়।

২। এক ব্যক্তি প্রতিশোধ নেবার জন্য এক নারীকে হত্যা করার জন্য ভুলিয়ে একনির্জন নিভৃতে নিয়ে এসেছে। ব্যক্তির সঙ্গে নারীর আলাপ চুম্বনে শেষ হলো, সঙ্গমে শেষ হলো অনুষ্ঠান। হত্যার ছুরিকা পড়ে রইল কোমরে গোঁজা।

৩। এক ব্যক্তির দুই স্ত্রী। বছরে ছ'মাস এক স্ত্রীর সঙ্গে, আর ছ'মাস আর এক স্ত্রীর সঙ্গে থাকে। দেখা গেল দুই স্ত্রীর প্রত্যেকেই বছরে ছ'মাস অন্য পুরুষের সঙ্গে থাকে। ব্যক্তির মনের দ্বন্দ্ব। মনোগেমির তত্ত্ব।

৪। ধানক্ষেতের অধিকার নিয়ে দুই মালিকের মধ্যে লড়াই। মাঠের ওপর দাঙ্গা চলছে। দুই দল লেঠেল মারামারি করছে। হাতীও লড়ছে কুকুরও লড়ছে।

ওদিকে আলের উপর দুই দলেরই মেয়েছেলেরা এসে জমা হয়ে পরিত্রাহি আর্তনাদ করছে। থাম থাম।

মদ আসে আরও ক্ষিপ্ত হয় লেঠেলরা।

৫। মেয়েটাকে পাওয়া যাচ্ছে না। কাহিনীর শুরু।

৬। পলাতক আসামী (হত্যাভিযুক্ত) লুকিয়ে ঘরে ফিরছে অনেক বৎসর পর। লুকিয়ে আশ্রয় নিয়ে আছে। পাশেই দফাদারের বাড়ি। স্ত্রীর উপপতি আছে। সব দেখছে ও বুঝতে পারছে লোকটা, কিন্তু প্রতিবাদ করতে পারছেনা। পাছে ধরা পড়ে যায়। শাস্তি! শান্তি?

৭। নারী স্বামীকে অবজ্ঞা করছে, বিশ্বাসভঙ্গ করেছে। কিন্তু কন্যা পিতৃভক্ত, বাপের উপর স্নেহ আছে। বাপ চলে যাচ্ছে। মেয়ে বাধা দেয়। বাপ বলে—তুই তো ওরই মেয়ে।

—না ববা, আমি তোমার মেয়ে।

[ব্যক্তি জানে, এই মেয়েটি অন্যের ঔরসজাত]

(গল্প : 'পরভৃতা')

৮। একটি ডোম (আদিবাসী) মেয়ে লেখাপড়া শিখছে। ভালোবাসতে চায় একটা ভদ্রলোকের ছেলেকে। যুবক ডোমদের প্রতি অস্পৃহা। সঙ্গিনীদের সঙ্গে ভাল ভাল কথার আলোচনা। দুই মনোভাবের সংঘর্ষ। কিন্তু শিক্ষিত ভদ্রলোক ওকে দেখছে নিতান্ত উপভোগের বস্তুর মতো। ধীরে ধীরে মনের পরিবর্তন। অশিক্ষিত ডোম যুবককেই শেষে ভালবাসে ও বিয়ে করে, এবং তৃপ্ত হয়।

লেখাপড়া শেখায় স্বামীকে। যেন একটা প্রতিশোধ নেবার আয়োজন। একদিন সুযোগ পায় ভদ্রলোককে নির্জনে পেয়ে। কিন্তু হত্যা করতে পারে না। বাধা আসে মনে। প্রকৃতি=নারী। নারীর প্রভাবে যুবক ডোম অভিভূত, শান্ত হয়।

তারপর যুবক ডোমও শিক্ষিত যুবকের বন্ধুত্ব। অন্তসত্ত্বা নারী। প্রসব হবে। ধাই-এর কাজ করে ভদ্রলোক যুবক, আর সাহায্য (পালকি ডাকতে যায়) আনতে যায় স্বামী ডোম।

শিক্ষিত যুবকের পরিণাম। রক্তসিক্ত হাত নিয়ে ভাবছে, স্বামী হলে কি ক্ষতি হতো ?

Ref: Situation

১। চোর ঢুকেছে ঘরে, দেখতে পায় শূন্য ঘরে একটা রোগা রিকেটি বোবা (-অন্ধ) মেয়ে শুয়ে রয়েছে। অত্যন্ত শীর্ণ ও মরণোন্মুখ।

২। দুর্ঘটনা, এক বিধবা, পাঁজরের সাতটি হাড় ভেঙ্গে গেল। তবু বেঁচে আছে। নিজেই আক্ষেপ করে—ভগবানের কি বিচার ?

৩। বাথরুম, দরজা নেই, মেয়েরা স্নান করে। প্রত্যেক মেয়েই গুণগুণ করে গান করে, যেন অন্য কোন লোক ঢুকে না পড়ে। স্নানের সময়।

৪। প্রায় পশু-আকৃতি সন্তান। রাক্ষস-রাক্ষস ভাব। এই সন্তানের প্রতি পিতামাতার সাইকোলজি।

দরিদ্র পরিবার। একজন আসে কিনতে। উদ্দেশ্য নেকড়ে বালক বলে রটিয়ে দিয়ে পয়সা কমাবে।

গল্প : জনৈকা নারীর অপতি সংসর্গজাত (গর্ভপাতের চেষ্টা করা সত্ত্বেও) এই রকম অমানুষ আকারের হলো। সেই সন্তানকে দিয়ে দিল হিজড়েদের কাছে। বহুদিন পরে এক চলন্ত সার্কাসের তাঁবুতে 'রাক্ষস' দর্শন। ঐ নারী দেখে যে তারই ছেলে।

৫। রোগী ভদ্রলোক বুঝতে পেরেছে, এই Operation-এই তার মৃত্যু।
পারেশন টেবিলে যাবার আগে সংসারের প্রতি প্রবল মায়ার টান। দেখতে চায়
লবাসাতে চায়। কী মূল্যবান হয়ে উঠেছে সব কিছু। কুৎসিত জমাদারণী
খিয়ার মুখটাও ভাললাগে।

৬। হত্যার চক্রান্ত। জনৈকা নারী এক ব্যক্তিকে বিষদানের জন্য প্রস্তুত হয়েছে।
ত্রিবেলা। বিষ খাওয়াতে গিয়ে মন বদলে যায়, নারী, সেই ব্যক্তিকে আসঙ্গদানে
ত করে চলে আসে।

৭। এক নারীর পিতার (অথবা সন্তানের) মৃত্যু হয়েছে। শোকার্ত অবস্থা।
নৈক ধনী ব্যক্তি উক্ত নষ্টচরিত্রাকে প্রায়ই উপভোগ করে থাকে। সেদিনও এস
ী। শোকার্তাকে দেখেও তার কামপ্রবৃত্তি নিরুৎসাহিত হয়না। শোকার্তা
রীও পয়সার জন্য সেই অবস্থাতেই ধনীর তৃপ্তি সাধন করে।

৮। নরেন চাকর একব্যাধিগ্রস্তা ঝি'র সহবাস করে। উপদংশে আক্রান্ত।
করি যায়, বিবাহিতা স্ত্রী ঘৃণা করে। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সদয় হয়। নরেন অন্ধ হয়।
ারো পাহাড়ের এক সন্ন্যাসীর কাছে নিয়ে যায়। দাদার কাঁধে চড়ে অন্ধ নরেন।
হু কষ্টসাধ্য পাহাড়, দুর্গম। দাদার ভ্রাতৃপ্রেম। সন্ন্যাসী ভূত পূজো করে,
তাপাতা দিয়ে চোখ বেঁধে দেয়। আরোগ্যলাভ করে নরেন।

৯। একটি হাসির ঘটনা। জনৈকা নারী আক্রমণের ভয়ে আত্মরক্ষার জন্য
কটি শূন্য দোলনায় শুয়ে পড়ে ও শরীর ঢাকা দিয়ে শুধু মুখটুকু ভাসিয়ে রাখে,
খে চুষিকাঠি। আক্রমণকারী এসে সত্যিই শিশু মনে করে দোলনাকে দোলাতে
কে। আর চারদিকে তাকায়, কোথায় গেল নারী?

১০। চোর। এক গালে চুন, এক গালে কালি। মাথা অর্ধেক কামিয়ে
ওয়া হয়েছে। চোরের পিছনে ভীড়। ঢিল পড়ছে, লাথি পড়ছে। চোর
লছে।

১১। এক বালক। তার মাতা পতিতাবৃত্তি করে। মাতার প্রতি বালকের
দ্ধা। সে তার মাকে মহিমান্বিতা মনে করে [Ref: শ্বেতকেতু] মাকে সে
জেই সাজায়, অভিসারের বা বাবুবরণের আগে।

১২। স্বামী জেনেছে, স্ত্রী অমুকের সঙ্গে প্রেম করেছে। স্ত্রী জেনেছে স্বামী
মুক মেয়ের সঙ্গে প্রেম করেছে। দু'জনেই ছাড়াছাড়ি হবে। Divorce-এর
দ্ধান্ত। পরস্পরের কাছ থেকে ভালভাবেই দুজনে বিদায় নেবার জন্য প্রস্তুত হয়।
বিদায়ের দিন। দু'জনের সাক্ষাৎ। নিভৃত। কথায় কথায় অন্য প্রসঙ্গ।
য়ময় ভাবনা। শেষে দু'জনে দু'জনকে জড়িয়ে ধরে। Confession আর
vorce-এর কথা নয়। দু'জনে একসঙ্গে মিলে ঘর মেরামতের কথা বলে।

১৩। মড়া পোড়ায় এক যুবক। নিঃস্বার্থপর সেবক পাগলাটে। এক
াড়িতে পুরুষ মরেছে, একটি স্ত্রীলোক আছে সেই বাড়িতে। 'অমর' একাই গাছ

কাটে ও শব দাহ করে। স্ত্রীলোকটি শুধু কাজে যোগান দেয়।

(ক) স্ত্রীলোকটির উপপতি মারা গিয়েছে।

১৪। কলেরা তাড়াবার জন্য গ্রামে কীর্তনের হুংকার

'শমন যা যা— ঐ নিতাই এল।'

Ref : Situation

১। এক নারীর সতীত্ব আক্রান্ত হয়েছে। কোন উপায় নেই। লোক বলবান, জোর করে বলাৎকার করবেই। এই অবস্থায় নারীর মনস্তত্ত্ব।

২। যতীনের স্ত্রী যতীনের অনুপস্থিতিতে মহাদেব ও শম্ভু কর্তৃক অপহৃ দু'জনেরই সঙ্গে সহবাস। পরে আদালতের সাহায্যে স্ত্রী যতীনের কাছে ফি আসে। স্ত্রী নতুন গর্ভবতী। মামলা (H. S. Dated 15. 11. 55)

৩। Prostitution :

See report of Social and Moral Hyginic Adviso Committee of the Social-Welfare Board. (H. S. 15. 11. 55)

৪। বিক্রমপুর। স্বদেশী আন্দোলনের যুগ। গ্রামে Highlander Soldi এল। জাহাজঘাটা হতে route march। স্কুল প্রাঙ্গনে তাদের আড্ডা। নে হয়ে পুকুরে স্নান করে। নারী ধর্ষণ। রায়বাহাদুর এবং জমিদারেরা মুরগী, মেয়েমানুষের ব্যবস্থা করেন। গ্রামের লোক খাবার যোগান দেয়।

৫। ভাই ফোঁটার দিনে এক গরীব বাড়ির ছোট মেয়ের আক্ষেপ, বিদ্রো মিষ্টি খাওয়াতে পারছেনা ভাইকে। অথচ এই মেয়েই অন্য দিন ভাই-এর মি কেড়ে খেত। কাঁদছে মেয়েটি।

৬। সৈন্যরা Shooting practice করছে। তাই দশটা গ্রামের লোককে গ্র ছেড়ে চলে যাবার সার্কুলার দেওয়া হয়েছে। সিংভূম। শীতকাল।

(আনন্দবাজার, যুগান্তর ১/১/৫

Social Notes

১। তিব্বতী স্ত্রীলোক তোকিয়া-দোলোমা একটি মেয়েকে ক্রয় করে পতি বৃত্তিতে নিয়োগ করে। তিব্বতী মেয়েগুলির নাম—Jahamyang, Lamo, Chen pupu।

পতিতালয় হতে উদ্ধারের পর মেয়েটাকে এলিয়ট রোডের হোমে রাখা হ যতদিন না সাবালিকা হয় ততদিন থাকবে। [See 373 1. P. C-১৮ বছর বয়ে কম মেয়েকে অসৎ উদ্দেশ্যে সংগ্রহ করা।] H. S. 28- 11. 53.

২। মদের দোকানের চাকরের ছেলে (জাতে গোয়ালা) গান শিখিয়ে এ কায়স্থ মেয়েকে বিয়ে করে মিথ্যা কায়স্থ পরিচয় দিয়ে। বিয়ের পর একদিন গহ নিয়ে চম্পট। H. S. 28. 11. 53

৩। নারীকল্যাণ আশ্রমের সুধারাণী (H. S. 28. 4. 54)—ভাই তা

া খাটিয়ে পয়সা পেতে চায়। ··একজনের কাছে ভাই তাকে বিক্রি করে। সে
নসংসর্গ করে। তারপর একজন রক্ষিতা রাখে। তার বিরুদ্ধে মাতা মামলা
৷ আদালত ও পুলিশ নারী আশ্রমে পাঠায়। ম্যানেজার যৌনসংসর্গ করে
৪। ভদ্রকালী নারী শিবির—dole বন্ধে দাঙ্গা। মেয়েরা দাঙ্গা করে।
attached Women's শিবির চাঁদমারীতে transfer করার আদেশ হতেই নারীরা
দ্রাহিনী। কেন?
৫। All Bengal Women's Home—Elliot Road। অনাথ শিশু পালিত।
ধ শিশু পালিত। লোকেরা এসে এদের ভেতর থেকে দত্তক পুত্র নেয়। পতিতা
ারিত। স্বামীর সঙ্গে পুনর্মিলন। ধর্ষিতা নারী কর্মপ্রাপ্ত ও শিক্ষিত।
iot Road-৪৯ নং।

Facts

'কাটোয়ার ডাঁটা—এক ব্যক্তির আপত্তি। চিঠি, আনন্দবাজার ১২/৫/৫৬,
ব্য—শ্রীখণ্ডের ডাঁটা বলা উচিত। চালান হয় কাটোয়া থেকে। জন্মায় শ্রীখণ্ডে

* * *

Ref গ্রাম্য জীবন

১. গ্রাম্য বেশ্যার মেয়ের বিয়ে। বঁটি-দা-এর সঙ্গে। একজন বাজে লোকের
৷ লতার সঙ্গে, চারার সঙ্গে। চারা শুকিয়ে গেল, নোয়া ভাঙ্গলো সিঁদুর
হ বৈধব্য নিল মেয়েটা। তারপর বেশ্যাবৃত্তি। বিয়ে না করলে নরকে যেতে
এই সংস্কার।

২. 'ঝলতা আদায়'—চালের কল চাষীদের ধানকেনার সময় ওজনে মণ প্রতি
সর বাদ দেয়। অর্থাৎ 'রসদ' বাদ দেওয়া। ধান ভিজা আছে, ধুলোও আছে।
় হেতু রসদ বাদ দেওয়া হয়।

৩. গঙ্গার নোঙর জালে বা মহাজালে মাছ ধরে পয়সা ওয়ালা ধীবর—সব
শ তুলে নেয়। গরীব জেলে. ডিঙ্গি নিয়ে ভাসা জালে ইলিশ ধরে।

প্রশ্ন।

১। জীবনের এই ব্যথাগুলি যদি না থাকত? তবে জীবন কেমন লাগতো?
৷ সুখী জীবনের স্বাদ কেমন?

২। মাতা মারা গিয়েছে (পিতা মারা গেল) বিমাতার কাছে পালিত হলো
৷। সেই বিমাতা এক ব্যক্তিকে বিয়ে করলো।
এই ব্যক্তির সম্পর্কে, বালকের মনোভাব।

৩। "বাবার বিয়ে"। বড় বড় ছেলেমেয়ে উৎসবের জন্য প্রস্তুত হয়েছে।
ভাত হবে। বাবা বিয়ে করেছে।

৪। দুই বৈপিতৃক (বৈপিত্রিক) ভাই। এক মা'র দুই ছেলে, কিন্তু। বাপের দুই ছেলে।

৫। Rape এর বর্ণনা। শুধু দুজনের খণ্ড খণ্ড বাক্যোচ্ছ্বাসের ধারা না, সর্বনাশ, পাপী, ছিঃ, লক্ষ্মীটী, ছাড়বো না, মরে গেলেও না। মানবো মাগো, চুপ! ইত্যাদি।

Plot

১। এক পাড়ায় আবির্ভূত হলেন এক দম্পতি। শুধু দুই সুস্থ বলিষ্ঠ স্ব ও স্ত্রী। ক্রমে ক্রমে এই দম্পতির সন্তান সন্ততি জন্মলাভ করতে থাকে। পাড় ছেলে ও মেয়েদের খুব প্রিয় ও আপনজন হয়ে ওঠে এই সব ছেলে পিলে। এই পাড় সবই বুড়াবুড়ি ছিল। এই প্রথম। এই প্রথম যৌবনত্বের উপহার দেখা দিল।

২। স্বামী নিরুদ্দেশ। স্ত্রী হতাশ হয়ে বছরের পর বছর তবু প্রতিক্ষা করে পুজো জপতপ ধরে। সধবা হয়েও বিধবার জীবন। লালপেড়ে শাড়ি পর চায় না। পোঢ়া হয়েছে, চুলে সাদা দেখা দিয়েছে মহিলার।

(ক) এমন কালে স্বামী ফিরে এল। স্বামীর দাবী, রাত্রিতে শয্যাসঙ্গিনী ক কামবাসনা তৃপ্তির, স্ত্রীর মনের দ্বন্দ্ব। প্রশ্ন—লালপেড়ে শাড়ি পরবার স্বপ্ন সাধ করবে কি এই নারী?

(খ) স্বামীর ফটো পুজো করতো। স্ত্রী বৃদ্ধা হলো। বৃদ্ধ স্বামীও ফি এল। কিন্তু স্ত্রীর মনে এক যুবকের প্রতি আকাঙ্খা। (গল্প : ভোরের মালতী

Plot

Liquidator অর্থ আর এক প্রকারের বৈধ চোর। অসৎ কাজের সহায়ক মাসে ২ হাজার টাকা ফি নেয়। ইনি এক জনশ্রদ্ধেয় ব্যক্তি।

একটি প্রতিষ্ঠানের জন্য তদন্ত কমিটির কাজ। দেখা গেল বিচিত্র বিচিত্র অসাধুত ব্যাপার। অদ্ভূত।

সাইকো গল্প

১। আমার ঘরে গান্ধী সাহিত্য দেখলেন ভদ্রলোক। বললেন—আপ বিবেকানন্দকে অসম্মান করেন কেন?

২। এক মুহূর্তেই প্রতিজ্ঞা ও নীতি বর্জন করে বিপরীত নীতি, বিপরী ব্যবস্থা ও বিপরীত ব্যক্তির সঙ্গে হাত মেলালেন নিশিবাবু। বললেন—এটাই হ Scientific attitude. অবস্থার পরিবর্তনে নিজেকে adjust করে নিতে হয়।

৩। আমি চেষ্টা করেছিলাম ভাদুড়ীর উপকার করতে। কিন্তু কেউ আমা কথা গ্রাহ্য করলো না। ভাদুড়ী উপরওয়ালার সঙ্গে খাতির জমিয়ে কাজ বাগিয়ে ফেললো। কিন্তু আমার প্রতি কি ব্যবহার। উপেক্ষা, তুচ্ছতা ও বিদ্রূপ।

সাইকো

১। লোকটা সরে বসে (ট্রামে) আমাকে বসতে জায়গা দিল! কি আশ্চর্য

একে ভদ্রলোক, তায় শিক্ষিত, তায় ট্রাউজার, তায় বাঙ্গালী—কি আশ্চর্য এও সম্ভব ?

২। পরিচিত বন্ধু লেখকের বই বিক্রি হচ্ছে। শুনে মনে রাগ হয়। অবন্ধুর সুখবর শুনে রাগ হয় না। তখন বুঝলাম, আমি সাহিত্যিক এবং বাঙ্গালীও বটে।

৩। ব্যক্তিগত ভাবে ওরা মন্দ ছিল না। কিন্তু যেই দশজন মিলে একটা দল বাঁধলো, সেদিন থেকে ওরা নিষ্ঠুর ও স্বার্থপর হয়ে গেল। ওরা যা করে তাই উচিৎ মনে করে। যা ইচ্ছে হয় তাই করে। সংঘবন্ধতার পাপ।

Plot

১। পতিতা পড়ায় এক ভদ্রলোকের পরিবার। যুবতী মেয়ে আছে। এক লম্পট ভুল করে এই বাড়িতে ঢোকে ও মার খায়। যুবতীর এই যুবকের প্রতি সহানুভূতি। একদিন এই লম্পটকেই গোপনে ডাকে যুবতী এবং আত্মদান করে।

২। পঞ্চায়েৎ-এর পুরোহিত। এই পুরোহিত এক বিধবার গর্ভসঞ্চার করেছে। জনতার সমক্ষে বিধবা নারীর বিচার। গর্ভাবস্থায় স্ফীতদেহ, বিধবা। চোখে অশ্রু, পুরোহিত তার পাপের জন্য ঈশ্বরের কাছে অভিযোগ করলেন। শাস্তি দান করা হলো বিধবাকে। অভিশাপ—যেন প্রসবকালে মরে যায়। ঘটনা—খৃষ্টান পঞ্চায়েৎও হতে পারে। David Hume-এর life.

৩। Aristocrat, তাঁর বাড়িতে জনৈক বিখ্যাত ব্যক্তির সংবর্ধনা। স্ত্রী ও পাঁচটি ছেলেমেয়েকে বাণী মুখস্থ করিয়েছে। পাঁচ বছরের মেয়েটাও পণ্ডিতী ভাষায় সংবর্ধনা জানাচ্ছে।

৪। গ্রামজীবনের সাধারণ মানুষগুলিকে অসাধারণত্ব রূপায়িত করা। কী দুঃসাহসিক মহৎ, সুন্দর রূপকথার নায়কের মত ঐ চৌকীদার, চাষী, মাঝি, কুম্ভকার, সন্ন্যাসী, ওঝা, সাপুড়ে ইত্যাদি। Deification of ordinary man.

৫। মতিহারি স্টেশনের ওয়েটিং রুমে সদ্য প্রসূত যমজ শিশু. দুজনেই নিহত, গলা টেপা ও গলায় ছুরিকাঘাত। একটি পিতলের হাতলওয়ালা ছুরি নিকটে। অবৈধ প্রণয়জাত সন্তান।

(আনন্দবাজার ঃ 23. 4.'53)

৬। Leper's kiss. সেই নারী ভালোবাসতো তার স্বামীকে। বিয়ের আগে আর এক জনকে ভালবাসতো স্বামীকে শ্রদ্ধা করে, কিন্তু অনুরাগ নেই। পূজাপাঠে মগ্না যুবতী স্ত্রী। একদিন, বহুদিন পরে নিভৃতে দেখা হলো প্রাক্তন প্রণয়ীর সঙ্গে। এই প্রণয়ী তখন কুষ্ঠগ্রস্ত। মুখে লাল লাল দাগ। নারী তার আবেদনে মুগ্ধ ও মত্ত হয়ে কুষ্ঠরোগগ্রস্তের মুখে চুম্বন দান করে।

৭। জনৈকা ব্যক্তি। স্ত্রী তাকে খুব শ্রদ্ধা করে, এই ব্যক্তি নীরবে দাঁড়িয়ে দেখছে অন্তরালে হতে, এক কামবলিষ্ঠ ব্যক্তির সঙ্গে তারই স্ত্রীর রমণক্রিয়া চলছে।

স্ত্রীর মুখে সে কী ভাব ! অন্য এক স্বরূপ প্রকাশ ; দেহের আবেদন মত্ত করে তুলছে নারীকে। কেথায় সেই লাজুক শান্ত কুণ্ঠিত মূর্তি।

Plot

১। জনৈক শুদ্ধবুদ্ধি ব্যাক্তির সঙ্গে এক যুবতী সন্ন্যাসিনীর ঘনিষ্ঠতা। যুবতীকে শ্রদ্ধা করে লোকটা। নিষ্কাম ঈশ্বরীয় তত্ত্ব ভোগবিহীন জীবনের কথা বলে। কিন্তু একদিন নির্জনে এই সন্ন্যাসিনীকেই rape করে ব্যাক্তিটি। তারপর ব্যক্তির মনের জ্বালা। আত্মহত্যার সংকল্প। কিন্তু সন্ন্যাসিনীর প্রকৃতিতে পরিবর্তন। সে সুখ পেয়েছে এবং ঐ ব্যাক্তিকে বান্ধব বলে মনে করে।

[ব্যাক্তিকে সন্ন্যাসিনী বলে, তুমি ঠিক কাজ করেছ। নিজের চরিত্রহীনতার কথা মিথ্যা মিথ্যা বলে। লোকটার মন নিশ্চিন্ত হয়। কিন্তু এই সন্ন্যাসিনী শেষে আত্মহত্যা করে।]

২। এক ঘড়ির মিস্ত্রী। ঘড়ি মেরামত করে। Time adjust করে। বিয়ের লগ্ন নির্ণয়ে কোন ভুল হয় না এক জনের ছেলে হবে, ঘড়ির time ঠিক করিয়ে নিয়ে যায়, যেন জন্ম সময় জানতে কোন ভুল না হয়। মৃত্যুর সময়ও এই মিস্ত্রীর ঘড়ি ঠিক ঠিক বলে দেয়। এরই জীবনের ও কারিগরীর সম্পর্ক নিয়ে একটি তত্ত্বপূর্ণ গল্প। (গল্প : কালপুরুষ)

Plot

১। জংলী গ্রামের এক চাষী দেখছে তার ছেটে ছেলে গরু চড়াচ্ছে এবং হিংস্র আবেগ ছুটে আসছে এক বাঘ। লাফ দিয়ে বাঘ ছেলেকে মুখে করে নিয়ে গেল। ক্ষুদ্র একটা বাঁশের লাঠি তুলে কাঁপতে থাকে চাষী। ছোট ছেলে তার বাঁশের লাঠি দিয়ে বাঘের গায়ে একবার আঘাত করে। বাঘে নিয়ে গেল অসহায় ছেলেকে।

২। এক ভদ্র পরিবার নীরব গৃহ। পিতামাতা ও কতিপয় আত্মীয় রয়েছেন, ব্যস্ত ও উদ্বিগ্ন। কারণ, ললিতার প্রসব বেদনা। অবৈধ সন্তান প্রসূত হতে চলছে। অভিভাবকেরা সেই সন্তানকে হত্যা করার জন্য তৈরী হয়েছে। ডাক্তার রাজী হয়েছে। ললিতার কান্না। একবার দেখতে চায় সদ্যপ্রসূত ছেলেটাকে। অভিভাবকেরা আপত্তি করে।

৩। গ্রামের চাষীর জমি নিলাম হচ্ছে। ডাক উঠছে। ঘটনার বাস্তবোচিত বিবরণ। ঘটনার করুণতা জমির উপর স্বত্ত্ববোধ, instinctive ?

Philosophy in plots

Primitive mind-এর বেদনা, আগ্রহ, আনন্দ ও প্রকাশ।

উদাহরণ, বাউরীর মেয়ে, ডাক বাংলায় থাকে। জেলা বোর্ডের মাস্টার মশাই তার উপর আসক্ত। কিন্তু আর একজন বাউরী যুবক আসক্ত। এর প্রেমের পদ্ধতি primitive বাউরী মেয়ের মন আদিমতার চেয়ে আধুনিকতার প্রতি বেশি আসক্ত হয়। মাস্টারকেই একদিন আত্মদান করে।

কিন্তু পরবর্তী reaction! মাস্টার তার আপন হয় না কেন? অথচ সেই বাউরী যুবক আপন করতেই চায়।

Sex—তাড়না অপেক্ষা উদর-তাড়না বেশি শক্তিশালী। জনৈকা নারী মদমত্তা হয়ে আছে, আজ সন্ধ্যায় প্রণয়ীর সঙ্গে মিলিত হবে। কিন্তু সেদিনই economic কর্তব্যের দায় দেখা দিল। অন্য কাজে সময় দিতে হবে, তা না হ'লে ওরা খাবে কি? কাজেই সন্ধ্যার আহ্বান ভুলে গেয়ে কাজ করতে চলে গেল নারী।

শোকের সান্ত্বনা। জীবনতত্ত্বের আর এক ব্যাখ্যা। একজনের প্রিয় পুত্রের মৃত্যু হয়েছে। সকলে এসে সান্ত্বনা দেয়। একজন এক এক রকম ব্যাখ্যা করে। (১) যিনি দিয়েছিলেন তিনি নিয়ে গেলেন। (২) এই আঘাতও ভালর জন্যই। (৩) ভগবানের করুণা বলে মেনে নাও। (৪) Whom god loves die young. (৫) তুমি কেউ নয়; পরের জিনিষ কাছে পেয়েছিলে, আপন বলে মনে করেছিলে, সেই মোহ ভাঙ্গলো, ইত্যাদি।

এক নারী অন্য এক পুরুষের গান শুনে মুগ্ধ হয়েছে, আর বিয়ে করেছে। কিন্তু গানের জন্য মনের যে প্রেম, সেই প্রেম যৌন সম্পর্কের জীবনে সত্য হয় না এবং যৌনসঙ্গের মধ্যে একটা অতৃপ্তি থেকে যায়। Conflict—এই নারীর মন কি ভুল করলো?

Plot

১। শিশু সন্তান দেখছে মাতার উপর পিতার ব্যবহার বড় নিষ্ঠুর। এই নারীর সঙ্গে অন্য একজনের প্রণয়। নারী নির্ভর করে আছে সন্তান কাকে চায়। যে দিন শিশু বলে—তুমি ওর কাছে যাও ও ভাল, বাবা ভাল নয়, সেদিনই নারী প্রণয়ীর কাছে আত্মসমর্পণ করে।

[পরবর্তী ঘটনা একদিন এই ছেলেই বলে—বাবা ভাল। নারী কেঁদে ফেলে]
(গল্প 'মনোনয়ন')

২। পোষা ভোঁদড়টা যেন একটা সিন্ধু ঘোটক। মাছ ধরে আনছে অমিত বিক্রমে।

[অপরের একটি পোষা কালবোশকে শত্রুতায় বশে ধরবার জন্য ভোঁদড়কে ছেড়েছে কালই ধীবর। কিন্তু এক বিরাট বেয়াল ভোঁদড়ের ঠ্যাং কামড়ে ধরেছে। ভোঁদড়ের আর্তনাদ।]

৩। স্বামীর আচরণে (অপ্রেম) ক্ষুব্ধ হয়ে বিল্ববালা দাসী গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করার চেষ্টা করে। হঠাৎ এসে বাধা দেয় দুর্যোধন দাস। দুর্যোধনের সঙ্গে বিল্ববালার প্রেম হয়। কিন্তু পঞ্চায়েৎ এই কথা জানতে পেরে দুর্যোধনকে জরিমানা করে ২৫ টাকা। দুর্যোধন আত্মহত্যা করে। পরদিন বিল্ববালাও আত্মহত্যা করে। (আনন্দবাজার ২৬/৫/৫৫)

৪। স্বামী রোগজীর্ণ দেহ। স্ত্রী স্বাস্থ্যবতী। স্ত্রী এই কারণে খুবই

লজ্জিত। নিজের স্বাস্থ্যকে ধিক্কার দেয়। কিন্তু ভাবে, ওরই সেবার জন্য থাকুক এই স্বাস্থ্য।

৫। এক উচ্চ চরিত্র ব্যক্তি (যিনি সমাজের এক asset) একটি বালককে কুয়ো থেকে বাঁচাতে গিয়ে নিজে প্রাণ হারালো (কিংবা অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা)। বালকটি বেঁচে রইল। বড় হলো। ভবিষ্যতে এক Criminal হলো সেই বালক।

Q. মহৎ কার্যের পরিণাম। এ কি পেল সমাজ ? (গল্প : কুটিল পন্থ)

৬। ছেলে exercise করছে। দেখে বাপের মন বিষণ্ণ। খোরাক আসবে কোথা থেকে ? T (গল্প : অব্যায়ামেষু)

৭। বৃষ্টি নিয়ে জুয়া।

Plot

১। ভূমিকম্পে সমাহিত দুটি জীবন্ত নর ও নারী। বেঁচে আছে স্তূপের তলায়। সমস্যা—খাদ্য এবং যৌন আনন্দ। নারীর স্তনপান করে সেই পুরুষ। তারপর যৌনবাসনা। কিসের জন্য ? কী feeling ? এই প্রশ্নের বিশ্লেষণ।

২। পাড়াতে বাস করে এক পতিতা। তার ছেলে প্রসূত হলো। পড়ার লোক কেউ সহযোগিতা করে না। মেয়েরা কেউ যায় না। কিন্তু যেই ছেলের কান্নার শব্দ, সেই মুহূর্তে ছোট ছোট ছেলেমেয়ের দল দৌড় দিয়ে গেল। শাঁখ বাজিয়ে পাড়া মাত করে তুললো। (গল্প 'মহানাদ')

৩। এক ভদ্রলোক নিজেই লিখে দিচ্ছে তার মৃত্যুর পর কিভাবে শব সংকার করতে হবে। শ্রাদ্ধ কি ভাবে ও কি রকম নিমন্ত্রণ করতে হবে। টাকার যোগাড় করে হিসাব রেখে যাচ্ছেন।

শিশু-উপন্যাস···

গ্রাম্য দেবতার পুজো। [ক্ষিপ্ত শবরী—কুকুরের কামড়ে পাগল হলে পুজো দিতে হয়।]

Plot

১। নূতন বাড়ি তৈরী হচ্ছে ! মালিক দেখছে, একটি বালক।

মজুর কাজ করছে। এই বালক তারই ঔরসজাত। অমুক মজুরের স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্কজাত সন্তান। ভদ্রলোকের feeling (১) এক এক সময় মজুর হয়ে যেতে ইচ্ছে করছে।

Subjects and Patterns

১। মহাভারতীয় প্রেমোপাখ্যানগুলিকে ছোটগল্পে রূপায়ণ।*

২। ব্রতকথাগুলিকে অর্ধ-কাব্যিক গদ্যে ছোটগল্পে রূপায়ণ—সুব্রতা।

৩। মঙ্গলকাব্যগুলিকে ছোট গল্পে বড় আকারে রচনা। Lamb's Tales

* গ্রন্থ : 'ভারত প্রেমকথা'

from Shakeshpeare-এর অনুসরণে।—মঙ্গলকণিকা।

৪। প্রাকৃতিক বস্তুর উৎপত্তি রহস্যের কাহিনী। মহাভারতীয় উপাখ্যান অনুসারে পর্বত, পূর্ণিমা, জ্বর, মৃত্যু, ছায়া ইত্যাদি উৎপত্তির কাহিনী। Legends of Greece and Rome এর সনুসরণে।

৫। ক্লাসিক বিষয় এবং প্রশ্ন এবং অনুভব এবং কল্পনা নিয়ে নিবন্ধাবলী—সুচিরা।

৬। আত্মজীবনীর ভঙ্গীতে লিখিত উপন্যাস। T

৭। মহাত্মা গান্ধীর জীবনী। শুধু গল্পের দ্বারা বিবৃত ও ব্যাখ্যাত। গান্ধী-জীবনের গাল্পিক ঘটনাগুলির অবলম্বনে। জীবনী রচনার নূতন পদ্ধতি। X

৮। প্রবাদগুলিকে গল্পে পরিণত করা। দুই শ্রেণীর কাহিনী বিভাগ। (ক) ব্যক্তিত্ব এবং (খ) নীতিগত। যেমন (১) হাঁদা-গঙ্গারাম, (খ) গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল।

৯। রবীন্দ্র সঙ্গীতগুলির উদ্ভব-ইতিহাস অবলম্বনে লেখা কাহিনীমালার ভিতর দিয়ে রবীন্দ্রদর্শন ব্যাখ্যাত।

১০। কাশ্মীর ও পশ্চিম পাঞ্জাব হতে উদ্বাস্তুর আগমন। চলমান Column-এর সঙ্গে নায়ক-নায়িকা আসছে। দুই জাতি তত্ত্বের আলোচনা। এই বিষয় নিয়ে উপন্যাস। ভারত-খণ্ডনের বেদনা background.

T আত্মজীবনীমূলক স্কেচ—'—সেদিনের ঝরাপাতা'

X গান্ধীজীবনী—'অমৃত পথযাত্রী'

১১। বাঁকুড়ার বাউড়ী সমাজ-উপন্যাস [Social Decay]

১২। সুন্দর বনের মাহিষ্যসমাজ-উপন্যাস [Nature Vs. Man]

১৩। বালুরঘাটের সাঁওতাল সমাজ-উপন্যাস [আর্য Vs. অনার্য]

১৪। আসানসোলের আগুরি সমাজ-উপন্যাস [Soil Vs mealic]

১৫। হিমালয়, পার্বত্য সৌন্দর্যের আধারে শিলং—দার্জিলিং নিয়ে মধ্যশ্রেণীর প্রেমের উপনাস।

১৬। সাইকো-গল্প। চরিত্র-চিত্রণ। ছোট ছোট স্কেচ

১৭। কিংবদন্তী অবলম্বনে গল্প। T

১৮। মুসলমান সমাজের জীবন নিয়ে উপন্যাস। ভাষায় ফার্সি ও আরবী শব্দের সুপ্রয়োগ।

১৯। লঘু-আরণ্যক। ছোটদের উপন্যাস। শিকারকাহিনীর ভঙ্গীতে জীব, প্রকৃতি, উদ্ভিদ, ফুল, ইত্যাদির প্রাণ-সামঞ্জস্যের তত্ত্ব।

২০। সিন্ধু সভ্যতার পটভূমিকায় উপন্যাস।

২১। বৈদিক সভ্যতার পটভূমিকায় উপন্যাস।

২২। অদ্ভুত ও উদ্ভট—আনন্দবাজার পত্রিকার ফাইল হতে দৈনিক বিচিত্র ঘটনার সংগ্রহ। অদ্ভুত ঘটনা রাজনৈতিক ঘটনা, মামলা।

২৩। কথাসরিৎ সাগরের গল্পগুলি।

২৪। পুরাণের গল্পগুলি।

২৫। সমুদ্রতটের জীবন—দীঘা, মেদিনীপুর—এই স্থানের জনসাধারণের বিশেষ করে ধীবর জীবনের দুঃসাহস নিয়ে লেখা উপন্যাস।

২৬। ধলভূমগড়ের জনজীবন—উপন্যাস।

২৭। ডুয়ার্স অঞ্চলের জনজীবন—উপন্যাস।

২৮। সংস্কৃত নাটকগুলির কাহিনী অংশ গল্পের আকারে রচনা। মধ্যে মধ্যে কাব্যিক (অনুবাদ) উদ্ধৃতি। এক্ষেত্রেও Lamb's Tales-এর পদ্ধতি অনুকরণ।

T গ্রন্থ ঃ 'কিংবদন্তীর দেশে'

২৯। তীর্থগুলির সাংস্কৃতিক পরিচয় ও নিসর্গমাধুর্য এবং কাহিনী নিয়ে উপন্যাসেরই রকমের এক রচনা। একটি আধুনিক কাহিনী মিশে থাকবে।

Mystory, Mysticist কিছুর অন্বেষণ। Pilgrims' Progress.

৩০। আন্দামান। (উপন্যাস) ধর্মের উদ্ভব। নানা জাতির এবং অপরাধী মানুষের সামাজিকতা ও ধর্ম সৃষ্টির প্রয়াস।

৩১। মরিসাস—উপন্যাস।

ব্রিটিশ গায়েনা—উপন্যাস।

৩২। গারো পাহাড় (তুরা) [এখানে বাঙালী আছে]

৩৩। আগরতলা। হাতীর উৎপাতে পীড়িত উদ্বাস্তু উপনিবেশ। বন্য জাতির সঙ্গে সংস্পর্শ।

Psycho-Story

১। অফিসে বসে অন্যমনস্ক হয়ে একটা দুঃখের কথা ভাবছে রমেশ। দু'ভাই মারা গেছে, মা কাঁদছেন খেতে বসে।

সহকর্মীরা মুখ টিপে হাসছে ও টিটকারী দিচ্ছে যে, রমেশ কোন মেয়ের প্রেমে পড়েছে। প্রমাণও আছে, মির্জাপুরের মোড়ে অভিনেত্রী চারুমতীর বাড়ীর কাছে ঘোরাঘুরি করতে দেখা গেছে রমেশকে। আসল কথা হলো রমেশ সেখানে কবিরাজের ওষুধ আনতে যায়।*

সুধীর সরকারের আমন্ত্রণে সাহিত্য সম্মেলন। এপ্রিল মাস (১৯৫৫) যদুনাথ সরকার বললেন—রবীন্দ্রনাথের পর থেকে আজ পর্যন্ত বাংলায় উল্লেখযোগ্য কোন সাহিত্য সৃষ্টিই হয় নি। তিনি বললেন, এই বৎসর (তারাশংকর ও রাজশেখর সম্পর্কে) যে রবীন্দ্র স্মৃতি প্রাইজ দেওয়া হয়েছে, সেগুলি একটা বই-এর নাম ধরে

* লেখকের দুই অনুজের অকাল মৃত্যু হয়।

দেওয়া হয়েছে. যদিও এই বইগুলি সাহিত্য-কীর্তি নয়। ওঁদের প্রাইজ দিতে হবে, এই হচ্ছে সিদ্ধান্ত। সুতরাং একটা বই-এর নাম করে দিয়ে দেওয়া হলো।

সাহিত্যের প্রতি কী অবিচার! মিথ্যার সম্মান!

প্রেস কমিশনের রিপোর্ট বলে—মিথ্যা Circulation figure বড় করে দেখাবার জন্য কাগজওয়ালা কেউ কেউ সত্যই অনেক কাগজ ছাপে, যদিও কাগজের গ্রাহক নেই এবং বিক্রীও হয় না। কিন্তু এতে লোকসান নেই। ছাপা কাগজ ওজন দরে বেচে বেশ লাভ হয়।

শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যুর পর কলকাতায় বাঙালী ডাক্তারদের কদর্য মনোবৃত্তি। কাশ্মীরের ডাক্তার ও তার চিকিৎসার ভুল ধরে বহু বিবৃতি।

অথচ এই ঘটনারই কয়েকদিন পরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী (অসমীয়া) শ্রীযুক্ত বড়গোহাইন কলকাতার ডাক্তারেরই হাতে অ্যাপেনডিসাইটিস অপারেশনে মারা গেলেন। ১৯৫৬ সালের জুনের পর]

এই অক্ষমতায় কলকাতার ডাক্তার কি লজ্জিত?

কলকাতার ময়দানে বাঙালী বীর ব্রিগেডিয়ার সেনের মৃত্যুতে শোকসভা হয়। কাশ্মীর যুদ্ধে ব্রিগেডিয়ার সেন মারা গিয়েছে, এই ব্যাপার। অথচ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। কোন ব্রিগেডিয়ার সেন মারা যায় নি। সভাপতিত্ব করলেন বিনয় সরকার।

১৫ই আগস্ট ১৯৫২ সন্ধ্যায় ভূমিকম্প। অনন্দবাজার সম্পাদকীয় লিখলো, নেহেরুর পাপে এই ভূমিকম্প হয়েছে।

22/8/55, Journalists Association-এর প্রস্তাব। তিনমাস বোনাস দাবী। কিন্তু এই প্রস্তাব কাগজে ছাপতে সাংবাদিকদের কত ভয়। তিন দিন দেরী হয়ে গেল। অথচ এরাই Freedom of voice এর জন্য সরকারের বিরুদ্ধে কত তর্জন গর্জন করেছিল। [ময়দানে সাংবাদিকদের পুলিশ প্রহার ঘটনা] [ঘটনা হয়েছিল দু'বছর আগে]। তাতে Tribunal—'জারজ' সম্পাদকীয় নাকি উচ্চ সাহিত্যিক উৎকর্ষের লেখা [সুধাংশু বসু ও মনীন্দ্রনারায়ণ রায়ের সাক্ষ্য]

2.9.55. Hindusthan Standard নাট্য সমালোচনা (পথের পাঁচালী) প্রবন্ধের আরম্ভেই লেখক স্বীকার করেছেন—চিত্র সমালোচনায় বিশ্লেষণের কোন মূল্য নেই। অর্থাৎ নিজেদের মিথ্যাবাদিতার স্বীকৃতি। এই কথা বলে নিয়ে বলা হয়েছে—কিন্তু এইবার সত্য কথা বলছি।

যদুনাথ সরকার ও History of Bengal, Dacca University, লক্ষ্মণ, সেন ও অষ্টাদশ অশ্বারোহীর বঙ্গবিজয় কাহিনী অদ্ভুত interpretation.

ঐতিহাসিক রমেশ মজুমদারের জয়পুর বক্তৃতা। ১৯৫৪ সালের জয়পুর প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন। ইতিহাসের কদর্থ।

ভাষা ভিত্তিক প্রদেশ নিয়ে কংগ্রেসী উভয়েরই Non-Sense, ঘটনা জানুয়ারী ১৯৫৬।

বিধান রায়ের প্রস্তাব— বঙ্গ বিহার এক হউক ২৪/১/৫৬

তারাশংকরের গৌহাটি (কিংবা শিলং) বক্তৃতা—'মহাভারতের নচিকেতা'—সম্ভবতঃ পূজার সময় (১৯৫৫ সাল)

বাঙ্গালীর সংস্কার— বাঙ্গালী ভারতের স্বাধীনতা এনেছে। স্বাধীনতার জন্য সবচেয়ে বেশি Contribution. আমার ধারণা বিপরীত। Terrorist আন্দোলন ও সুভাষচন্দ্র স্বাধীনতাকে ব্যাহত করেছে।

2/11/55 স্টেটসম্যানে সম্পাদকীয় প্রবন্ধে divorce-প্রথার বিরোধী যুক্তি প্রকাশ। মার্গারেট ও গ্রুপ ক্যাপটেন টাউনসেন্ডর প্রণয় ও বিবাহ বাতিল সম্পর্কে মন্তব্য।

ভাষাভিত্তিক প্রদেশ দাবী সম্পর্কে তারাশংকরের উদ্যোগে সাহিত্যিক আবেদন। আমি ও প্রথম বিশী সই করি নাই।

কলিকাতার ভাষা কমিশন (H. S. 23/11/54) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অদ্ভুত সাক্ষ্য। ইংরাজী পক্ষে। যদু সরকার ও নির্মল বসু ভুল তথ্য জ্ঞাপন করে।

বাংলার হুঁকোখেকো গবর্নর সিনেমা অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের দিয়ে ক্রিকেট খেলিয়ে চাঁদা সংগ্রহ সৎকাজের জন্য। H. C. Mukherjee. ১৯৫৪ সাল।

কোন সাহিত্যিককে কোন দিন নিমন্ত্রণ করে না governor H. C. Mukherjee.

বিধান রায়ের গর্ব—W. B. Govt-এর Finance শূন্য ছিল (স্বাধীনতার সময়) আজ কত বড়। কত devlopment Work হয়েছে। ১৯৫৪-৫৫ উক্তি। ব্যাপার হলো Centre-এর প্রচুর সাহায্য।

Neogi Coommittee, Kshitish Neogi-ই বাংলাকে Central fund-এর quota কম করিয়ে দেবার জন্য সুপারিশ করলো।

রাজাগোপালাচারী বলেছেন (১৯৫৫ সালে ডিসেম্বর মাসে) রামায়ণ ও মহাভারত থেকে তাঁর গবেষণামূলক লেখাগুলিই মানব-সেবায় তার শ্রেষ্ঠ দান। অন্য কোন কীর্তি দাবী করেন না।

সাংবাদিক আইন। Workmen. আনন্দবাজার মালিক পক্ষের reaction. A. I. N. E. C. এর সভাপতি Sachin Sen-এর বাজে ভাষণ। সম্পাদক নাকি 'Liteary agent of the proprietor'.

"Nehru"-র উক্তি— 'Freedom of the proprietors to make money' =Freedom of Press.

'Press in India is not free, it is proprietor's Press' Nehru.

নেপালবাবা, উড়িষ্যা। কুসংস্কারের জয় জয়কার। বড় বড় ডাক্তারের এবং উড়িষ্যার মন্ত্রীদের বিশ্বাস। শেষকালে ডাঃ রামন-এর ধিক্কারে ১৪৪ ব্যবস্থা গ্রহণ।

* * *

State Reorganisation Commission (১৯৫৫), যদি প্রত্যেক All India

Political Party-র কাছ থেকে ভাষাভিত্তিক রাজ্যের ম্যাপ দাবী করতেন, তাহলে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির কুটবুদ্ধি জব্দ হতো, কারণ, কেউ সকলের সন্তোষজনক ম্যাপ দিতে পারতো না।

২৩/৫ — ২৫/৫/৫৬

Ref :

বুদ্ধজয়ন্তী দেশপ্রিয় পার্কে ঐতিহাসিক যদুসরকার বললেন, 'বটতলায়' বুদ্ধ সিদ্ধি লাভ করেছিলেন।

গরুড় স্তম্ভের লেখাকে বুদ্ধবাণীর সার বলে বর্ণনা করলেন।

শৈল মুখার্জী বলেন— 'পঞ্চশিলা'।

যখনই যে ব্যক্তির স্মৃতিদিবস পালিত হয়, জনসভায় ও খবরের কাগজে তারই নামে উচ্ছ্বসিত homage-বলা হয়, ইনিই ভারতের মুক্তির গুরু, জনক, ইত্যাদি। তিলক সম্বন্ধে যা, শ্যামাপ্রসাদ সম্বন্ধেও তাই।

শম্ভু দুর্ভিক্ষপীড়িতের ছবি তুলেছিল। সুস্থ বলিষ্ঠ ও ফাজিল কতকগুলি লোককে বসিয়ে ফটো তোলান হলো। শম্ভু বলে—গেঞ্জি খোল, খালি গা হ, তেড়ি মুছে ফেল, নিঃশ্বাস টেনে দমবন্ধ কর। পাঁজরাগুলা ফোলা, হাঁ করে থাক্। এই ছবি সুন্দরবনের দুর্ভিক্ষপীড়িতের ছবি।

অনশনে মৃত্যু। বিরোধী পক্ষের প্রচার। মারা গেল লোকটা খেয়ে খেয়ে। জীবনবীমা আছে। কাগজে বের হলো অমুকের অনশনে মৃত্যুবরণ।

বুদ্ধজয়ন্তী ২৪/৫/৫৬। অদ্ভুত ব্যাপার, কলকাতার জয়ন্তী কমিটি এই উৎসবকে 'জন্মোৎসব' বললেন। এটা পরিনির্বাণ উৎসব।

জুলাই (১৯৫৭) আনন্দবাজার :

সত্যেন্দ্র বসু বিশ্বভারতীর উপাচার্য পদে নিযুক্ত হয়েই বক্তৃতা দিলেন— 'বাঙ্গালী, বাঙ্গালীর বৈশিষ্টই আমার গর্ব।'

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত — আনন্দবাজার ২৫/১/৫৬

'সুখের সর্বপ্রকার উপকরণকে যিনি বিসর্জন দিয়েছেন, চলতি অর্থে তাঁকেই তো আমরা সন্ত বলি। তেমন কোন নির্বীর্য আদর্শে তাঁর আস্থা ছিল না।'

মে মাস, ১৯৫৬, বলাকা ও কথাসাহিত্য reference-অতুল গুপ্ত সাহিত্যকদের গালাগালি দিয়েছেন। তারা নবীন, তাই Pro-merger, সরকারের কাছে সাহায্য অনুগ্রহ আশা করে।

রবীন্দ্রজয়ন্তী—রবীন্দ্রসঙ্গীতের সম্পর্কে। শান্তিনিকেতন দলের উগ্র Campaign রবীন্দ্রসংগীতের সুরের শুদ্ধতার জন্য ; অনাদি দস্তিদার, শুভ গুঠাকুরতা, শান্তিদেব ঘোষ এবং অন্যান্য সব শিল্পীকে বিশ্রী গালাগালি দেয়। এটা একটা শোচনীয় সাম্প্রদায়িক ব্যাপারে পরিণত হয়েছে।

নন্দলাল বসুকে নিয়েও ঠিক এই ব্যাপার চলে। অন্য artist কে তুচ্ছ করা।

২৫/৫/৫৬ আনন্দবাজার। বুদ্ধজয়ন্তীতে ভাষণ। ডাঃ যদু সরকার (ঐতিহাসিক বলেছেন)— গরুড় স্তম্ভের বাণী হলো বুদ্ধবাণী। কী আশ্চর্য। তিনটি অমৃত পথ—সত্য, ত্যাগ, অপ্রমাদ, এই বাণী হলো বৈষ্ণব চিন্তার বাণী।

এক পতিতার জীবনের করুণ আক্ষেপ, মৃত্যুর পর তার দেহকে কেউ 'হরিবোল বলে তুলে নেবে না। কোন আপনজন কাঁদবে না। নিতান্ত একটা হাসপাতালের অচেনা লাসের মত পুড়িয়ে দেওয়া হবে। অথচ, এই তো সেই দেহ। কত লোকে কত আগ্রহে জড়িয়ে ধরছে, আনন্দ পাচ্ছে। কতভাবে সাজানো হচ্ছে এই দেহকে। তাছাড়া, ঘৃণা? বাইরের লোক ঘৃণা করে। তবু মনে হয়, মৃতদেহটাকে যেন কেউ ঘৃণা না করে। জীবন্ত দেহটাকে শত ঘৃণা করুক।

রোগ। এই রোগটা তার জীবনের সঙ্গী। কত রকমের বিচিত্র লক্ষ্মণ নিয়ে, কত যন্ত্রণা বেদনা নিয়ে রোগটা শরীরকে কষ্ট দেয়। অনিদ্রা, শ্বাসকষ্ট সবই এই রোগের উপহার। কিন্তু এই রোগটা সারছে বলে মনে হচ্ছে। কি আশ্চর্য, শরীরটা যেন বাজে জিনিষ বলে মনে হচ্ছে।*

এক একটি প্রবাদিত সৎ নীতি। বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায় ঠিক তার বিপরীত ব্যাপার করা হয় এই নীতির অজুহাতে। যথা, ছোটকে সম্মান কর। অতি নীচকে সম্মান করা হলো, ভয়ে অথবা স্বার্থে। এতে কারও লাভ হলো না, ক্ষতিই হলো।

ভাষার প্রাণবত্তার জন্য যেমন সংস্কৃত শব্দের প্রয়োজন আছে, তেমনই Slang শব্দের, প্রয়োজন আছে। উচ্চভাব প্রকাশের গদ্যে Slang সুষ্ঠু প্রকাশ দিতে পারে।

উপন্যাস এবং গল্প শুধু আনন্দের সাহিত্য নয়। এরা ইতিহাস—রূপগত ইতিহাস।

Spiritual আচরণ। এক ব্যক্তি বিগতা স্ত্রীর একটি সখের মর্যাদা রক্ষা করবার জন্য রজনীগন্ধার সেবা করে।

সংবাদে প্রকাশ, গোয়ালপাড়ার এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার মামলায় জিতেছেন। মিথ্যে পরিচয়ে নিজেকে এম-বি ডাক্তার বলে, এক যুবক তাঁর মেয়েকে বিয়ে করেছিল। এইবার মামলায় ছেলেটির জেল হলো, তিন বছর। এখন প্রশ্ন, মেয়েটি কি ভাবছে? See Newspaper 29.4.61.

অমুকবাবুর সমদর্শিতা। আমি তাঁর বিশেষ উপকারী কিন্তু সেজন্য আমার প্রতি তাঁর বিশেষ বন্ধুত্ব নেই। তাঁর যে অপকারী এবং আমার যে অপকারী, তার প্রতিও তাঁর সমান বন্ধুত্ব। এখন আমি কি করি?

কল্পকথা: শুধু আমি আছি, আর কেই নেই পৃথিবীতে। এ কেমন অবস্থা?

* সম্ভবতঃ লেখকের প্রৌঢ় বয়সে নিজের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে মন্তব্য।

জটিলতার জীবন

ভদ্রোলোক যেখানে যায়, যা চায় সবখানেই জটিল উত্তর পেয়ে থাকে। এর ভাষা দুর্বোধ্য মন্ত্রর মত, হেঁয়ালীর মত।

জমি — এই এই কারণে পাওয়া যাবে না। (অজস্র আইন ও নিয়মাবলীর উল্লেখ)

অসুখ — এই এই... অতি জটিল শরীর বিবরণ

কলেজে ভর্তি — এই এই সর্ত। এই এই দরকার।

ট্রেনে চড়া — এই এই সর্ত।

সর্ত, বিধি, নিয়ম, Procedure ইত্যাদি কণ্টকিত জীবনতন্ত্র।

শেষে জটিলতা — Constitution. অর্থাৎ constitution-এ বাধে।

যোগেনবাবু কথিত

অসাধু যুবকের চৌর্যের কাণ্ড। তাকে গ্রেপ্তার করার পর তার স্ত্রীর আচরণ (পায়ে পড়া) ইত্যাদি। চোরের frantic চেষ্টা গ্রেপ্তার এড়াবার জন্য। Police এর সহোযো সে চেষ্টা ব্যর্থ করা। যুবক তিন হাজার টাকা বাগিয়ে সরে পড়েছিল

* * *

একটি — চারা ফুলগাছের ইতিহাস

পরিবারের ঘটনার সঙ্গে যেন তার সম্পর্ক আছে। শুকোয়, বিমর্ষ হয়, কাঁদে, প্রফুল্ল হয়।

চরিত্রহীন

স্বামী চরিত্রহীন। কিন্তু সর্বক্ষণ স্ত্রীর সতীত্বর উপর সতর্ক পাহারা। বাড়িতে থাকে না। ছেলেমেয়ের ভাত দেয় না। কিন্তু পাহারা রাখে স্ত্রী যেন কারও কাছে সাহায্য না চায়। সন্দেহ, ঝগড়া, মারপিট। অবশেষে মামলা।

(জনৈক কম্পোজিটারের স্ত্রীর জীবন)

Marxist ব্যাখ্যা

আগে দেখতাম যে বলা হচ্ছে — Imagination, Romance, Religion/ Peaceful method, Co-existance ইত্যাদি individuality Marx-বিরোধী।

এখন দেখা যাচ্ছে, Marxist রা প্রমাণ করছেন যে Marxism imagination romance সবই সমর্থন করে। Family life-এর Sacredness, পিতৃভক্তি, সতীত্ব সবই পছন্দ করে?

ব্যাপার কি! অদ্ভুত স্ববিরোধিতা,

* * *

নাটকীয় সংলাপভঙ্গী

প্রণয়ী ও প্রণয়িনী। প্রণয়িনী খুবই কঠোরা, কোন আবেদনে সাড়া দেয় না। প্রণয়ী ব্যক্তিটি চটুল ফাজিল (apparently)

প্রণয়িনীর কাছে কাব্যিকতা করে এবং নানারকম ভাবে আবেদন করে সে একের

পর এক কথা বলছে। কিন্তু তাতে হাস্যরস সৃষ্টি হচ্ছে। শেষে কিন্তু চমৎকার আবেদনে তার প্রেমের গভীরতা চরম প্রকাশ পায়। নায়িকার চোখ ভিজে যায়। [প্রথমে হাস্যকর উপমা ও ভাষা, পরে সংযত ভাষা, কঠোর প্রতিশোধ, হতাশা, করুণতা, শুভেচ্ছার প্রকাশ]।

(১) আধুনিক কাল Beauty ভুলতে বসেছে। See toys, অদ্ভুত রূপের বস্তু কার্টুন জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। কিন্তু জনপ্রিয় হচ্ছে বলে মনে হয় না। আধুনিক আর্টেও দেখা যাচ্ছে beauty বোধ বিনষ্ট হয়ে গিয়েছে। আবার এরই মধ্যে গর্ব করা হচ্ছে beauty বর্জন যেন একটা আর্ট।

(২) সভ্যতা 'মনের' সৃষ্টি। Free মন। কিন্তু এই যুগ যেন মনকেই Mechanical করে সৃষ্টির সবচেয়ে বড় শক্তিকেই দুর্বল করে তুলছে।

Spirit ? Life of spirit ?

Specialisation — মনকে Mechanical ও অন্ধ করে রাখা।

(৩) To talk of God to a starving person. এটা কি খারাপ? কিংবা ভুল? এই কথাটা বড় বেশি জোর গলায় বলা হয়ে চলেছে, এটা নির্বাচনী প্রচারে ভাল শোনায়, কিন্তু?

(১) স্বামী নিরুদ্দিষ্ট। শুভাদি সন্ন্যাসিনী হয়ে গেলেন। অনেকদিন পরে স্বামীর পুনরাগমন। শুভাদি অন্তঃসত্ত্বা হলেন।

(২) স্কুলের সংস্কৃতের মাস্টার। কোন ছাত্র সংস্কৃতে ভাল নয়। শুধু একজন ভাল। এই ছেলেটি স্কুল ফাইন্যালে স্টার পেল। মাস্টার উল্লসিত। কিন্তু ছেলেটি কলেজে গিয়ে Science নিল; সংস্কৃত ছেড়ে দিল। মাষ্টার শুনতে পেয়ে কেঁদে ফেললেন। 'আমি কত আশা নিয়ে কত যত্ন নিয়ে তোমাকে পড়ালাম— বৃথা হলো!'*

(১) Train Accident ঘাটশিলার নিকটে। শেষরাত্রি। বিবরণ— অন্ধকার, আর্তনাদ, মৃতদেহের স্পর্শ, জলের জন্য আবেদন, চুরি, সেবা, সাহায্য। Relief train আসতে বিলম্ব। ওষুধ, জল, খাদ্য relife train-এ আসে নি, শুধু তথ্য-সংগ্রহের চেষ্টা।

'বহরমপুরের ঘটনা। এক মুসলমান নদীর জল থেকে হাঁড়ি এনেছে—হাঁড়ির ভিতর জীবন্ত শিশু শিশুকে সে পালন করতে চায়। গ্রামের লোকের আপত্তি। শিশুকে থানায় জমা।

জনৈক শিশুর মৃত্যুকালের আগ্রহ। সে তার পুতুলটাকে কাছে নিয়ে ঘুম পাড়াতে চায়। আর কিছু চায় না।

মাদুরার ফাঁসির আসামী; তার চক্ষু উপহার দিয়ে গেল— Eye Bank. [তার প্রেমিকা অন্ধ ছিল]

---

* লেখকের মধ্যম পুত্রের জীবনের একটি ঘটনা।

নেহেরু একটি ছোট ছেলেকে একদিন কোলে নিয়েছেন। এ কথা ছেলেটির মনে আছে। ছেলেটির বয়স এখন বারো বছর। চায়ের দোকানে চাকরের কাজ করে। মহান স্পর্শের স্মৃতি আছে, সার্থকতা কই ?

টেকনিক

১। উপন্যাসে বাস্তব নরনারীর জীবনের ঘটনার সঙ্গে কল্পিত নরনারীর জীবনের ঘটনা সমাবেশ। এর ফলে উপন্যাস আর 'রিয়াল' হবে। যথা কাহিনীতে যদি মহেশবাবু, কামিনী রায় ইত্যাদি ব্যক্তিরা থাকেন।*

২। একজন ধনী অভিজাতকের জীবনে কী পরিবর্তন, কত ঘাত-প্রতিঘাত দেখা দিল ; সূত্র আকর্ষণ করলে দেখা যাবে যে এক অতি সামান্য কাঙালি মানুষের জীবনের কোন দুঃখের ঘটনা থেকে এই পরিণামের শুরু হয়েছে।

আনন্দবাজার ২৮/২/৬২, প্রাচীন সংবাদ—মেটিয়াবুরুজের নবাব আত্মহত্যা করলেন ; কারণ তাঁর প্রিয় বাদ্যযন্ত্র আদালত ক্রোক করেছে ; কারণ অভাববশত তিনি খাজনা দিতে পারেন নি।

একটি মেয়ের বিয়ে হলো। পাড়ার প্রতিবেশী মেসোমশাইকে সে খুব শ্রদ্ধা করে ; সুলেখক, সুন্দর ও উদার মেসোমশাই। কিন্তু শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে অবিরাম নিন্দা শুনতে হয়—মেসোমশাই অতি কুৎসিত, হীন এবং অক্ষম লেখক। এটা মেয়েটির জীবনের অশান্তি। T

ডাক্তারবাবুকে ডাকা হলো, রোগীর অবস্থা ভাল নয়, ডাক্তার এসে তাঁর নিজেরই নানা রোগের কথা বললেন—দাঁত হার্ট চোখ সবই খারাপ। কিন্তু প্রতিশ্রুতি দিলেন—কোন ভয় নেই।

ঘটনা : ১। আদালতের লোক ভাড়াটেকে উচ্ছেদ করছে। বাড়ির সামনে আসবাব ও জিনিস ছড়িয়ে রয়েছে। বৃষ্টি পড়ছে। নানা রকম জিনিস। একটি কৃষ্ণগোপাল বিগ্রহ আছে। এক বুড়ো পথিক ছাতা ধরে বিগ্রহের উপর।

২। এক শিশু (অপরিচিত) বারান্দায় বসে পুতুল নিয়ে খেলা করছে। কাছে একটি চিঠি— একে পালন করুন।

৩। মেয়েদের বাস্কেটবল খেলা।

৪। স্ত্রী ঘুমের মধ্যেই মরে গিয়েছে। রাত্রিবেলা। স্বামী কিন্তু কল্পনা করতে পারে নি এই ব্যাপার। তাই সে অনেক অভিযোগ করে বলছে, শক্ত কথা বলছে। কিন্তু স্ত্রীর উত্তর নেই। কখন মরে গেছে কে জানে ?

করোনার রায় দিয়েছে— নমিতার মৃত্যু হলো আত্মহত্যা। রিভলবারের গুলি— Shock and Haemorrhage. "Projectile wound in the Skull"

* দার্শনিক মহেশচন্দ্র ঘোষ ও কবি কামিনী রায়।

T সম্ভবত লেখকের ব্যক্তিগত জীবনের একটি ঘটনা।

ঘটনা ঃ—ঋণগ্রস্ত নারী আত্মহত্যা করলো।

অর্কিড—বোটানিস্ট অধ্যাপক ঘোষ নানা পাহাড়ে, সিকিম ও দার্জিলিং এর অর্কিড সন্ধান করেন। নূতন অর্কিডের নাম দেন। যথা Aerid Biswasiana (Mr. Biswas-এর নাম)। সুতরাং প্রিয়তমা মালতীর নামেও অর্কিডের নাম হতে পারে—স্মৃতিরক্ষার প্রথা। স্ত্রীর নামে নামকরণ করা অর্কিড বাড়ির বারান্দার টবে ঝুলছে।

প্রশ্ন

জীবনে অনুপাত অথবা Proportion-এর প্রভাব। দশটাকা দামের জিনিস বিশ টাকায় কিনলে ক্ষতির ক্ষোভ বেশি হয়। কিন্তু একহাজার টাকার জিনিস একহাজার দশটাকায় কিনলে তেমন ক্ষতিবোধ হয় না। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই ক্ষতির আংশিক পরিমাণ একই, অর্থাৎ দশ টাকা, আর্ট দ্বৈত ও অদ্বৈত। আর্টের রচনার কাজে দ্বৈতভাগ শিল্পীর পক্ষে প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে চিনি হতে না ; চিনি খেতে চাই। কিন্তু আর্ট উপভোগ করবার প্রক্রিয়াটি অদ্বৈতভাবের ব্যাপার। ঘটনার আনন্দবেদনার সঙ্গে একাত্ম হওয়া।

আনন্দানুভাবের ব্যাপারে মানুষের যেন Double citizenship আছে। দুই রাজ্যের নাগরিক। কানের ভিতর দিয়া মরমে পশে যে আনন্দ—সেটা প্রকৃত আর্টের আনন্দের অর্থাৎ রসের রাজ্য। কান পর্যন্ত অর্থাৎ ইন্দ্রিয় পর্যন্ত (চোখ) যে আনন্দের ব্যাপ্তি, সেটা বস্তুত আমোদের রাজ্যের উপহার।

Craft changes, art remains. তুলনা—বেদ ও সংহিতার তত্ত্ব। Story writing-এর Craft বদলাক, কিন্তু তার art বদলাতে পারে না। যথা, অনুভবের উপর effect, আবেদন ; আরও পড়বার ইচ্ছা। খাঁটি সত্য বলে মনে হওয়া।

চলচ্চিত্র যদি আর্ট হতে চায় তবে 'জাতীয়' আর্ট হতে হবে। ভারতীয় বৈশিষ্ট্য থাকবে। নইলে এর বিশেষ কোন মূল্য হবে না।

প্রশ্ন

(১) অহিংসার বুজরুকি আছে। হিংসারও বুজরুকি আছে।

(২) প্রাচীন কুসংস্কারও আছে, নূতন কুসংস্কারও আছে।

(৩) যুক্তিহীন আস্তিক্যবাদ আছে, যুক্তিহীন নাস্তিক্যবাদও আছে।

(৪) মনীষীরা যেমন অতীতের বন্ধন ছিন্ন করতে চান, তেমনই বর্তমানেরও। দৃষ্টান্ত মার্ক্স—তিনি আধুনিক শিল্পোৎপাদনকে আধুনিক বলেই প্রগতিশীল মনে করেন নি। তার বর্জন ও পরিবর্তন চেয়েছিলেন। প্রচলিতের বন্ধনও ছিন্ন করা প্রয়োজন।

তথ্য

গুণে অগুণ বলে স্বীকৃতি। বাঙালী ম্যাট্রিকুলেট যুবক আসানসোলের কয়লাখনিতে মালকাটা হয়ে প্রবেশ করে। নিজেকে নিরক্ষর বলে পরিচয় দেয় মালিকের কাছে।

[See Statesman 18. 10- 62]

স্ত্রী পরাসক্ত। দিল্লীর এক হোটেলে পরপুরুষ এবং স্ত্রী আত্মহত্যা করলেন। পোস্ট মর্টেমের পর স্বামী এই স্ত্রীর লাশ গ্রহণ করলেন না। মেয়েটির পিতাও গ্রহণ করলেন না। স্বামী কিন্তু স্ত্রীর অনুরাগী ছিল।

জনৈক যুবক স্ত্রী-হত্যার অপরাধে অপরাধী। জেল থেকে মুক্ত। এই যুবকের প্রতি এক মেয়ে আকৃষ্ট হলো। সে জানতো না পূর্বের ঘটনা। পরে জানতে পারে যে যুবক স্ত্রী ঘাতক। এখন এই নারীর মনোভাব কি হবে?

বুড়ো কার্পেণ্টার কাজ করতে এসে কিছুই করে না। কাজে ফাঁকি দেয়, কাজ জানেও না। শুধু দেশের গল্প করে। আপনাদের দেশ কোথায় ছিল? বিক্রমপুর?...তাহলে তো আমারই মামাবাড়ি। অনন্ত মজুমদারের মেয়ের কি বিয়ে হয়েছে? এমন লোকের সঙ্গে কাজ ও পয়সার সামঞ্জস্য হয় কি করে?

সেই যে খ্রীষ্টান পাদরী একটি সিঁদুর মাখানো পাথরকে লাথি মেরে সরিয়ে দিয়েছিল, সেটা এখনও স্রোতের ধারে পড়ে আছে। হিন্দুত্বকে চূর্ণ করবার মিশনারী অভিসন্ধি।

১৯৫০ সালে ভূমিকম্প হয়েছিল। সে সময়ে চীনাদের দেখা যেত। চীনাদের সমাধি রয়েছে। ভূমিকম্পে সমাধি ফাটছে।

এ কেমন inner line? শুধু এদিক থেকে ভারতীয়েরা যেতে বাধা পায়। ওদিক থেকে চীনারা অবাধে প্রবেশ করে। ভারত সরকার এ বিষয়ে অসতর্ক, অজ্ঞ, অলস।*

যক্ষ্মারোগিনী হাসপাতালে থেকে শুনতে পাচ্ছে, স্বামী আর এক নারীর প্রতি আসক্ত হয়েছে। শেষে তার কামনা দাঁড়ালো-রোগী হয়ে এখনই আসুক তার স্বামী। স্বামীর রোগের খবরও পেল।

ছোট মেয়েকে বাপ চুমো খায়। মেয়ে হাত তুলে ইসারায় বাপকে বলে, মাকে চুমো খাও।

জনৈকা পতিতার বাবু, এক পৌঢ়। একদিন এমন এক যুবক পতিতার ঘরে এল, যে হলো পৌঢ়ের পুত্র। পতিতা তাকে প্রত্যাখ্যান করলো। অর্থাৎ যুবকের প্রতি মাতৃত্ব ভাব মনে দেখা দিল।

প্রাইভেট ডাক্তারের ক্লিনিক অথবা নার্সিং হোম। টাকা শোষণের গেঁড়াকল। যথা বিবেক সেনগুপ্তের নার্সিং হোম। প্রসূতির দুরবস্থা। খাবার চাই। কথায় কথায়, পদে পদে টাকার দাবি। ডাক্তার-শুধু পরীক্ষার ফাঁদে ফেলে টাকা আদায় ও অন্য ডাক্তারের (Specialist) জন্য টাকা পাইয়ে দেওয়া। Cardiograph,

* ১৯৬২ সালে চীন-ভারত সীমান্তে সংঘর্ষের সময় লেখক প্রতিবেদক রূপে নেফা বা অরুণাচল প্রদেশে গিয়েছিলেন। তখনকার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে এই মন্তব্য।

X'ray, Blood test, Stool test ইত্যাদি।

জমি। মন্মথবাবু বললেন, আমি সরকারের এক টাকা (জমিদারী Compensation) নেব না। সে জন্য আট দিন আদালতে ঘোরা ফেরা এবং ১২ টাকা খরচ হলো।

'এই জমিতে বাড়ির ছাদ দেওয়া নিষিদ্ধ' দেখা গেল পরে তিনতলা দালান উঠছে।'

ছেলে পাত্রী দেখতে এসেছে। ছেলে দেখতে ভাল নয়। পাত্রী সুন্দরী। ছেলের সঙ্গে দুটি ভাই-বোন এসেছে। তাহারা ভবিষ্যতের সুন্দরী বৌদিকে দেখে খুশি, কৃতার্থ উল্লাসিত। কিন্তু ছেলেকে কেউ পছন্দ করলো না। ছোট ভাই-বোন শুনলো, দাদাকে এই মেয়ে বিয়ে করতে রাজী নয়। এদের করুণ অবস্থা। সুন্দরী মেয়ে দেখছে, ওদের মুখ করুণ হয়ে গিয়েছে।*

Psycho- সাইকো গল্প

১। আধুনিক কবিতার সংকলন গ্রন্থের সূচীপত্রের পংক্তি একত্রিত=একটি কবিতা। এবং রবীন্দ্রনাথ কৃত নমশূদ্রানী কবির কবিতা। (এলিয়টের কবিতা বলে উল্লেখ করে প্রবন্ধ আলোচনা)। সম্পাদক খুব প্রশংসা করে মন্তব্য করলেন। শেষে লেখক এসে স্বকৃতি দিলেন, মাপ চাইলেন। অপ্রস্তুত সম্পাদক এক গেলাস জল খেতে গিয়ে কালী ডোবানো জলের গেলাস মুখের কাছে তুলে ধরলেন। বাধা দিন লেখক-আহা করেন কি, করেন কি?

২। তিনটি কাজ করতে অথবা তিনটি কথা বলতে আমাকে দেখেছিল ও শুনেছিল নীরেন। কিন্তু…

৩। সেদিন তখন আকি তালগাছের দিকে তাকিয়েছিলাম। হাতে একটা বই ছিল। এই সব আমার অভ্যাস নয়। রটে গেল, এ গুলিই আমার একমাত্র অভ্যাস।

৪। ত্রিশ বছর আগে সেই মেয়ে আসতো লেখা নেবার জন্য। আজও একটি মেয়ে এসেছে, সাহিত্য উৎসাহিনী। দেখতে সেই মেয়েটিরই মত। পরিচয় নিয়ে জানা গেল সেই মেয়েরই মেয়ে। মেয়ে কিন্তু জানে না যে তার মা একদিন সাহিত্য উৎসাহিনী ছিলেন। তাই আজ লেখকের কথায় জানতে পেরে আশ্চর্য হয়। মা তুমিও সাহিত্য ভালবাসতে? হ্যাঁ। কেন মা? -ভুলে গেছি। [অর্থাৎ লেখককে ভালবেসেছিল সেই মেয়ে]

একটি সূত্র:

প্রত্যেক moral—প্রবাদকে গল্পে পরিণত করা যায়। যথা:

(১) অতি বাড় বেড় না ঝড়ে পড়ে যাবে।

* উপন্যাস: সায়ন্তনী

(২) যাকে কখনো দেখিনী সে বড় সুন্দরী, ইত্যাদি।

নূতন প্রকারের গল্প

(ক) ভারতীয় বাহিনীর ক্রিয়াকলাপ নিয়ে বর্ণিত পট ভূমিকা—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ-History of Indian Army, Reference; ইতালী, আফ্রিকা, বর্মা, নব্যপ্রাচ্য, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া ইত্যাদি স্থানের জীবনের সঙ্গে মিশিয়ে ভারতীয় চরিত্রের চিত্রণ ও সাংস্কৃতিক, মানসিক, প্রেমগত ও রাজনীতিক তত্ত্বের উদ্ঘাটন।

(খ) আদিবাসীর কথা। ভারতের বিভিন্ন ও বিচিত্র আদিবাসী মেয়ে-পুরুষ-গ্রাম জীবনের সঙ্গে ভারতীয়ের পরিচয়ের emotional সংঘাত। প্রতিক্রিয়া। তাৎপর্য, এক হলে অসুবিধে নেই। এক হতে পারে। বৈচিত্র্যই কি আসল। এই মিশ্রনই তো বৈচিত্র্য।

নিম্ন-চরিত্র, নিম্ন -প্রতিভা, নিম্ন-গুণের কাছে উচ্চের পরাজয়। একটি সুন্দর মেয়ে, সকলেই জানে, সবচেয়ে ভাল ছেলেটির সঙ্গে (যার ইচ্ছা, সুন্দর মেয়েকে বিয়ে করে) বিয়ে হবে। কিন্তু প্রচারকার্য এমনই অঘটন পটীয়সী যে একজন কুরূপা মেয়ে সুন্দরী বলে স্বীকৃত হয়ে গেল। এই ভাবে, ওই শহরে একজন দার্শনিক পণ্ডিত, সুগায়ক ও অন্যান্য সুকৃতীরা নিম্ন-প্রকৃতির কাছে পরাভূত হয়ে চলে গিয়েছি।

গল্প—সুন্দরী মেয়ের মাতা-পিতা অন্য সুকৃতীদের পরাভব দেখেও শিক্ষালাভ করে না। শেষে ঠকে বিস্মিত হয় ও চলে যায়।

নূতন প্রকারের গল্প:

(ক) একটি ঐতিহাসিক স্থান খননের পটভূমিকা। Ref: গোরখপুর, নন্দনগড় ও কুশীনগরের খননের ইতিহাস।....একজন বাঙালী কেরানী, আর্কিওলজিতে সুপারিন্টেনডেন্টের সহকারী।

তারই জীবনের সঙ্গে অতীত ও বর্তমানের প্রভাবের ঘাত প্রতিঘাত। বর্তমান গ্রামের এক নারীর প্রতি কামনার টান, আর বাংলাদেশের গ্রামের বিবাহিত স্ত্রীর প্রতি টান। এই স্ত্রী অবাস্তব একটি কাহিনী, নিতান্ত মূর্তি হয়ে যেতে চলেছে। তিনকালের সমষ্টি ও আবেগ—অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ। ভদ্রলোক শুনেছে, ছেলে হবে।

দিনপঞ্জীর পদ্ধতিতে এই সব গল্প লিখিত হবে।

(খ) জীবনচরিত্র ধরনের লেখা গল্প। নিতান্ত সামান্য দশার অতি নিম্ন অবস্থার বিভিন্ন শ্রেণীর নরনারীর জীবন-চিত্রণ। দেখা যাবে এদের জীবনের কত রহস্য কত মহত্ত্ব। কত আবেগ ও কত প্রেম, নিষ্ঠুরতা-বিচিত্ররূপে প্রকাশিত। দৃষ্টান্ত-যথা, পতিহন্তা এক নারী যাবজ্জীবন জেল ভোগ করে বাইরে এসেছে। ধর্ষিতা নারী, সাপুড়ে। নেকড়া কুড়নী। ভালুকওয়ালা। তরকারী বেচা-তেঁতুল ও নিমদাঁতন যার একমাত্র পন্য।

সাইকো-গল্প: ১। একটি পুরস্কার বিতরণী ট্রাস্ট। সদস্যেরা অত্যন্ত অন্যায়

পন্থায় একজনকে পুরস্কৃত করবার ব্যবস্থা করছেন।…দেখা গেল এঁরাই একদিন এক জায়গায় সরকারী অবিচারের কঠোর নিন্দা করছেন।

২। অশিক্ষিত বাঙালী পরিষ্কার বাংলায় কথা বলছে (স্থান সাহেবগঞ্জ স্টেশন) 'টানা গাড়ি' 'গাড়িকে দেখা হলো' ইত্যাদি। সেই waiting রুমে শিক্ষিত বাঙালী অধ্যাপক কথা বলছেন—'Through train', 'by chance' ইত্যাদি, তুলনা।

Magical Theme : Return of the dead-বাস্তব জগতের ঘটনা, শ্মশান থেকে ফিরিয়ে নিয়ে আসা ব্যক্তি। এই ব্যক্তি দেখছে, চিতার কাঠ সাজানো হয়েছে। স্ত্রী কাঁদছে। এর মনে feeling. Dostoevsky-র প্রাণদণ্ড স্থগিতের অভিজ্ঞতা।

১৩। Idea-র প্রতি আসক্তি। এই আইডিয়া যেন এক মোহময়ী রূপসী তরুণী। তার সঙ্গে নীরবে কথা, অভিমান, হর্ষ, অশ্রু আর কত কী কাণ্ড। একজন intellectual ব্যক্তির এই মানসিক অবস্থার কাহিনী। নিভৃতে ঝর্ণার কাছে গিয়ে তার সঙ্গে কথা বলে। রাত্রে ঘুম থেকে উঠে আকাশের তারার দিকে তাকিয়ে কথা বলে।

১৪। এক নারীর প্রতি সম্পূর্ণ মিথ্যা প্রশস্তি। এই প্রশস্তির এমনই প্রভাব যে নারী মুগ্ধ হয়। এই প্রশস্তিকে ছাড়তে চায় না। জনৈক স্তাবক পুরুষ শুধু এই করে নারীর মান বাড়িয়েছে। অতএব এই পুরুষকে স্বীকার করে নিতে ইচ্ছা।

১৫। ভদ্রলোক সব সময় হাসছেন। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের জীবন তাঁর। উৎসবের আসর—সবাই হাসিমুখে বসে আছেন। এক একজন তাঁদের খুশি (সুখী?) জীবনের ঘটনার কথা বলছেন। এই ভদ্রলোকও বললেন কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত কাহিনী। নিদারুণ দুঃখের ও আঘাতের কাহিনী। সব সময় হাসছেন।

১৬। ভাড়াটিয়া উচ্ছেদ। পুলিশ নিয়ে এল বস্তি থেকে ভাড়া করে, দুই ষণ্ডা নারীকে, চুলের ঝুঁটি ধরে ভাড়াটিয়া মহিলাকে ঘরের বার করে দেবে।

১৭। একজন কৃতীলোক; এখন একটু প্রতিশোধের আনন্দ পেতে চায়। যে যে ব্যক্তি বলেছিল, তোমার কিছু হবে না, তাদের খুঁজছে কৃতী ব্যক্তি। আত্মীয় বন্ধু প্রতিবেশী ইত্যাদি। কিন্তু কেউই নেই, সব মরেছে। প্রতিশোধ নিতে না পারবার আক্ষেপ?

১৮। দুই বন্ধুর বার্তালাপ। একজনের স্ত্রী দিনের বেলা ভয়ানকা, রূপে ও আচরণে। রাত্রিতে সুন্দরী। অন্যজনের স্ত্রী দিনে সুন্দরী, রাত্রিতে ভয়ানকা। এ কী সেই মায়ারাক্ষসী, যারা ছদ্মবেশে রূপসী হয়ে থাকতো। সেই কথা আলোচনা করেন দুই বন্ধু।

Hindusthan Standard dated 22.12.65

১। পলাতক শিখ-স্ত্রী ও তিনটি ছেলেমেয়েকে খুন করেছে। ১৬ বৎসর পরে ধরা পড়েছে। এখন সে বিবাহিত, স্ত্রী আছে, তিনটি ছেলেমেয়ে আছে।

২। একজন লোক আড়ালথেকে দেখছে এক স্বামী তাঁর স্ত্রীকে গলা টিপে

হত্যা করার পর দড়িতে ঝুলিয়ে দেবার চেষ্টা করছে· যেন আত্মহত্যার ঘটনা। স্বামীটার সমগ্র আচরণের অদ্ভুত মনস্তত্ত্ব।

১। প্রৌঢ়া আত্মীয়া (মামী কিংবা খুড়ি) এক দিকে, আর নববিবাহিতা তরুণী স্ত্রী একদিকে-যুবকের উপর দুইজনের দুই বিভিন্ন ধরনের আকর্ষণের প্রতিযোগিতা ও সংঘাত। প্রৌঢ়ারই জয় হয়ে চলেছে। [একমাত্র কামুকতায় দক্ষতায় প্রৌঢ়ার জয়। শেষে এই সত্য বোঝা গেল-এইবার তরুণী কী করবে?]

১। Hippy— চরসখেকো যুবক। পরিণাম।

২। জনৈক সোনা Smuggler নারী-সোনা (অথবা আফিম) লুকিয়ে রেখেছে তার Brassiere এর মধ্যে, উচ্চ কুচযুগ আসলে সোনার কুচ।

২। জনৈক অর্ধ-সক্ষম ব্যক্তির স্ত্রী অপর এক সক্ষমের সঙ্গে উপগত হয়ে থাকে। বন্ধুরা অথবা বাবুরা প্রগলভ আমোদ উপভোগের জন্য একদিন কৌশল করে ব্যক্তিকে তার স্ত্রীর কাণ্ড দেখিয়ে দিল। কিন্তু ফল বিপরীত। দেখা গেল, নিবিড় তৃপ্তি ও উচ্ছল রক্তাভ চোখ মুখ নিয়ে সেই ব্যক্তি ফিরে এল। হাসছে লোকটা। আর, আবার আগের দিনের মত সেই গুপ্ত ঘরের গুপ্তলীলা দেখবার জন্য উঁকি দিল।

৩। দয়াময়ী মূর্তি চুরি। ধানক্ষেতে পাওয়া গেল। সঙ্গে অন্য মূর্তি নেই। পুলিশ অফিসার সান্ত্বনা দেয় ক্রন্দনরতা মহিলাকে নিয়ে যান, পূজা করুন, ভাল হবে। আমি চণ্ডীপাঠ করি।

১। পোকাতে বই কাটছে। কখনও চার্বাক দর্শন। কখনও আইনস্টাইন। কখনও জয়দেবের গীতগোবিন্দ। একবার বানরে কতগুলি বই, মার্কস সাহিত্য নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল। কেন? এর মধ্যে যেন একটা উদ্দেশ্য দেখা যাচ্ছে।

কী ভয়ানক এই সন্ন্যাসী গুরু। মানুষের সংসার থেকে ভেঙে-ছিঁড়ে শিষ্য-শিষ্যা আনছেন। বাৎসল্য স্নেহ পতিভক্তি মমতা— সব ছেড়ে দিয়ে এক একজন আসছে· ভগবান পাবে বলে।

নারী ভগবানের দেখা পাবে বলে গুরুর আশ্রমে চলে গেল। শিশু পুত্রকে ছেড়ে দিয়ে স্বামীকে ছেড়ে দিয়ে, সেখানে এক স্থূল চাকরের সঙ্গে থাকে।

মন্দিরাদি কোন মেয়েকে একবার মাত্র চোখে দেখে নিয়েই বুঝতে পারে— অন্তঃসত্ত্বা। তাই শুধু বলে কাঁথা সেলাই করতে হবে। কি গো, কাঁথাই সেলাই করবো?···হ্যাঁ। এই রকম। নিজে চিরকুমারী, প্রৌঢ়া। এইভাবে জীবনে এযাবৎ ৫00 কাঁথা সেলাই করেছেন। কিন্তু নিজের ভাগ্য? এক পরিবার থেকে আর এক পরিবারে স্থানান্তরিত। কেউ এর ভার নেয় না। [এমন কি একদিন এক বিধবা মেয়েকে চুপি চুপি বললেন—কাঁথাই সেলাই করি] হাসপাতালে গোপনে কাঁথা নিয়ে যান মন্দিরাদি।

নিঃসহায় অসহায়, মৃত্যুশয্যায়, মন্দিরাদি। খবর পেলেন, অর্থাৎ এক মহিলা

আসতেই বুঝতে পারলেন— ছেলে হবে। সুতরাং কাঁথা সেলাই করতে হবে। কিন্তু সঙ্গতি কই ?

প্রাণপণে কাঁথার কাপড় যোগাড় ও সেলাই। সেরে উঠলেন কাজ। কিন্তু নিজে হাসপাতালে ভর্তি হলেন। মৃত্যু হলো।

দেখা গেল— কম্বলে ঢাকা মন্দিরাদি। [গল্প ঃ কাঁথা ও কম্বল]

* * *

Ref-Sen (সাইকো) জীবনী

ঘটনা ঃ ঘরে আসন্ন প্রসবা স্ত্রীর ব্যথা উঠেছে। ঠিক সময়ে বাড়িওয়ালার ডিক্রি নিয়ে লোকজন এসেছে উচ্ছেদ করতে।

স্ত্রী স্বামী ও শিশুপুত্রকে ছেড়ে দিয়ে সন্ন্যাস নিলেন। স্বামী স্ত্রীকে ভালবেসে বিয়ে করেছিল। স্ত্রী লিখেছে— তুমি আবার বিয়ে কর। স্বামী হাসে।

একটি চিঠিতে নিজের ছেলের পরিচয় লিখছেন ভদ্রলোক। ছেলের বিয়ে, ভাবী কুটুমকে লিখছেন। কত কথাই মনে আসছে। তার মধ্যে সামন্য কিছু কিছু লিখতে হচ্ছে। কিন্তু প্রত্যেক ঘটনার পর একজন দরিদ্র ব্যক্তির উল্লেখ থাকছে। এই লোকটি দুঃখী হতে হতে কোথায় নেমে গেল; একেবারে ভিখারী পর্যায়ে। আসল গল্প এই দাঁড়ালো অথচ ইচ্ছেটা ছিল ছেলের উন্নতির গল্প লেখা।

শুদ্ধচারিণী, ত্যাগিনী, সুন্দরী, যুবতী মহিলা। অনাথ-আশ্রমের প্রতিষ্ঠাত্রী ও অধ্যক্ষা। ভক্ত যুবকেরা আসে। একজনের ভূমিষ্ঠ প্রণাম, অন্যজনের শুধু নমস্কার। এই দুই পুরুষ ব্যক্তিত্বের ভিন্ন প্রভাব নারীর মনের উপর। প্রণয়ের দ্বন্দ্ব।

এমেচার দলের (একটি অফিসের) থিয়েটার। থিয়েটার ভবনে চমৎকার ফুল ও দীপসজ্জা। লোকের ভিড়। আনন্দ। স্বামী শুনেছে তার স্ত্রী (অফিসের কেরানী) এই নাটকে অভিনয় করবে। বিস্মিত হয়ে স্বামী এসেছে স্ত্রীর খোঁজ করতে।

তরুণ স্কুল মাস্টার। দেখতে সুন্দর। অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে গিয়ে কুৎসিৎ চেহারা হলো। স্কুল কর্তৃপক্ষ চাকরি খতম করে দিল। কারণ, ছাত্ররা দেখে ভয় পায় ?

স্ত্রী মারা গেছে। শোকার্ত স্বামী ভাবছেন শূন্য প্রাণের নানা বেদনার কথা। এরই মধ্যে একজন নারীর কথা মনে পড়ছে। পরনারী, বিধবা। সে এখন কোথায় ? এই ট্রেনেই মধুপুরে এসে নামছে কি সেই নারী ? অর্থাৎ এই নারীকে বিয়ে করবার বাসনা জেগেছে ভদ্রলোকের মনে।

স্বামী লিখেছিল সন্ন্যাসিনী স্ত্রীকে— তোমার ওখানে যেয়ে কটা দিন থাকতে চাই। কিন্তু গুরু নিষেধ করলেন।— এক বছর অপেক্ষা করতে বল। স্ত্রী তাই লিখে জানালো। এক বছর পরে স্বামী মারা গেল। গুরু সগর্বে হাসলেন— বুঝতে পারছো, কেন বলেছিলাম ?

গোলাপ ফুল ঃ নার্সারী এক ভদ্রলোক। গোলাপ সম্পর্কে স্পেশালিস্ট। কত উৎসবে গোলাপ ফুল যোগায় এই ভদ্রলোক। মেয়ের বিয়ের সময় কী সুন্দর

ফুলসাজ। কিন্তু যৌতুকের জিনিস কম হলো। কুটুম্ব রুষ্ট। গোলাপ' ফুলসাজের চমৎকারিতায় কুটুম্ব মুগ্ধ নয়। দাবী হলো, টাকা, বাসন, ক'ভরি সোনা ইত্যাদি। ভদ্রলোকের মৃত্যু হলো। সেদিন শবসজ্জায় কী সুন্দর ফুলসাজ। গোলাপের সমারোহ। ব্যবসায়ে লাভবান হয়নি ভদ্রলোক।

'একবারে ব্যারসিক'— মন্তব্য করতেন মহিলা। স্বামী শিক্ষিত ; তাঁর কোন সুরুচি ও আনন্দের স্বাদ মহিলা নিতে পারতেন না। বরং বাধা দিতেন। ভদ্রলোক কোন কাহিনীই সমাপ্ত করতে পারতেন না। সে জন্য মহিলার বিন্দুমাত্র দুঃখ ছিল না। এই Half-finished আবেগের কী ভয়ানক আঘাত বাড়ির সকলের ও আগন্তুকদের মনে বাজতো। কিন্তু মহিলা তার বাক্সে জীবনের যত জিনিস ও ইচ্ছার জন্যই ব্যস্ত ও উল্লসিত।

তিন ভদ্রলোক তিন রকম সমস্যায় পড়েছেন। সমস্যাগুলি কিন্তু আসলে একই।

(ক) রাজনীতিক মত মেলেনা, কিন্তু লোকগুলি ভাল। যাদের সঙ্গে মেলে, তারা ভাল নয়।

(খ) ধর্ম-মতে মেলেনা, কিন্তু লোকগুলি ভাল। যাদের সঙ্গে মেলে, তারা ভাল' নয়।

Sex-চরিত্রে মেলেনা, কিন্তু লোকগুলি ভাল। যাদের সঙ্গে মেলে, তারা ভাল নয়।

Ref : Animal life

শ্রীনাথ দত্তের জীবনী :—হস্তিনীর ক্ষিপ্ততা, কর্তব্য ত্রুটি। জঙ্গলের হাতি ডাকে উতলা। যাত্রীদের গা-ঝাড়া দিয়ে ফেলে দেবার চেষ্টা। অবশেষে মানুষকে হত্যা। এই কালী মোতিরও শাস্তি হলো। আমরা দেখলাম। গুলি করে হত্যা করা হলো। লন্ডন— চেলসা— একটি রেস্টোরান্ট Nude মডেলের ছবি আঁকবার ব্যবস্থা আছে। লম্পট বাঙালী যুবক আর্টিস্ট সেজে কাগজ তুলি নিয়ে, অবশ্য যথোচিত ফী দিয়ে ছবি আঁকছে। কিন্তু রেস্টোরান্টের ম্যানেজার আঁকার রকম দেখে ব্যাপার বুঝেছে। আক্ষেপ করে— ছিঃ। ওদিকে মডেল জানতে পেরে রুষ্ট, অপমানিত বোধ। তখনই গায়ে ওড়না চাপিয়ে পোশাক পরতে চলে যায়। গরীব মেয়ে— পয়সার জন্য উলঙ্গ হয়। আজ এ কেমন আত্মসম্মান বোধ ?

Ref : Animal life : বাঁদরের জীবনের ডিসিপ্লিন। বাচ্চা বাঁদরকে চড় মেরে discipline শিক্ষা দিল বুড়া বাঁদর। অর্থাৎ বুড়ার দেখাদেখি পুকুরের কাদায় নেমে জল খেতে এসেছিল বাচ্চা বাঁদর।

Ref : ঘটনা : উকীল নবীনবাবু সুযোগ পেলেন, এই মামলাতে অনাদি-বাবুর স্ত্রী মণিমালাকে জেরা করবেন। শেষে কী রহস্যের কারণে, সার্কিট হাউসে জেরা করা হলো। নিভৃতে। কী কথা বললেন নবীনবাবু মণিমালাকে ? বিগত জীবনের কোন ভালবাসার ঘটনা ?

Res : সরোজনলিনী : ব্রাহ্ম ভদ্রলোক মেয়ের বিয়ের সময় ও ছেলের বিয়ের সময় জাতের সমস্যায় বিব্রত। তিনি ছিলেন জাতে বারুই অথবা কুমোর। ব্রাহ্মণ—ব্রাহ্ম পাত্র, কায়স্থ পাত্র সবাই বিক্ষুব্ধ। এমন কি, শেষ পর্যন্ত উচ্চ বংশীয় কুটুমেরাও নিমন্ত্রণ করে না। Ref : শ্রীনাথ দত্ত।

ব্রাহ্ম ধর্মে দীক্ষিত পুত্রের পিতা-মাতার স্নেহের অবমাননা। তঁদের ব্যাথা ও ক্রন্দন। ব্রাহ্ম পুত্রের জীবনের শেষে প্রশ্ন ও অনুশোচনা। ব্রহ্ম আনন্দ রূপ মহতং বলে গম্ভীর স্বরে প্রার্থনার সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে ; নৌকাঘাটায় বাবা দাঁড়িয়ে আছেন, চোখ মুছছেন।

Ref : Facts : কাকা তাঁর আদুরে ভাইঝির নামে ইংরাজীতে কবিতা লিখেছেন (See সরোজনলিনী) মেয়ে বেহালাতে পারদর্শিনী।

বাঘ শিকারে স্বামীর সঙ্গে গিয়েছেন স্ত্রী। জঙ্গলে ঘুরছেন, মাচানে বসেছেন। আহত বাঘের সন্ধান করেছেন। হাতীতে চড়েছেন।

স্ত্রী মারা গেছেন। অনেকগুলি অসমাপ্ত বোনার কাজ। মোজা, মাফলার, চাদর রেখে গিয়েছেন।

Ed Director Dunn সাহেব—তাঁকে বাঙালী সিভিলিয়ান দত্ত নেমতন্ন করে খাওয়ালেন। শ্রীযুক্তা দত্তের যত্নে তিনি বিস্মিত ও প্রীত। মুখর হয়ে ভারতীয় নারীর উদারতার কথা বললেন। দেশে গিয়েও বললেন। অনেক দিন পরে (ডান তখন মৃত) এক যুবক (ইনি ডানের পুত্র) বিলেত থেকে এসে দত্তের সঙ্গে দেখা করলেন। কিন্তু অপ্যায়ন শুষ্ক ও অল্প ও অনুদার।

বিগত তথা মৃত ব্যক্তির (মহিলার) 'অসাধারণ' গুণ ও গৌরব ও মহিমার কথা বললেন স্বামী। সবই কিন্তু নিতান্ত সাধারণ ঘটনার ব্যাপার ; যেটা প্রত্যেক সাধারণ নারীর জীবনে পাওয়া যায়।

মহিলা দশবছর টেনিস খেললেন। তবু শাঁখা ভাঙলো না।

এক অপরিচিত বৃদ্ধ ভদ্রলোক এলেন চাইবাসা জেলব কোয়ার্টারে। কী ব্যাপার? প্রশ্ন করে জানা গেল, তিনি সেই ঘরটি দেখতে এসেছেন, যেখানে তাঁর বিয়ের বাসঘর হয়েছিল। স্ত্রী নেই। আজ স্মৃতির আড়ালে অতীতে একটি সুখ-মোহের স্পর্শ সন্ধানে এসেছেন।

কালেক্টরের স্ত্রী যুদ্ধেরচাঁদা তুলবার জন্য মেয়েদের নিয়ে নাটক অভিনয় করালেন। নিজেই শৈব্যা সাজলেন।

ম্যাজিস্ট্রেটের স্ত্রীর বিদায় সম্বর্ধনা। মানপত্র, মহিমার্ণবা—See সরোজনলিনী।

গ্রামের ছোট ছেলে কলকাতার বড়লোকের বাড়িতে ঐশ্বর্য দেখে স্তম্ভিত।

বোকাদা— বর্তমানে যিনি Chief Justice সমরেশ রায়, তাঁরই নাম। আসামীর মুখে বোকাদা ডাক শুনে চমকে উঠলেন চীফ জাস্টিস।

সাহেবীভাবে দীক্ষিত অর্থাৎ Anglicised বাঙালী ঘৃণা প্রকাশ করেন— ছিঃ,

কী অবস্থাই না এককালে ছিল। 'গুরু প্রসাদী' প্রথা ছিল। অথচ একদিন ঘটনায় দেখা গেল, ইনিই নিজের স্ত্রীকে সাহেবের বাংলোতে রাতের নাচে ও dinner এ পাঠিয়ে অর্থাৎ সাহেব দ্বারা উপভুক্ত হবার জন্য পাঠিয়ে খুশি হচ্ছেন, হয়েছেন।

জানা গেল ওই তরুণী যৌনরোগে ভুগছে। অথচ কী চমৎকার সুস্থ চেহারা। রোগ রোগই, এর মধ্যে পাতকীতা কোথায়? কিন্তু এই তরুণীকে ওই তরুণ বিয়ে করলোনা। তরুণী কিন্তু এই তরুণের প্রতি খাঁটি ভালবাসায় অভিভূত। প্রশ্ন করে মনে মনে— যৌন সঙ্গ ছাড়া কি ভালবাসার জীবন অর্থাৎ বিয়ে সম্ভব হতে পারে না?

দৃশ্য: ১। মৃত্যুশয্যাশায়িনীর অন্তিম মুহূর্তে। টেলিফোনের রিসিভার মুখের কাছে এগিয়ে দেওয়া হলো। শেষ কথা বললেন কার সঙ্গে?

২। পিতা বাড়ি নির্মাণ শেষ করতে পারে নি। একতলা কোন মতে শেষ হয়েছে। দোতলা ছন্নছাড়া অসমাপ্ত অবস্থায়। এই বাড়িতে থাকে ছেলে ও তার পরিবার। [ভৌতিক কাণ্ড, দোতলার জানালার গরাদ নড়ে; চৌকাঠে কে যেন হোঁচট খায়]

১। উনি ইংরেজী বাংলা হিন্দী ভাষা ব্যবহার করেন।

ইতরতা প্রকাশের সময়=ইংরাজী

ভালবাসা প্রকাশের সময়= বাংলা

কর্তব্য প্রকাশের সময়= হিন্দী।

২। Coffee-house intellectual—তিনটি যুবক। এরা বলে— সত্যই Young Bengal কত progressive— সাহস করে বলতো—এই গরু খাবি। হায়, সে tradition নষ্ট হয়ে গেল।

৩। একজন purist ব্রাহ্ম; সব সময় প্রতিবেশী ভদ্রলোকের মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে ঠাট্টা শ্লেষ বিদ্রূপ। মাঝে মাঝে আক্ষেপ দুঃখ করে, এই কুসংস্কার থেকে করে মুক্ত হবে ভদ্রলোক?

ঘটনা ও দৃশ্য: পিতা তাঁর কন্যাকে পাগলা গারদে ভর্তি করে দিয়ে চলে যাচ্ছেন। অকস্মাৎ দেখলেন, মেয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে। আর সুন্দর শান্ত ভাষায় বাপকে বলছে, পথে কষ্ট করো না, রাত্রিতে ঘুমোবে, বাড়িতে আগের মত ভোরে এক কাপ চা খেও। পিতার মনের অবস্থা?

Ref: ইতিবৃত্ত, ঘটনা, চরিত্র ইত্যাদি

১। রামানন্দবাবুর "দাসাশ্রম"। পতিতার কন্যা উদ্ধার ও শিক্ষিত করিবার চেষ্টা। যুবক শিক্ষক।

২। ছেলেবেলার বন্ধুর সঙ্গে দেখা, তিনি এখন সন্ন্যাসী।

৩। অথর্ব ও জড়তাপ্রাপ্ত গৃহকর্তাকে কোলে করে বাইরে বসিয়ে দেওয়া হলো। এককালের মহাকর্মী এখন জড় মাত্র শুধু তাকিয়ে থাকেন।

৪। "প্রাণ ব্রহ্মপদে হস্ত কাজে তাঁর
এইভাবে দিন কাটুক আমার।"

শিবনাথ শাস্ত্রীর motto.

৭। রামানন্দের 'দাসী' পত্রিকায় একটি প্রবন্ধের নাম 'দেবী দানবী ও মানবী— লেখক দেবেন্দ্রনাথ বসু, এম-এ।

৮। দাসীর গ্রাহক— রবীন্দ্রাথ (?) ঠাকুর। ইনিই রবি ঠাকুর?

১০। রামানন্দ স্মৃতি— চুনারে রুই মাছ ৬ পয়সা সের; দুটো মাছ ৩ পয়সা। দুধ টাকায় ৩২ সের!

১১। জিজ্ঞাসা— ব্রাহ্মবালক— সঠিক উত্তর-ধর্ম সম্বন্ধে। জিজ্ঞাসু ব্যারিস্টার ভগবান দীন দুবে বললেন-ইয়াদ কর লিয়া।

১২। ভিন্ন করিয়া বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পরিষদের প্রতিষ্ঠা।

১৩। এলাহাবাদে সিভিল লাইনস্— সাহেব পাড়া। মুঠিগঞ্জ মহাজনীটোলা, কর্নেল গঞ্জ, সাউথ রোড।

১৪। রবীন্দ্রনাথের ঘর রবিবর্মার ছবিতে ভরা ছিল।

১৫। চিন্তামণি ঘোষের Indian Press, গঙ্গানাথ ঝা সম্পাদিত Pundit ছাপা হয়। একটি ছাপার ভুল দেখিয়ে Professor তিবোর (Thibaest) মন্তব্য- অত্যন্ত খারপ ভুল।

১৬। প্রবাসীতে প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ-ধুতিচাদর বর্জন করে বিলাতী পোশাক পর। কারণ ভয়ানক effeminate পোশাক।

Ref মানভূম। সাঁওতালী মেয়ের গান।

১৪। সন্ন্যাসীর কীর্তি। রোগী ভক্তের ঘরে ছাগল রেখে দেওয়া হলো। ছাগল রুগ্ন হলো ভক্ত সুস্থ হলো।

১৫। বড় সাহেব বাঘ শিকার। False কীর্তি Ref-জ্ঞানগুপ্ত আই. সি. এস. এবং ভাইসরয়দের বাঘ মাপবার স্পেশাল ফিতা অন্য লোকে বাঘটাকে মারে। সাহেবের কীর্তি বলে ঘেষণা করা হয়। অজস্র ফ্ল্যাটারি। সাহেব প্রকৃত শিকারীকে বকসিস দেয়, তুম নেহি ডরা, ইস লিয়ে তুমকো বকসিস দেতে হেঁ।

সরোজিনী নাইডুর কবিতা— কোয়েল সিংগস্ lire hire. Edmund Goss প্রশস্তি করেছেন। সাহেব কোকিল। কিন্তু খাঁটি কোকিল-কুহু রব। কবিতা।

৭। লজ্জাবতী বানর— বালখিল্য মুনিদের মত নিম্নমুখী হয়ে গাছে ঝোলে।

৮। পোষা কুকুরী পোয়াতী হলো? কেমন করে? কোন কুকুরের সঙ্গে তার মেশামেশি নেই তো। জানা গেল নিশাযোগে গোপনে এক নেকড়ে আসে, কুকরীর সঙ্গে সঙ্গম করে।

□ পশু : প্রকৃতি : প্রেম □

তাসিলদারী চাকরির এই এক বছরের জীবনে কত রকমেরই না জমিদারী জীবনের চেহারা দেখতে পেয়েছে রামতনু। নামে সবাই জমিদার, কেউ নিতান্ত সামান্য অবস্থার মানুষ, কেউ বা অত্যন্ত ধনী অবস্থার মানুষ। কেউ গরুর গাড়ি চড়ে জঙ্গলের পথ পার হয়ে সদর শহরের বাজারে ও কাছারিতে যান। কেউ বা হাতীর পিঠে চড়ে যাওয়া-আসা করেন। জঙ্গলে এক-একটা গাঁয়ের ভিতরে জমিদার-বাড়ির চেহারা দেখে তাদের অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। কারও চেহারায় গরুর গাড়ির মত একটা সামান্যতা কারও বা হাতীর মত মস্ত রকমের একটা অস্তিত্ব। যেমন উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা মস্ত বড় গড়বাড়ি আছে, তেমনই মাটির দেয়াল, বাঁশের খুঁটি আর খাপরার চালা নিয়ে নিতান্ত ক্ষুদ্র চেহারার জমিদার-বাড়িও আছে। কিন্তু তিন-পাহাড়ী জমিদারীর মত কোন জমিদারী কোথাও দেখতে পায়নি রামতনু। জমিদার মশাই দেখতে যেমন অদ্ভুত, তেমনই তাঁর বাড়িটিও। শালজঙ্গলের মধ্যে বিরাট চেহারার এক বুড়ো বটের কাছে কুঁড়েঘরের মত একটা অত্যন্ত দীনহীন চেহারার ঘরে বাস করেন জমিদার বলবন্ত রায়। কিন্তু এমন নির্বলবন্ত চেহারা খুব কমই দেখতে পাওয়া যায়। জিরজিরে রোগা শরীরের উপর একটা ছেঁড়া গেঞ্জি, মাথার সব চুল সাদা, ধুতিটা হলুদ রং দিয়ে ছোপানো। সত্তর বছর বয়সের বলবন্ত রায়ের চেহারার মধ্যে যেন এক বনবাসী ঋষির চেহারা লুকিয়ে রয়েছে।

তিনপাহাড়ী জমিদারীর চেহারাটা আরও নির্বলবন্ত। আরও করুণ ও গরীব। পাশাপাশি তিনটে ছোট পাহাড়ের পায়ের কাছে ছোট-ছোট সাতটা কুঁড়েঘরে যে দশজন কাঠুরিয়া থাকে, শুধু তারাই বলবন্ত রায়ের প্রজা। এরা ছাড়া আর কোন প্রজা নেই। এরা এদিক-ওদিকের জঙ্গলে কাঠ-কাটা ঠিকেদারের কাজ করে যা পায়, শুধু তাই হল এদের প্রতিদিনের জীবনের রোজগার। আর জমিদার বলবন্ত রায় তাদেরই কাছ থেকে খাজনা হিসাবে প্রতিদিন পাঁচ-সাত আনা যা পান, তাই হল তাঁর বৈষয়িক সম্বল।

কোয়েল নদীর একটা স্রোত পালামৌ জেলার সীমান্ত পার হয়ে যেখানে হাজারিবাগ জেলার ভয়ানক ঘন জঙ্গলের অন্তঃপুরে প্রবেশ করেছে, সেইখানে ঠাকুর-সাহেবদের মানপুরা জমিদারীর বড় জঙ্গলটাও জেলার সীমা ছাড়িয়ে হাজারিবাগে ঢুকেছে। তহসিল কাছারীর দাওয়ার উপর বসে সামনের তিনপাহাড়ী জমিদারীর একরত্তি শালজঙ্গলটার দিকে তাকিয়ে রামতনু মাঝে মাঝে বলবন্ত রায়ের দীনদশার কথা ভাবে। ভাবতে গিয়ে আর একজনের কথাও চিন্তার মধ্যে এসে যায়। এখানে বসে তাকে দেখতেও পাওয়া যায়। তিনপাহাড়ীর ছোট শালজঙ্গলের মধ্যে যে

বিশালকায় বটগাছটা দাঁড়িয়ে আছে, তারই কথা। এই বুড়ো বটের বয়সের নাকি সীমা-পরিসীমা নেই। আরও যে-সব গল্প শোনা যায়, তা শুনে মনে হবে, ওই বট যেন কঠিন এক রহস্যের বট; বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে না, আবার মাঝে মাঝে খুব করে। বলবন্ত রায় একদিন নিজেই এসে তসিলদার রামতনুর সঙ্গে অনেক গল্প করে অনেক কথা শুনিয়ে গিয়েছেন। সন সাতান্নর সেই বলোয়া, অর্থাৎ আঠারোশ সাতান্ন সালের সেই বিদ্রোহের সময় ইংরেজের ফৌজের বিরুদ্ধে জীউ-জান ভিড়িয়ে দিয়ে লড়াই করেছিলেন যে রামাবতার রায়, তিনিই ছিলেন সেদিনের তিনপাহাড়ের জায়গীরদার। কর্নেল ডালটনের ফৌজ এসে আর তোপ দেগে দেগে তিনপাহাড়ীর ছোট গড়-কেল্লার ইঁট-পাথরের শরীরটাকে একেবারে গুঁড়ো করে দিয়েছিল। সেই গড়-কেল্লার ধ্বংস আজও ওখানে যেন শালজঙ্গলের মধ্যে মুখ লুকিয়ে রয়েছে। কাছে গিয়ে দেখলেই বুঝতে পারা যায়। গড়-কেল্লার বিধ্বস্ত চেহারার ইঁট-পাথর নতুন শালজঙ্গলে ছেয়ে গিয়েছে। এই দৃশ্যটা দেখে বেশ একটু খুশিই হয়েছে রামতনু। সবজায়গায় দেখা যায় যে, ইঁট-পাথরের বস্তির মার খেয়ে জঙ্গলই মরেছে। এই প্রথম দেখতে পাওয়া গেল জঙ্গল যেন নিজের জেদের জোরে এগিয়ে গিয়েছে; আর পুরনো গড়-কেল্লার আর পুরনো বসতির সব ঠাঁই জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে।

কিন্তু ওদিকে, মাত্র দু'মাইল দক্ষিণে রাঁচি-লাতেহার সড়কের যেখানে নিত্য-দিনের সার্ভিসের বাস থামে আর যাত্রী নামায়, শোনা যায় সেখানের দশ বছর আগের ভয়ানক জঙ্গলটার কোন চিহ্ন নেই। আজ সেখানে বিশ-পঁচিশটা দোকান নিয়ে অনেক মানুষের বসতি। সেই বসতির নাম দারুচটি। দারু, তার মানে মদ। প্রথম যে-দোকানটি এখানে সড়কের পাশে ঠাঁই নিয়েছিল, সেটা ছিল দেশী মদের একটি দোকান।

পুরনো শালজঙ্গলটা মরে গিয়েছে। বিশ-পঁচিশটা দোকানঘর যেন শহরের জিনিস জঙ্গলে ঢুকিয়ে দেবার, আর জঙ্গলের জিনিস বাইরে চালান দেবার যত দালালগিরির বিশ-পঁচিশটা আড্ডা। সে আড্ডার সব মানুষই হল শহরের মানুষ, একজনও জংলী গাঁয়ের মানুষ নয়।

দারুচটির যে দুটি মানুষ প্রতি সপ্তাহে অন্তত একবার লাতেহারের বাজারে যায় আর পরের দিনই ফিরে আসে, তারা খুবই অন্তরঙ্গ দুই বন্ধু-মানুষ। সুখলাল আর জগদীশ। এই যাওয়া-আসার পথটি হল সাদা কাঁকর দিয়ে পেটানো সরু পথ, তিনপাহাড়ীর কাঠুরিয়াদের বস্তি ছুঁয়ে, মানপুরার তসিলদারির আঙিনা ছুঁয়ে লাতেহার পর্যন্ত চলে গিয়েছে। দুই বন্ধুর কাঁধের উপর দুই ঝুড়ি। সবাই জানে ওই দুই ঝুড়িতে কোন্ পণ্য ভরে নিয়ে ওরা লাতেহারের বাজারে যায়। সুখলালের ঝুড়িতে থাকে গোটা কুড়ি জীবন্ত বাদুড়, আর জগদীশের ঝুড়িতে কিছু না। লাতেহার বাজার থেকে নানা চমকদার যে-সব সুন্দর জিনিস সুখলাল তার

ঘরের সুন্দরী বউয়ের জন্য কেনে, সেগুলিকে খুব যত্ন করে জগদীশ তার ঝুড়ির মধ্যে তুলে নেয়। একদিন নয়, এক মাসও নয়; আজ প্রায় দুবছর হল এইরকম দুই একটা কারবার দুই বন্ধুকে ব্যস্ত করে রেখেছে। দারুচাটির সবাই দুই বন্ধুর সম্পর্কের আর-একটা খবর রাখে। জগদীশ তো কোন কারবার করে না, তাই সুখলাল তার অন্তরঙ্গ বন্ধু জগদীশকে প্রতি সপ্তাহে ডাল-ভাত খাওয়ার মত দুটো টাকা দিয়ে সাহায্য করে। এর বেশি টাকা জগদীশের দরকারও হয় না। সুখলালের ঘরে যেমন সুন্দরী বউ আছে, জগদীশের ঘরে তো সে রকমের কেউ নেই। জগদীশ নিজেও কোনদিন সুখলালের কাছে এমন দাবি করে না যে, আরও দুই-এক টাকা বেশি দিলে ঠিক সাহায্য করা হয়। দেখে মনে হয়, জগদীশ যেন সুখলালের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেই সুখী। সুখলালের কাছ থেকে দু' তিনটে টাকার সাহায্য যদি নাই বা পায় জগদীশ, তবেই বা কী? জগদীশ শূন্য পেটের ক্ষুধা নিয়েই বন্ধু সুখলালের সাহায্যের জন্য যে-কোন খাটুনির কাজে খাটবে। জগদীশ বলে, পয়সার অভাবে না খেতে পেলে শুধু আমার পেটটা শূন্য হয়ে থাকবে, কিন্তু আমার আত্মা তো ভরে থাকবে।

কথাটা সুখলালের সুন্দরী বউ মোহিনীর সামনেই দাঁড়িয়ে সুখলালকে কতবার শুনিয়ে দিয়েছে জগদীশ। সুখলাল আর মোহিনী, স্বামী-স্ত্রী দুজনেই খুশি হয়ে হেসেছে।

মোহিনীকে খুশি করা, মোহিনীর প্রাণটাকে সমস্তক্ষণ হাসিয়ে রাখাই যে সুখলালের ধ্যান-জ্ঞান আর সাধনা। প্রতি মাসে একটি না একটি রুপোর গয়না লাতেহার বাজার থেকে কিনে নিয়ে এসে মোহিনীর খুশি প্রাণ আর খুশি চোখ দুটোকে হাসিয়ে দেয় সুখলাল।

॥ দুই ॥

বুড়ো বলবন্ত রায় খুবই উদ্বিগ্ন ও করুণ মূর্তি নিয়ে মানপুরার তহসিল কাছারিতে রামতনুর কাছে এসে দাঁড়ালেন। অভিযোগ করলেন—সুখলাল আমার বটগাছের বাদুড় ধরে নিয়ে লাতেহারের বাজারে বিক্রী করে। আমার কোন আপত্তি গ্রাহ্য করে না। বরং আমাকে অভদ্র ভাষায় ভয় দেখায় যে, আমার ঘরে আগুন লাগিয়ে দেবে।

হঠাৎ বলবন্ত রায়ের দুই চোখ জলে ভরে যায়। কেশে নিয়ে গলার ভিতরের বদ্ধ একটা ব্যথার বাতাসকে যেন সরিয়ে দিয়ে আবার কথা বলেন—আরে বাবা, আমার ঘরটা কি পুড়িয়ে ছাই করে দেবার মত একটা ঘর! জায়গীরদার রামাবতার রায়, যিনি একদিন ইংরেজ ফৌজকে মেরে এই পরগণা থেকে দূর করে দিয়েছিলেন, তাঁরই বংশধর এই বলবন্ত রায়ের চেহারাটা একবার দেখুন।

প্রতিশোধ নিতে এসে ইংরেজের ফৌজ এই তিনপাহাড়ী দলের নেতা বাবু

রামাবতার রায়কে গুলি করে, আর বাড়ির সব পুরুষমানুষকে ওই বটগাছের ডালে-ডালে ঝুলিয়ে দিয়ে মেরেছিল। আমার ঠাকুরদার বয়স তখন দশ বছর। তাঁকে ফাঁসিতে ঝোলাবার জন্য টেনে নিয়ে গিয়েও কর্নেল তাঁকে রেহাই দিয়েছিলেন। বললে আপনি কি বিশ্বাস করবেন তহসীলদারজী, তাদের আত্মা আজও ঐ বট-গাছের ডালে ডালে ঝুলছে? শুধু তাদের। আত্মা নয়, পালামৌ জেলার সব গাঁয়ের আর গড়ের পুরুষমানুষদের আত্মা, যাদের ধরে নিয়ে গিয়ে আর গাছে গাছে ফাঁসির দড়িতে ঝুলিয়ে দিয়ে মেরেছিল ইংরেজের ফৌজ, তাদের সবারই আত্মা আমার ওই বুড়ো বটগাছে আশ্রয় নিয়েছে বলে আমার বিশ্বাস।

কী বললেন?

হ্যাঁ, আমাকে একটা পাগল বলে মনে করুন, আমি কিন্তু সত্যি বিশ্বাস করি, ওরা বাদুড় হলেও ওরা আমাদের এই পালামৌ জলার সেই সব মানুষেরই আত্মার রূপ, যাঁরা সেদিন ইংরেজের দড়ির ফাঁসিতে মরেছিলেন। ঠাকুরদাদা বলতেন, আমিও বিশ্বাস করি তহসীলদারজী, এই বটগাছ কোনদিন শূন্য থাকবে না।

তার মানে?

তার মানে, মানুষ হোক বা বাদুড় হোক, কেউ না কেউ এই বটের ডালে ঝুলে থাকবেই থাকবে। কখনও শূন্য থাকবে না।

জোরে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে নিয়ে আবার কথা বলেন বলবন্ত রায়।···আপনি কি কখনও আমাদের বুড়ো বটের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন?

না, দূর থেকে দেখেছি।

দূর থেকে দেখলে কিছুই বুঝবেন না। একবার কাছে গিয়ে দেখুন। সকালবেলা দেখলে আপনারও মনে হবে, যেন শত শত বালখিল্য মুনি মাথা নীচু মুখী করে ঝুলছেন আর সকালবেলার আলো পান করছেন। পড়েছেন তো পুরাণ-কাহিনীর বালখিল্য মুনিদের কথা?

বলতে বলতে হেসে ফেলেন বলবন্ত রায়। সাদা চুলে ভরা মাথাটা দুলতে থাকে। হঠাৎ বলবন্ত রায়ের দুই চোখের চেহারা কাঁপতে কাঁপতে অদ্ভুত হয়ে যায়। আমি সুখলাল নামে বাদুড়চোর লোকটাকে স্পষ্ট ভাষায় সাবধান দিয়েছি। আর নয়, এবার থাম। নইলে ভয়ানক প্রতিশোধ নেবে এই বুড়ো বট। জান না, বাদুড়গুলি যে এই বুড়ো বটের পোষা সন্তানের মত।

রামতনু দুঃখিত স্বরে তার অক্ষমতার কথা বলে।—আমি তো মানপুরের তহসিলদার; দারুচটির কাউকে কিছু বলবার এক্তিয়ার তো আমার নেই।

বলবন্ত রায়—ঠিকই বলেছেন। আপনার কিছু বলবার এক্তিয়ার নেই।·আচ্ছা চলি। যার এক্তিয়ার আছে, সে-ই একদিন বলবে আর দেখিয়ে দেবে।

ভেবে নিয়ে, আর বেশ একটু ব্যস্ত হয়ে, তিনপাহাড়ীর এই নিদারুণ গরীব, ঋষি ঋষি আর পাগল-পাগল বলবন্ত রায়ের সঙ্গে হেঁটে-হেঁটে বুড়ো বটের কাছে এ

দাঁড়ায় রামতনু। সত্যিই তো, কী রকমের একটা বিস্ময় যেন বটগাছটার ডালপালার ভিতরে ছায়াময় আবেশ সৃষ্টি করে রেখেছে। বুড়ো বটের ডালপালার স্তব্ধতা যেন নিঝুম হয়ে শত শত বাদুড়কে ঘুম পাড়িয়ে নিথর করে দিয়েছে। কল্পনার চোখ দিয়ে নয়, সাদা চোখে দেখলেই মনে হয় বুড়ো বট যেন তার সর্বাঙ্গের মায়া দিয়ে বাদুড়গুলিকে পুষেছে।

বলবন্ত রায় বলেন—আমার কেউ নেই তহসিলদারজী। আছে শুধু এই বুড়ো বট। আমার বিশ্বাসের বাতিক বলুন, আর যা-ই বলুন, এই বটগাছ যেমন বাদুড়গুলিকে ভালবাসে, তেমনই আমাকেও ভালবাসে। আরও বলে রাখছি, মনে রাখবেন তহসিলদারজী, আমাকে এত দুঃখ দিয়ে আর এত অপমান করে আনন্দ করছে যে লোকটা, এই বটগাছই একদিন তার বিচার করবে।

বাদুড় ধরবার মস্ত বড় একটা জাল একজন লোক সঙ্গে নিয়ে এই সকালবেলাতেই বুড়ো বটের কাছে উপস্থিত হয় আর চেঁচিয়ে হাসতে থাকে দারুচটির সুখলাল।

এ কী ব্যাপার! ভয়ানক ক্ষুব্ধ স্বরে চেঁচিয়ে উঠলেন বুড়ো বলবন্ত রায়।

সুখলাল হাসে।—এবার দিনের বেলাতেও বাদুড় ধরব। এই জালে দিনের বেলাতেও বাদুড় ধরা যায়।

না, আর এসব চলবে না।

সুখলাল—আমি বলছি, চলবে।

এক হাত দিয়ে বুকের উপর ভয়ানক শক্ত একটা অহংকারের চাপড় মেরে সুখলাল চেঁচিয়ে ওঠে।—আমি, দারুচটির সুখলাল বলছি। বুঝে-সুঝে কথা বলুন।

বলবন্ত রায়—আমি কিন্তু তোমাকে মিনতি করে বলছি সুখলাল, তুমি একাজ আর করো না। বাদুড় ধরা বন্ধ কর।

সুখলাল—আমি বলছি, কিছু টাকা নিন, আমি দিচ্ছি। কিন্তু এরকমের চেঁচামেচি আর করবেন না।

ফুঁপিয়ে উঠলেন বলবন্ত রায়।—শুনলেন তো তহসিলদারজী, একটা বাদুড়চোর আজ তিনপাহাড়ীর জমিদারকে, রামাবতার রায়ের বংশধরকে বকসিস দিতে চাইছে।

সুখলালও চেঁচিয়ে ওঠে—বুড়া পাগল নেহি তো! যাও না, থানাতে গিয়ে নালিশ কর, না হয় লাঠি-বল্লম হাতে নিয়ে ফৌজদারী কর।

রামতনুর পক্ষে এটা সহ্য করবার মত কোন দৃশ্য নয়। কিন্তু বাধা দেবারই বা অধিকার কোথায়? তহসিলকাছারির তিনটে পেয়াদাকে এখনই ডেকে নিয়ে এসে এই বাদুড়চোর লোকটাকে লাঠিপেটা করে তাড়িয়ে দেওয়া যায়, কিন্তু তাতে কি বলবন্ত রায়ের কোন উপকার হবে? একদিন রাত্রিবেলা ঘোর বন্য অন্ধকারের মধ্যে চুপি চুপি এসে বর্বর স্বভাবের সুখলাল যদি অসহায় এই বুড়ো মানুষটাকে পুড়িয়ে মেরে ফেলতে যায়, তখন বাধা দেবে কে?

। বলবন্ত রায়ের রোগা শরীরটা থর্ থর্ করে কাঁপে, যেন কাঁপছে তাঁর অসহায় গরীব আত্মাটা।—আমি এখন কী করি বলুন তহ্‌সিলদারজী ?

রামতনু বলে—আপনি এখন আমার সঙ্গে আসুন।

॥ তিন ॥

লাতেহার বাজারের চাঁদিবেচা মহাজন ভরতরাম সাধু বলেছে, এই দু'বছরের মধ্যে প্রায় দুই হাজার টাকার রুপোর গয়না কিনেছে দারুচটির বাদুড়বেচা সুখলাল। হাঁসুলি টায়রা বাজুবন্ধ, বেঁকী ঝুমকা আর পাঁয়জোর, এবং আরও কতরকমের গয়না। না, এবার আর রুপোর গয়না নয়, এবার কয়েকটা ভাল রকমের সোনার গয়না কিনতে হবে। মাথার মধ্যে তাড়ির নেশা নিয়ে আর ডগমগ আহ্লাদের স্বরে ভরতরামের কাছে তার সুখের জীবনের অনেক কথা বলে ফেলেছে সুখলাল। তার বউ মোহিনীর মত সুন্দরী মেয়ে অন্তত এই লাতেহারের কোন ঘরে নেই। এই মোহিনীরই শখ হয়েছে, তার দুই হাতে সুখলালের গলা জড়িয়ে ধরে শখের কথাটাকে বলেও দিয়েছে মোহিনী—রুপোর জিনিস আর নয়, এবার কয়েকটা সোনার জিনিস হলে ভাল হয়।

দুই পেয়াদার মধ্যে এরকমের আলোচনার চাপা-চাপা ভাষা রামতনুর কানেও পৌঁছেছে। সেই সঙ্গে তিনপাহাড়ীর বুড়ো বলবন্ত রায়ের করুণ আক্ষেপেরও কিছু কথা জানতে পেরেছে রামতনু। আর ক'টা দিনই বা বাকি আছে, বুড়ো বটের শেষ বাদুড়টা সুখলালের জালে বন্দী হয়ে আর বিক্রীর মাল হয়ে লাতেহার বাজারে চলে যাবে। শূন্য শূন্য, একেবারে শূন্য হয়ে যাবে বুড়ো বট। সব সময় করুণ রকমের চিৎকার ছাড়ছেন বুড়ো বলবন্ত রায়।

দেখে বুঝতে পেরেছেন বলবন্ত রায়, আর দুই একদিনের মধ্যেই সব হিসেবের শেষ হয়ে যাবে। আর একটিও বাদুড়কে দেখতে পাওয়া যাবে না।

ঠিকই, আর তিনটে দিন পরে যেদিন বিকেল হতেই জাল গুটিয়ে নিয়ে চলে গেল সুখলাল, সেদিন দেখে চমকে উঠলেন বলবন্ত রায়। বুকের ভিতরে দুঃসহ একটা আর্তনাদ গুমরে উঠতে থাকে বুড়ো বটের ডালে একটিও বাদুড়কে আর ঝুলতে দেখা যাচ্ছে না।

সেদিনই রাত্রিতে ভয়ানক ঝড়ের আবেগে বুড়ো বটের সব ডালপালা উত্তাল হয়ে উঠল। বিদ্যুতের ঝিলিক লেগে জঙ্গলের অন্ধকার ঝলকে যাচ্ছে। সত্যিই কি বুড়ো বটের প্রাণে ভয়ানক রকমের একটা প্রতিশোধের প্রতিজ্ঞা উতলা হয়ে উঠছে ?

বৃষ্টির অবিরাম ধারার শব্দ শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়লেন বলবন্ত রায়। ভালই হবে, এই ঘুম যদি আর না ভাঙে। বুড়ো বটের ভয়ানকরিক্ত চেহারা দেখতে হবে না।

কখন বৃষ্টি থেমেছে, জানেন না বলবন্ত রায়। ঘুম ভাঙতেই বুঝতে পারেন, চারদিকের জঙ্গলের মধ্যে কোন জলস্রোতের শব্দও আর বাজছে না। বুড়ো বটের ডালপালার সব চঞ্চলতা একেবারে স্তব্দ হয়ে গিয়েছে।

শুনে চমকে উঠলেন বলবন্ত রায়। বোধহয় কোন নতুন বাদুড় উড়ে এসে বুড়ো বটের বুকে ঠাঁই নিতে চেষ্টা করছে। বটগাছের একটা ডালের পাতার মধ্যে যেন নতুন একটা আগন্তুক শব্দ উসখুস করছে। কিন্তু বলবন্ত রায়ের জাগা প্রাণটা যেন আবার নিঝুম হয়ে যেতে চায়। কার কী লাভ হবে, আবার যদি বাদুড়ের দল এসে এই বুড়ো বটের গায়ে ঠাঁই নিতে থাকে? লাভ হবে শুধু ওই নিরেট নির্দয় লোকটার, যার নাম সুখলাল।

বটগাছের ডালপালার ভিতরে আগন্তুক উসখুস শব্দটা হঠাৎ যেন ঝুপ করে নীচে পড়ে গেল। আবার চমকে ওঠেন ঘুম-ভাঙা বলবন্ত রায়। কী হল? এ কিসের শব্দ? রাত ফুরোবার আর কতক্ষণ বাকি?

ভোরের প্রথম পাখির মৃদুস্বরের ডাক বেজে উঠতেই ঘরের বাইরে এসে বটগাছের দিকে তাকিয়ে থাকেন বলবন্ত রায়। বিস্মিত হয়ে শিউরে ওঠে তাঁর দুটি শিথিল চোখের দৃষ্টি। বটগাছের একটা ডালের সঙ্গে জড়িয়ে বাঁধা ফাঁসির দড়িতে ঝুলে রয়েছে সুখলালের শরীরটা। ভয়ানক উগ্র স্বভাবের সেই সুখলালের চেহারাটা যেন বিনীত ভঙ্গীতে মাথা হেঁট করে ঝুলছে।

না, ঠাকুরদাদা একটুও মিথ্যে করে কিংবা বাড়িয়ে বলেননি। এই বটগাছের ডালের সঙ্গে কেউ না কেউ ঝুলে থাকবে, মানুষ হোক বা বাদুড় হোক। শূন্য হয়ে থাকতে পারে না এই বুড়ো বট। কিন্তু কী ভয়ানক প্রতিশোধ নিতে পারে!

দারুচটির অনেক লোক ছুটে এসে যখন বুড়ো বটগাছের কাছে ভিড় করে, তখন এদিক-ওদিকের আরও কয়েকটা জংলী-বস্তির মানুষও ছুটে আসে। দারুচটির বাদুড়ওয়ালা সুখলাল আত্মহত্যা করেছে, সবাই খবর পেয়ে গিয়েছে। খবর পেয়ে রামতনু আসে।

দারুচটির লোকেরা চেঁচিয়ে শোরগোল করে যে সব কথা বলতে থাকে, বুড়ো বটের পাতাগুলি যেন তাই শুনে হাসছে। সকালবেলার রোদ বটের পাতার উপর পড়ে চক চক করছে।

এই বুড়ো বটের গায়ের উপর পাতা বাদুড়ধরা জাল গুটিয়ে নিয়ে দিনের বেলায় ঘরে ফিরবে সুখলাল, এটা তে কল্পনা করতে পারেনি সুখলালের সুন্দরী বউ মোহিনী, আর সুখলালের অন্তরঙ্গ বন্ধু জগদীশ। ঘরের দরজার কপাটে হাতের ঠেলা দিয়েই বুঝতে পারে সুখলাল দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। ঘুমিয়ে পড়েছে মোহিনী। মোহনীকে বার বার নাম ধরে ডাকে আর হাতের ঠেলা দিয়ে বন্ধ দরজার কপাট দুটোকে বার বার কাঁপিয়ে দিতে থাকে সুখলাল। সুখলালের মনের ভিতরে একটা সন্দেহ প্রমত্ত হয়ে উঠতেই লাথি মেরে দরজার কপাট ভেঙে ফেলে সুখলাল

ঘরের ভিতরে এসে দাঁড়াতেই নিদারুণ বিস্ময়ের একটি দৃশ্য দেখতে পায়। এলোমেলো বিছানার দুদিকে চুপ করে বসে আছে দুইজন, এদিকে মোহিনী, আর ওদিকে জগদীশ।

ঘরের এক কোণ থেকে টাঙি হাতে তুলে নিয়ে জগদীশের মাথার উপর কোপ বসিয়ে দেবার জন্য জগদীশের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে সুখলাল। সেই মুহূর্তে মোহিনী ওর চোখের দৃষ্টিকে হিংস্র করে নিয়ে সুখলালের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আর টাঙিটাকে কেড়ে নেয়। মোহিনীর সোনার নাকফুল যেন আগুনের ফুলকির চেহারা নিয়ে জ্বলতে থাকে।

ঘরের বাইরে এসে ভয়ানক উন্মত্ত আক্রোশের স্বরে চেঁচিয়ে ওঠে সুখলাল—আগুন লাগাও, আগুন লাগাও।

কিন্তু আগুন লাগিয়ে ঘরটাকে পুড়িয়ে দিতে পারে না সুখলাল। দারুচটির লোকজন ছুটে এসে বাধা দেয়। সুখলালকে সবাই মিলে জোর করে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে দাওয়ার উপর বসিয়ে দেয়। ঠেলে ঠেলে জগদীশকে ঘরের বাইরে বের করে দিতেও দেরি করে না। মারামারি কাটাকাটির একটা কাণ্ড আবার না বেধে যায়, তাই ঘরের ভিতরে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা মোহিনীর হাত থেকে টাঙিটাকে কে যেন কেড়ে নেয়। হ্যাঁ, রহস্যটা সবার আগে বুঝতে পেরে আর মুখ টিপে-টিপে হেসেছে যে বিভূতি মিশির, সে-ই মোহিনীর হাতের টাঙিটাকে নিয়েছে। তারপর কী হল বা না হল কেউ দেখতে পায়নি। বৃষ্টি শুরু হতে সবাই যে-যার ঘরের দিকে দৌড় দিয়েছে। আর রাত শেষ হবার পর ভোরের আলোতে সবার আগে দেখতে পেয়েছে বিভূতি মিশির, হেঁটে হেঁটে কোথায় যেন চলে যাচ্ছে জগদীশ আর মোহিনী। মোহিনীর হাতে ছোট একটা বাক্স ঝুলছে, বোধহয় গয়নার বাক্স। রাঁচি যাবার যাত্রী নেবার জন্য ওই যে প্রথম মোটরবাস ছুটে সড়কের উপর থেমেছে আর গরু গরু করে শব্দ ছাড়ছে, সেই মোটরবাস ধরবার জন্যেই কি ওরা দুজন হন হন করে হেঁটে চলে যাচ্ছে?

সকাল হতেই দারুচটির সবাই জানতে পারে, জগদীশ আর মোহিনী পালিয়েছে। আর সুখলালও ঘরে নেই। কোথায় গেল সুখলাল?

এই তো, মাত্র ঘণ্টা দুই আগে একজন কাঠুরিয়ার মুখ থেকে খবর শুনতে পেরেছে দারুচটির লোকেরা, তিনপাহাড়ীর বুড়ো বটগাছে একটা লাস ঝুলছে। তবে কি ওটা সুখলালের লাস। আত্মহত্যা করল নাকি সুখলাল?

তাই দারুচটির লোকজন ছুটে এসেছে। আর দেখতে পেয়েই হায়-হায় করে চেঁচিয়ে উঠেছে। সত্যিই তো, সুখলালেরই লাস ঝুলছে।

বুড়ো বটের বিরাট চেহারাটার দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে থাকে রামতনু। সত্যিই তো মনে হচ্ছে, বুড়ো বট যেন বিরাট এক ব্যক্তি, চুও করে এই শোরগোলের ভাষা শুনছে। রামতনুর কাছে এসে বুড়ো বলবন্ত রায় জিজ্ঞাসা করে—কী দেখছেন তহসিলদারজী? এখন, বলুন, আমার এই বুড়ো বট প্রতিশোধ নিতে পেরেছে কি না?

রামতনু—পেরেছে।

মদির মধুক বনে, ম্লান জ্যোৎস্নালোকে, কোলে লয়ে ঋক্ষশিশু । কবি অক্ষয় কুমার বড়ালের একটি কবিতায় যার পরিচয় পাওয়া যায়, তারই রূপের কথা ব্যাখ্যা করে বলতে ও বোঝাতে গিয়ে বাংলার প্রফেসর চারুবাবু বলতেন যে শুধু তপোবনচারিণী কোন ঋষিবালক নয়, জঙ্গলের একজন আদিবাসী জাতির মেয়েও যদি মহুয়া বনের একটি গাছের কাছে কোন শুক্লা সন্ধ্যার ফিকে জ্যোৎস্নার মধ্যে একটি ভালুকের বাচ্চাকে কোলে নিয়ে বসে থাকে, তবে তাকেও রূপময়ী এক বনবালা বলে মনে হবে। মৃগশিশু কোলে শকুন্তলাকে যেমন সুন্দর দেখায় তেমনই সুন্দর দেখাবে ঋক্ষশিশু কোলে একজন আদিবাসী মেয়েকে। তবে হ্যাঁ, জঙ্গল। থাকা চাই, সেই জঙ্গলে মহুয়া গাছের মতো চমৎকার গাছ থাকা চাই, আর একটু জ্যোৎস্নালোকও থাকা চাই।

তসীলদার রামতনু বদলি হয়ে জঙ্গলে এসে একটি কাছারিবাড়ির ঘরে এসে ঠাঁই নিয়েছে, সেটা হল ভাল পাখি আর ভাল মহুয়ার জন্য বিখ্যাত সেই সিমারিয়া জঙ্গল এই মহুয়া জঙ্গলের শুরুতে চোরকাঁটা ঘাসে ছাওয়া মাঠের ওপর গোটা দশেক মহুয়া গাছ দাঁড়িয়ে আছে, শুধু সেগুলি হল ঠাকুরসাহেবদের এস্টেটের সম্পত্তি সিমারিয়া জঙ্গলের যে অংশ ঠাকুরসাহেবদের সম্পত্তি, তার বেশির ভাগ হল রোগা চেহারার যত বাঁদুরে শালের বিরাট জঙ্গল। সারা বছর ধরে এই বাঁদুরে শাল গাছ কেটে যারা জীবিকা নির্বাহ করে, তারা ঠাকুরসাহেবদের সিমারিয়া জঙ্গলেরই মধ্যে নানা দিকে বস্তি বেঁধে বাস করে। তারাই হল ঠাকুরসাহেবদের প্রজা, সারা বছরে শুধু এই বাঁদুরে শালগাছ থেকেই নাকি এস্টেটের সাত-আট হাজার টাকা আয় হয়।

প্রজাদের যে বস্তিটা তসীল কাছারির খুব কাছে, সেই বস্তির সকলেই আদিবাসী গন্‌ঝু জাতের লোক। এখানে এসে, এই তসীল কাছারির দাওয়ার ওপর দাঁড়িয়ে সামনের মহুয়া বনের সুবিশাল বিস্তার আর উৎফুল্ল রূপ দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল রামতনু। আর, সেদিনই সন্ধ্যাতে গন্‌ঝু বস্তির চারদিকে একটু ঘুরে বেড়াতে গিয়ে হঠাৎ যেন বাংলার প্রফেসার চারুবাবুর কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়ে চমকে উঠেছিল। চারুবাবু তো এখন আর বেঁচে নেই, এক বছর আগে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। তবু কী আশ্চর্য, তাঁরই গলায় স্বর বাগানের ঘাসে আর মহুয়া গাছের উতলা পাতার শব্দের সঙ্গে বেজে উঠেছে। ঠিকই তো, বুঝতে পারছে রামতনু চারুবাবুর এই কণ্ঠস্বর যে রামতনুর মনেরই একটা শব্দ। ঠিকই তো, গন্‌ঝু বস্তির একটি ঘরের কাছে মহুয়াতলায় সত্যিই একটা ভালুকের বাচ্চা কোলে নিয়ে বসে আছে একটি যুবতী

মেয়ে। বেশি দূরে নয় বরং বেশ কাছে দাঁড়িয়ে রামতনু সত্যিই যেন কবির কল্পনার এক বনবালার মূর্তি দেখতে থাকে আর বেশ অশ্চর্য হয়েও যায়।

এর আগে গন্‌ঝু জাতের অনেক পুরুষ ও মেয়েকে অনেকবার দেখেছে রামতনু। সেই ভেলাডিহিতে পঞ্চাশ ঘর গন্‌ঝু প্রজা ছিল, যারা তাদের পরবের দিনে দল বেঁধে কাছারিবাড়িতে এসে গান গাইত আর নাচত। কিন্তু তাদের মধ্যে এমন একটি মেয়েও ছিল না, যাকে এই মেয়েটির মতো রূপসী বলে মনে করা যায়। কিংবা এও হতে পারে যে, এই ফিকে জ্যোৎস্নাটা বিহ্বল হয়ে একটা সুন্দর মায়ার আবেশ গন্‌ঝু মেয়েটার সারা শরীরে মাখিয়ে দিয়েছে। ভালুকের বাচ্চাটাকেও কত নরম-সরম একটা চমৎকার রূপের শিশু বলে মনে হচ্ছে।

বুঝতে পারে রামতনু এই শুক্লা সন্ধ্যার ফিকে জ্যোৎস্নাটাই একটা জাদুর খেলা দেখাচ্ছে একটা গন্‌ঝু মেয়েকে বনবালার রূপ দিয়ে সাজিয়ে একটা মায়াদৃশ্যের ধাঁধা সৃষ্টি করেছে। সকাল হলে, রোদের আলো ঝলমল করে মহুয়াবনের এই অদ্ভুত রকমের মাদক চেহারাটাকে বদলে দেবে, তখন নিশ্চয়ই এই গন্‌ঝু মেয়েটাকেও দেখতে নিতান্ত একটা গন্‌ঝু মেয়ে বলেই বোধ হবে।

সকালবেলা এই সিমারিয়া জঙ্গলের অনেক গল্প বললেন ভাণ্ডারী একনাথবাবু, যিনি এখানে এই কাছারিতে একটানা পাঁচ বছর ধরে আছেন। বললেন ঃ ঠাকুর-সাহেবদের বুদ্ধির প্রশংসা আমি করতে পারি না। বরং এই কথাই বলব যে, এত বড় জমিদার হয়েও তাঁদের বুদ্ধি খুব ভোঁতা। নইলে সিমারিয়ার এত চমৎকার এ এত বড় একটা মহুয়া জঙ্গলকে তাঁরা এত সহজে-পরের হাতে চলে যেতে দিলেন কি করে? চার বছর আগে যখন একদিন শুনলাম যে সিমারিয়ার মহুয়া জঙ্গলটাকে নীলামে বিক্রী করা হবে, তখন আমি অন্তত দশটা চিঠি দিয়ে বড় মেজ সেজ ও ছোট, সব ঠাকুরসাহেবকে কত না অনুরোধ করেছি যে আপনারা কুলডিহার বিধবা রাণী কুসুমজীর সম্পত্তি এই বিরাট মহুয়া জঙ্গলটাকে কিনে নিন। কিন্তু সব অনুরোধ ব্যর্থ হল। তাঁরা কেউই জঙ্গলটাকে কিনতে রাজি হলেন না। আজ আপনিই একবার তাকিয়ে দেখুন আর বলুন··।

সামনের মহুয়া জঙ্গলটার বিস্তার যেন শোভাময় একটা বিরাট বিস্ময়। কিন্তু রামতনু জানে, শালজঙ্গলের এ রকমের বিস্তার চোখেরই একটি ধাঁধার ব্যাপার। চোখে দেখতে যতটা বিরাট বলে মনে হয়, আসলে ততটা নয়। ভাণ্ডারী একনাথ-বাবু বললেন, লম্বাতে আধ মাইল আর চওড়াতে সিকি মাইল এই মহুয়া জঙ্গলের সবটাই মহুয়ার ভীড়ে ভরাট নয়। মাঝে মাঝে ময়নাকাঁটায় আর তেলাকুচায় ছাওয়া বড় বড় ঝাড় আছে, যার মাটি খারাপ নয়, কিন্তু কেউ চাষ করে না বলেই পতিত হয়ে রয়েছে। তা যাই হোক, দুঃখের কথা এই যে মহুয়া জঙ্গলের মহুয়া কারও কোন কাজেই লাগে না।

রামতনু ঃ কেন?

ভাণ্ডারী একনাথবাবু ঃ চাঁদবাবু জঙ্গলটাকে যিনি মাত্র পাঁচহাজার টাকায় বিধবা রাণী কুসুমজাীর কাছ থেকে কিনে নিয়েছেন, তিনি আজ তিন বছর হল কাউকে জঙ্গলে ঢুকতে ও মহুয়া ভাঙতে দেয় না। তিনি বড়ই অদ্ভুত শখ আর মেজাজের মানুষ।...ওই, ওই যে দেখছেন, লাল রঙে রঙীন করা কাঠের একটা বাংলো, যার সামনে টেনিস খেলবার একটা কোর্ট, সেটা চাঁদবাবুর—ধ্যান-নির্বাস। বাড়ির ফটকে শিশুকাঠের চৌকা তক্তার ওপর এই নাম লেখা আছে। মানুষটা চেহারাতে শৌখিন, কথাবার্তায় শৌখিন, হাসিতেও শৌখিন, গানও ভালো গাইতে পারেন। এই সব শখ নিয়েও মানুষটা নিজে একজন তপস্বী ছাড়া আর কিছু নয়। নির্জন নিরিবিলির মধ্যে ধ্যান করতে পারবেন, এই জন্যেই তিনি জঙ্গলটাকে কিনেছেন। তিনি বলেন, জঙ্গলের মহুয়া মানুষ খাবে কেন? না, কভি নেহি! জঙ্গলের ফুল ফল খাবে জঙ্গলেই পশু আর পাখি। এর ফলে আমাদের এই গনুঝু বস্তির মানুষগুলির খুব ক্ষতি হয়েছে তসীলদারজী। গনুঝু মেয়েগুলো, যারা চাঁদবাবুর ওই জঙ্গলে ঢুকে মহুয়া ভাঙত আর সিমারিয়া বাজারে গিয়ে বেচে আসত তারা খুবই কষ্টে পড়েছে। তাদের কাউকে আর ওই জঙ্গলে ঢুকতে দেওয়া হবে না। তাদের একটা ভালো রোজগার বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

রামতনু ঃ আমাদের এই বস্তির মেয়েদের এখন তাহলে কি কোন কাজই নেই?

একনাথবাবু ঃ আছে, শুধু একটি কাজ, আমাদেরই জঙ্গলের বাঁদুরে শাল কেটে লকড়ি করবার কাজ।

এখানে বসেই দেখতে পাওয়া যায়, চাঁদবাবুর ধ্যান-নিবাসের ফটক থেকে পাঁচ ছয়জন লোক বের হয়ে জঙ্গলের ঘেসো পথ ধরে এদিকে এই তসীল কাছারির দিকে এগিয়ে আসছে। গায়ের পোশাক দেখে বোঝা যায় ওরা পুলিশেরই একটা দল। এখান থেকে আধ ক্রোশ দূরে সিমারিয়া বাজার। থানার নামও সিমারিয়া বাজার। ওরা নিশ্চয় সেই থানারই পুলিশ।

আগন্তুক পুলিশদল কড়া বুটজুতোর শব্দ নিয়ে আর হুটপাট করে কাছারি বাড়ির দাওয়ার ওপর উঠে দাঁড়ায়। দুজন কনস্টেবল বেশ জোরে শব্দ করে দাওয়ার মেঝের ওপর লাঠি ঠোকে। দুজন অফিসারের দুজনই মাথার হ্যাট হাতে নিয়ে গোঁফে মোচড় দেয় আর রামতনুর মুখের দিকে দুই জোড়া কড়া চোখের দৃষ্টি তুলে তাকিয়ে থাকে। এদের মধ্যে একজন তো সিমারিয়া বাজার থানার দারোগা, ভাণ্ডারী একনাথ বাবুর কাছে একটি চেনা মুখ। কিন্তু উনি কে? যিনি দুই চোখ একেবারে অপলক করে রামতনুর মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন?

সিমারিয়া বাজার থানায় দারোগা রঘুবাবু বলেন, ইনি পাটনা থেকে এসেছেন, গোয়েন্দা অফিসার সুরেন্দ্রমোহন চ্যাটার্জী।

রঘুবাবু জিজ্ঞাসা করেন, কে এখন এখানকার তসীলদার?

রামতনু ঃ আমি।

গোয়েন্দা অফিসার চ্যাটার্জী বলেন, হ্যাঁ, আমি আগেই বুঝেছি। পরিচয় না বললেও আমি বুঝে ফেলতাম।

রামতনু : কি বুঝে ফেলেছেন ?

চ্যাটার্জী : এখানে আমি আপনার প্রশ্ন শুনতে ও জবাব দিতে আসিনি। এসেছি আপনাকে প্রশ্ন করতে।

রামতনু : প্রশ্ন করুন।

চ্যাটার্জী : আপনি কি শুধু পঁচিশ টাকা মাইনের তসীলদারীর কাজ করে দিন কাটাচ্ছেন, না আরও কোন কাজ করছেন !

রামতনু : না, আর কোন কাজ নয়।

চ্যাটার্জী : আপনি তাহলে পঁচিশ টাকার রোজগারেই খুশি আছেন ?

রামতনু : হ্যাঁ।

চ্যাটার্জী : কিন্তু আপনি তো বেশ ভালো করেই জানেন যে, এ রকম একটা হাভাতে চাকরির চেয়ে গাঁজা-চরস চালান দেবার কাজে অনেক লাভ !

রামতনু : জানি না।

চ্যাটার্জী ধমক দেন, নিশ্চয় জানেন। আপনি তো কলেজে পড়েছেন ?

রামতনু : হ্যাঁ, তাতে কী হয়েছে ?

চ্যাটার্জী : আমি আরও খোঁজ নিয়ে জেনেছি, আপনি বোটানি পড়েছেন।

রামতনু : না আমি বোটানি পড়িনি কিন্তু জিজ্ঞাসা করছি, বোটানি পড়লেই বা কী হত ?

চ্যাটার্জী : প্রশ্ন করবেন না। প্রশ্ন করা আপনার কাজ নয়।⋯ এইবার জবাব দিন, আপনি কি জানেন না যে, গাঁজার আঠা থেকে চরস হয়।

রামতনু : না।

চ্যাটার্জী : বিশ্বাস করলাম না। তবু আপাতত কোন সন্দেহ করে ফেলছি না। যা-ই হোক⋯চলুন দারোগাজী, আমাকে আজই পাটনা ফিরে যেতে হবে।⋯ হ্যাঁ, দেখা হলে আপনি চাঁদবাবুকে আমার নমস্কার জানাবেন। ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার দেখাই হল না, অথচ ওঁরই আতিথ্যের মুরগী-মাংস আর পোলাও পেট ভরে খেয়েছি।

দারোগা রঘুবাবু হাসেন।—তা কী আর করবেন বলুন! চাঁদবাবু প্রতি সোমবার শুধু ধ্যান করেই পার করে দেন। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে এক মুহূর্তের জন্যও তিনি ধ্যান ঘরের বাইরে আসেন না।⋯হ্যাঁ, আপনার নমস্কার তাঁকে আমি কাল না হয় পরশু একবার এসে জানিয়ে দেবই দেব।

॥ দুই ॥

দুপুরের রোদ ঝলমল করছে। সারা রাতের জ্যোৎস্নাতে মায়ার কুহেলিকায় যা-কিছু ছিল, সবই উবে গিয়েছে। এখন ভালুকের শিশুকে যেমন খাঁটি ভালুকের

বাচ্চা বলে আর গন্ঝু মেয়েকে তেমনই নিতান্ত গন্ঝু মেয়েরই মতো দেখাবে। কিন্তু না, সে-রকম তো দেখাচ্ছে না। ভালুকের বাচ্চা কোলে নিয়ে নয়, সেই গন্ঝু মেয়েটা তখন মহুয়া গাছের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আর হাসছে। সকাল-বেলার বাতাসে লেয়েটার মাথার চুল ফুর ফুর করে উড়ছে।

ঠিকই, কবির কল্পনার বাসন্তী বনশোভার মতো, কর্ণে তোমার কৃষ্ণচূড়ার মঞ্জরী! দখিনা বাতাস বইছে, গন্ঝু মেয়েটাকেও যেন বাসন্তী শোভার মতো দেখাচ্ছে। কৃষ্ণচূড়ার ফুল দিয়ে এমনই একটা কায়দা করে খোঁপাটাকে সাজিয়েছে যে, খোঁপার দু'পাশের দুটো ফুলের মঞ্জরী কানের দুটো দুলের মতো ঝুলছে। কোন সন্দেহ নেই, কোন মায়ার আবেশ-টাবেশের প্রলেপ জড়িয়ে নয়, মেয়েটা ওর রক্ত মাংসেরই সহজ গুণে চমৎকার চোখ-নাক-মুখ নিয়ে হাসছে।

গন্ঝু বস্তির সব পুরুষ লকড়ি ভাঙবার জন্য জঙ্গলের ভিতরে গিয়েছে। কিন্তু মেয়েরা কেউ যায়নি। দেখে বরং মনে হয় যে, আজ মেয়েরা যেন দল বেঁধে কোথাও যাবে। সবারই হাতে ঝুড়ি।

রামতনু জিজ্ঞেস করে, মনে হচ্ছে, এরা কোথাও যাবে বলে তৈরি হয়েছে?

ভাণ্ডারী একনাথবাবু জবাব দেন, তাই তো মনে হচ্ছে। বোধহয় সিমারিয়া বাজারে যাবে।

রামতনু: কেন?

ভাণ্ডারীজী, বোধহয় মাটি কাটা কামিনের কাজ করতে।

রামতনু একটু আশ্চর্য হয়ে দেখতে থাকে, খোঁপাতে ও কানের দু'পাশে কৃষ্ণ-চূড়ার মঞ্জরী ঝুলিয়েছে যে মেয়েটা, সেও একটা ঝুড়ি হাতে তুলে নিল।

ভাণ্ডারী একনাথবাবু বেশ গম্ভীর হয়ে বলেন, আমি গত সপ্তাহে সিমারিয়া বাজারের সাহুজীর কাছ থেকে খবর পেয়েছি। পুলিশ আজ তিন বছর ধরে একটা লোককে খুঁজছে, কিন্তু তার পাত্তাই পাচ্ছে না। বোম্বাই পুলিশের মতে সেই লোকটা হল চরসের রাজা। গাঁজা আর চরসের কয়েকটা বড় বড় চোরাই লট বোম্বাইয়ে ধরা পড়েছে। গোয়েন্দা পুলিশের মতে বে-আইনী গাঁজা আর চরসের এইসব লট এদিক থেকেই বোম্বাইয়ে চালান করা হয়েছে।

রামতনু: এদিক থেকে, মানে?

ভাণ্ডারী: এদিক থেকে মানে, ছোটনাগপুরের নানা রেল-স্টেশন থেকে। চরসের রাজা গা-ঢাকা দিয়ে এদিকে ঘুরছেন আর গাঁজা-চরস চালান দিচ্ছেন।

রামতনু: সেই জন্যেই কি—।

ভাণ্ডারীজী হাসেন।—হ্যাঁ, আমার মনে হয়, আপনি চার বছর ধরে এদিকে আছেন, তসীলদার হয়ে এই জঙ্গল থেকে সেই জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, তাই, পাটনার গোয়েন্দা পুলিশ আপনাকে সন্দেহ করছে।

আরও জোরে চেঁচিয়ে হেসে ফেলেন ভাণ্ডারী একনাথবাবু।—আপনি সেজন্য

একটুও ভাবিত হবেন না তসীলদারজী। গোয়েন্দা পুলিশ ইঁদুরকেও সাপ বলে সন্দেহ করে।

রামতনু হাসে।—আরও বলতে পারেন। গোয়েন্দা সাপকেও পুলিশ ইঁদুর বলে সন্দেহ করে।

কিন্তু ও কী? ওরা কারা ব্যস্ত হয়ে এদিকে আসছে! ভাণ্ডারী একনাথবাবু বলেন, তাই তো, চাঁদবাবুর মতো বড়লোক আর শৌখীন মানুষ লোকজন সঙ্গে নিয়ে আর চোর কাঁটায় ঢাকা—পথ মাড়িয়ে এই কুঁড়েঘরের মতো কাছারিঘরের দিকে কেন ছুটে আসছেন?

কপালে তিলক, প্রসন্ন সুস্মিত মূর্তি, চাঁদবাবু শুভেচ্ছার ভঙ্গীতে হাত তুলে কথা বলেন, শান্তি শান্তি শান্তি! আপনিই কি তসীলদার?

রামতনু: হ্যাঁ।

চাঁদবাবু: তবে আপনিই এইসব গনুঝু মেয়েকে একটু বুঝিয়ে বলুন, কেউ যেন মহুয়া ভাঙবার জন্য আমার ওই জঙ্গলের ভিতরে না ঢোকে। ঢুকলে বড়ই বিপদ হবে।

ভাণ্ডারীজী: কিন্তু এদের কেউই তো আপনার জঙ্গলে মহুয়া ভাঙতে যায় না। তিন বছর ধরে ওরা আপনার মহুয়া জঙ্গলে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। আপনার জঙ্গলের দুই গার্ড বল্লম হাতে নিয়ে যেদিন ওদের তাড়া করেছে, তিন বছর আগের সেই দিন থেকে এরা আপনার মহুয়া জঙ্গলে আর কখনো ঢুকতে চায়নি, ঢুকতে যায়নি। তবে কেন আপনি এত চিন্তিত হয়ে ⋯।

চাঁদবাবু হাসেন, শান্তস্বরে বলেন, শান্তি শান্তি! আমি এই খারাপ খবরটা আজই পেয়েছি যে আপনার বস্তির এই সব গনুঝু মেয়ে আজই মহুয়া ভাঙবার জন্য আমার জঙ্গলের ভিতরে ঢুকবে⋯ওই তো, ওই তো, ওরা সত্যিই ঝুড়ি হাতে নিয়ে তৈরি হয়েছে। দেখছেন তো?...দেখুন তসীলদারজী, আমার কাছে হাজার ঝুড়ি মহুয়ারও কোন দাম নেই। ভালুকে না খেয়ে এই গনুঝু মেয়েরাই না হয় ভেঙে নিয়ে গেল। যদিও আমার ধর্ম বিশ্বাসের কথা হল, জঙ্গলের ফল জঙ্গলের পশু-পক্ষীতে খাবে, মানুষ যেন না খায়। কিন্তু নিরীহ স্বভাবের এই সব মেয়েকে যেন ভালুকের অত্যাচারে অপমানিত হতে না হয়। চমকে ওঠে রামতনু, দেখে আশ্চর্য হয়, মিষ্টি চেহারার ওই গনুঝু মেয়েটিই এগিয়ে এসে চাঁদবাবুর মুখের দিকে কটমট্ করে তাকিয়ে বলছে: আমরা আপনার জঙ্গলের গার্ডদের বল্লমকে ভয় করব না, বাবুজী। আপনার কোন নিষেধ মানব। আমরা জঙ্গলে ঢুকব আর মহুয়া ভাঙব।

চাঁদবাবুও আশ্চর্য হয়ে মেয়েটার মুখের দিকে অপলক চোখ তুলে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকেন, তারপর কথা বলেন, তুমি কে গো?

মেয়েটা বলে আমি কেউ না।

চাঁদবাবু: শান্তি শান্তি শান্তি। তুমি শান্ত হও, হামারা বাত মানো। মহুয়া

জঙ্গলে কখখনো ঢুকবে না। জঙ্গলের ভিতরে একটা পাপী ভালুক সব সময় ঘুরে বেড়াচ্ছে, যার সবচেয়ে ভয়ানক পাপ এই যে...

কথা বলতে গিয়ে থেমে গেলেন চাঁদবাবু। তাঁর জঙ্গলের গার্ডদের দিকে তাকিয়ে বলেন, আমি যাচ্ছি। তোমরা সবাই মিলে এই তসীলদারজী, এই ভাণ্ডারীজী, আর এই সব গনঝু মেয়েকে জানিয়ে দাও, পাপী ভালুকের ব্যাপারটা শুনিয়ে দাও।

চলে গেলেন চাঁদবাবুর জঙ্গলের দুই গার্ড আর বাড়ির দুই চাকর যে-কথা এইবার চেঁচিয়ে বলতে থাকে—সে-কথা অদ্ভুত এক প্রবৃত্তির উত্তাপে উন্মত্ত একটা পশুর কথা। এই ভালুকের কাছে মানুষের ঘরের মেয়েরাই হল তার লালসার খাদ্য। কোন মেয়ের ধর্ম এই ধর্ষক পশুটার কাছে নিরাপদ নয়। কোন নারীকে জঙ্গলের ভিতরে দেখতে পেলেই ভালুকটা তেড়ে এসে সে নারীকে জড়িয়ে ধরে আর সে-কথা মুখ খুলে বলতে যেমন লজ্জা করে তেমনই দুঃখও হয় তসীলদারজী, এই পর্যন্ত তিন নারীর সত্তানাশ করেছে এই ভালুক। আমরা তিন মাস ধরে ওকে গুলি করে মেরে ফেলবার চেষ্টা করছি।

ভ্রূকুটি করে গার্ডদের দিকে তাকায় রামতনু।—আপনারা যান।

গার্ডরা চলে যাবার পর ভাণ্ডারীজী খুব আস্তে, গলার স্বর খুব নামিয়ে কথা বলেন।—কিন্তু আপনি এটা একেবারে অবিশ্বাস করবেন না তসীলদারজী। আমি এর আগেও তিন-চারটে জঙ্গল গাঁয়ের মানুষকে ভালুকের সম্বন্ধে এই অভিযোগ করতে শুনেছি। এই রকম স্বভাবের একটা দুটো ভালুকের ভাঙতে ভয়ে মেয়েরা কেউ কাঠ অথবা শুকনো গাছের ঝুরি কুড়োতে জঙ্গলের ভিতরে যেত না।

কাছারিবাড়িতে ফিরে এসে রামতনু তার গলার স্বরে খুব রাগ চড়িয়ে কথা বলে, আপনি এ সব গাঁজাখুরী গল্পের কথা বিশ্বাস করবেন না ভাণ্ডারীজী। ওই রকমের পাপ ভালুকে করে না, কোন পশুই করে না, মানুষে করে।

ভাণ্ডারী: বাত তো ঠিক হ্যায়; লেকিন···

রামতনু চেঁচিয়ে ওঠে, না, এর মধ্যে লেকিন-ফেকিন কিছু নেই। তবে হ্যাঁ, আমি চাই না যে আমাদের বস্তির কোন মেয়ে অন্যের জঙ্গলে ঢুকে মহুয়া ভাঙুক।

॥ তিন ॥

মনে পড়ে রামতনুর সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের লেখার মধ্যে একটা চমৎকার মন্তব্য আছে: বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মায়ের কোলে। এখানে বন্য বলতে ঠিক কী বুঝেছেন সঞ্জীববাবু, সেটা ঠিক বোঝা যায় না। বনেতে বন্য প্রাণীরা অবশ্যই সুন্দর, বন্য মানুষেরাও সুন্দর। কিন্তু বনের কোন বস্তির কিংবা কোন জংলী জাতের কেউই কি বনের বাইরেও সুন্দর নয়?

একদিন সাহুজীর কাছে টাকা জমা দিয়ে হুণ্ডি করিয়ে নেবার জন্য সিমারিয়া

যাবার পথের একটি জায়গাতে এসে থমকে দাঁড়ায় রামতনু। দেখে আশ্চর্য হয়. পথের পাশে মাঠের ওপর একটা ইঁটখোলার কাছে ঝুড়ি হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সেই গন্ঝু মেয়েটা। খোঁপাতে ও কানেতে কৃষ্ণচূড়ার মঞ্জরী নেই, নিকটে কোন মহুয়া গাছের ছায়াও নেই। খোলা রোদের তাপে খোলা মাঠটা পুড়ছে। কিন্তু গন্ঝু মেয়েটাকে তো চমৎকার এক রূপসী বলেই মনে হচ্ছে। ওর কপালের বড় বড় ঘামের ফোঁটা যেন মায়ামধুর রূপেরই একটা নরম আবেশের বড় বড় ফোঁটা।

রামতনু ডাক দিয়ে বলে, তুমি এখানে কী কাজ করছ?

মেয়েটা বলে, গরুর গাড়িতে ইঁট তুলে দেবার কাজ করি।···কিন্তু আজ করব না।···ওই ভক্তজী চাঁদবাবুর কোন মানা আর শুনব না। আমরা ওর জঙ্গলে ঢুকব আর মহুয়া ভাঙব। ভালুকের গল্পটাকে আমরা কেউই এখন আর ভয় করি না। ঝুট, একেবারে ঝুট একটা গল্প।

পাপী ভালুকের গল্পটা যে বস্তির সব মেয়েকে খুবই ভয় পাইয়ে দিয়েছে, সেটা চোখেই দেখে বুঝতে পেরেছিল রামতনু। দিন দশ ধরে বস্তির মেয়েদের একটা জটলার চিৎকার শুনেছে রামতনু। সবাই ধমক দিয়ে কাকে যেন বলছে, না না, তোর কথায় আমরা মরতে যেতে পারব না। মহুয়া কুড়োতে ও ভাঙতে জঙ্গলের ভিতরে কখখনো যাব না। পাপী ভালুকটার কাছে মান খোয়াবার ভয় থাকতে কেন আমরা জঙ্গলে ঢুকব? তুই বললেই কি বিশ্বাস করতে হবে যে, কোন ভয় নেই, ও রকম খারাপ স্বভাবের কোন ভালুক থাকতে পারে না? চুপ কর তুই, তুই আর বাজে কথা বলিস না।

ওই চেঁচামেচির ভীরু প্রাণের ভয়টা কি এরই মধ্যে ঘুচে গিয়েছে? আর এই মেয়েটাই কি নতুন সাহসের নেত্রী হয়েছে?

আর, চাঁদাবাবুর কানে কি খবরটি এরই মধ্যে পেঁৗছে গিয়েছে? সন্ধ্যাবেলা তসীল কাছারিতে ফিরে এসেই শুনতে পায় রামতনু—চাঁদবাবুর জঙ্গলের দুই গার্ড এসে সব মেয়েকে ভয় দেখিয়ে গিয়েছে, অনেক মানা করে গিয়েছে। —না, তোমরা কখখনো জঙ্গলের ভিতরে যেও না। ভালুকটা তো আছেই, তার ওপর আরও একটা ভয় দেখা দিয়েছে। একটা প্রকাণ্ড ময়াল সাপ ওই জঙ্গলের ভিতরে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর খরগোশ গিলছে। যদি খরগোশ ছেড়ে দিয়ে ময়ালটা তোমাদের কাউকে জড়িয়ে ধরে তবে কী হবে বল?

ভাণ্ডারীজী বলেন, ওই মেয়েটা চাঁদাবাবুর দুই গার্ডকে ধমক দিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছে—যা যা, তোরা ভাগ এখান থেকে। তোমাদের কোন কথা বিশ্বাস করি না। সকাল হতেই আমরা সবাই তোমাদের জঙ্গলে ঢুকব।

বৃষ্টি। সারারাত ধরে এই বৃষ্টি চলবে বলে মনে হয়। মাঝরাতের কিছু আগে থেকেই বৃষ্টিটা শুরু হয়েছে। ছোট্ট সিমারিয়া বস্তি আর ছোট্ট তসীল

কাছারির সব শব্দ যেন এই ঘোর বৃষ্টির ঘোর শব্দের চাপে বোবা হয়ে গিয়েছে। কিছুই শোনা যায় না। পাশের ঘরে বসে ভজন গাইছেন ভাণ্ডারী একনাথবাবু। কিন্তু সেই ভজনের সামান্য সাড়াশব্দও রামতনুর কানে পৌঁছয় না।

ভোরবেলা বৃষ্টি থেমে যাবার পর শুনতে পাওয়া গেল, গনঝু বস্তির কোন একটা ঘরে একটা মেয়েলী কান্নার শব্দ মাঝে মাঝে উতলা হয়ে বেজে উঠছে। আর ভয়ানক একটা জল্লাদ শব্দ যেন সেই কান্নাটাকে ঘিরে ধরেছে।

উদ্বিগ্ন রামতনু আর সন্দিগ্ধ ভাণ্ডারীজী কাছারির পাঁচ সিপাহীকে সঙ্গে নিয়ে বস্তির দিকে ছুটে যান। কী হয়েছে, কিছুই ধারণা করতে পারা যাচ্ছে না। বস্তির ভিতরে কি ক্ষ্যাপা শেয়াল ঢুকে কাউকে কামড়ে দিয়েছে?

একটা ঘরের কাছে এসে ভিতরে উঁকি দিয়ে দেখতে পায় রামতনু, সত্যিই তো, সেই সাহসী মেয়েটা, দেখতে বনবালার মতো রূপসী সেই মেয়েটাই কাঁদছে। বস্তির পুরুষ আর নারীদের সবারই চিৎকারে এক দুর্ভাগ্যের সংবাদ মত্ত হয়ে বাজছে। সর্বনাশ করেছে। ভয়ানক ভালুক রাত্রিবেলা এই ঘরে ঢুকে মেয়েটার সত্তা নষ্ট করে দিয়ে পালিয়েছে।

গনঝু ছেলেদের হাতে তীর-ধনুক দুলছে। ওদের গলা থেকে একটা রাগের হুংকার ফেটে পড়ছে, ওই পাপী ভালুককে আমরা আজ খুঁজে বের করব আর বিঁধে মারবই মারব।

ঘরের ভিতরে ঢুকে মেয়েটাকে কান্না থামাতে বলে রামতনু। প্রশ্ন করে, কি হয়েছে, সব কথা ঠিক ঠিক বল।

মেয়েটা কান্না থামিয়ে আর দুটো চোখ মুছে নিয়ে বলতে থাকে না বাবুজী, আমাকে খারাপ করে দিতে পারেনি ভালুকটা। আঁচড় দিয়ে আমার গা ছিঁড়ে দিয়েছে· দুই হাতের থাবলা দিয়ে আমার চুল ধরেছে আর ছিঁড়েছে। আমার বুকে কামড় বসিয়েছে। তবু পারেনি। আমি ওর পেটে লাথি মেরে ওকে আমার গায়ের ওপর থেকে নামিয়ে দিয়েছি। আমি ওর বুকে দাঁত বসিয়ে দিয়েছি। আমিও খিমচে দিয়ে ওর গায়ের চামড়া ছিঁড়ে দিয়েছি।

সত্যিই, ঘরের মেঝের ওপর পাপী ভালুকের গায়ের ছেঁড়া চামড়ার কয়েকটা টুকরো ছড়িয়ে পড়েছিল। সেই টুকরোগুলিকে হাতে তুলে নিয়ে সবাইকে দেখায় রামতনু, এই দেখে, সবাই দেখ নাও।

ভাণ্ডারীজী আশ্চর্য হয়ে বলেন, এ কি, এগুলি তো কালো কম্বলের কয়েকটা ছেঁড়া টুকরো।

রামতনু বলে, হ্যাঁ, এ এক অদ্ভুত ভালুক, কালো কম্বলে সারা শরীর জড়িয়ে নিয়ে কু-মতলব হাসিল করবার জন্য এই মেয়ের ঘরে ঢুকেছিল।

গনঝু ছেলের দল আবার হল্লা করে আর হাতের তীর-ধনুক দোলাতে থাকে। ওটাকে বিঁধে মারব। বিঁধে মারব।

রামতনু : তোমরা শান্ত হও, চুপ কর। তোমাদের ও সব কিছুই করতে হ না, যা করবার সব আমিই করব।

তসীল কাছারির দুই সেপাইকে তখুনি থানাতে খবর দেবার জন্য রওনা করিয়ে দেয় রামতনু—যা দেখলে আর যা শুনলে তার সবই দারোগাজীকে জানিয়ে এখনি ফিরে আসবে। দেরি করবে না।

তীরবাজ গনুঝু ছেলেগুলি শান্ত হতে গিয়েও চেঁচামিচি করে—কতক্ষণ, এ তসীলদারজী—আর কতক্ষণ আমরা চুপ করে থাকব, বলুন।

চোরকাঁটা ঘাসে ঢাকা জংলী রাস্তাটার দিকে তাকিয়ে কথা বলে রামতনু, না, আর বেশিক্ষণ নয়।

দেখতে পেয়েছে রামতনু, ধ্যান-নিবাসের সেই শান্ত শিষ্ট ও প্রসন্ন চাঁদবাবু এগিয়ে আসছেন। শান্তি শান্তি শান্তি।

ঘরের দরজার কাছে এসেই চাঁদবাবু বলে উঠলেন, আমার সন্দেহ হচ্ছে সেই পাপী ভালুকটাই এসে মেয়েটার সর্বনাশ করে দিয়ে গিয়েছে। হায় হায়, কবে যে এই ভয়ানক ভালুকটা আমার জঙ্গল ছেড়ে চলে যাবে, ভগবান জানেন। শান্তি শান্তি শান্তি।

হঠাৎ একটা লাফ দিয়ে এগিয়ে যেয়ে চাঁদবাবুর মাথার চুল খিমচে ধরে চেঁচিয়ে ওঠে রামতনু. ভালুক নয়, এই পাপীটাই কম্বল গায়ে জড়িয়ে ভালুক সেজে এই ঘরে ঢুকেছিল।···ভাণ্ডারীজী, আপনি এই পাপীর কামিজের সব বোতাম খুলে দেখুন তো।

তাই করেন ভাণ্ডারীজী। সবাই দেখতে পায়, চাঁদবাবুর বুকের ওপর দাঁতের তিন চারটে হিংস্র কামড়ের দাগ তখনও শুকনো রক্তের ছোঁয়ায় ভিজে রয়েছে।

খিলখিল করে হেসে ওঠে গনুঝু মেয়েটা।—আরও ভালো করে সবাই দেখে নাও, এই পাপীর কানের একটা মাকড়ি নেই। সেটা আমারই হাতের মুঠোর মধ্যে রয়েছে। পাপীর মাথাটাকে খিমচে ধরেছিলাম, তাই একটা মাকড়ি আমারই হাতের মুঠোর মধ্যে এসে পড়েছে।

একটা লাথি মেরে চাঁদবাবুকে মাটির ওপর একেবারে শুইয়ে দেয় রামতনু। —ইনি তো শুধু একটা পাপী ভালুক নন, ইনিই হলেন চরসের রাজা, বোম্বাই পুলিশ যাকে সাত-আট বছর ধরে খুঁজছে। ধৈর্য ধরে আর একটু অপেক্ষা কর সবাই। আমি আমার দুই সেপাইকে গোয়েন্দা করে ওই মহুয়া জঙ্গলের ভিতরে খোঁজ নিতে পাঠিয়েছি। মনে হয় ওরা এখনই এসে পড়বে।

দুই টাট্টু ঘোড়ার পিঠে গাঁজা গাছের দুটো বিরাট চেহারার বোঝা নিয়ে দুই সেপাই ফিরে আসতেই আবার হল্লা শুরু হয়। সবাই আশ্চর্য হয়ে দেখতে থাকে টাটকা গাঁজার কাটা কাটা গাছ, তার গায়ের খাঁজের মধ্যে আঠা শুকিয়ে গিয়ে চরস হয়ে রয়েছে। সেপাই দুটো হাঁফ ছাড়ে, আর কথা বলে, একটা দুটো কাঠা নয়

হুজুর ; জঙ্গলের ভিতর বিঘার পর বিঘা জমিতে গাঁজার চাষ করেছেন ইনি, এই ভক্তজী চাঁদবাবু। পুলিশকে বলবেন হুজুর ; সব গাঁজার গাছ তুলে নিয়ে আসতে দশটা গরুর গাড়ি দরকার হবে।

বস্তির সব মানুষ এইবার স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়ে আর একটা খুশির হুকুম স্থানে কথা বলাবলি করে, চরসের রাজা। চরসের রাজা।

একটা মস্ত বড় টিয়ার ঝাঁক কলরব করে উড়ে গেল। গনুয়া মেয়েটা আবার খিলখিল করে হেসে ওঠে, যার কোলে এখন কোন ঋক্ষশিশু নেই, মুখের ওপর অল্প জ্যোৎস্নার প্রলেপ নেই, আর দুই কানেতে কৃষ্ণচূড়ার কোন মঞ্জরীও নেই। তবু ওকে একজন রূপসী বনবালা বলেই তো মনে হয়।

রামতনু বলে, বাঃ সবাই দেখ, সিমারিয়া বাজার থানার দারোগা রঘুবাবু আসছেন, বন্দুক হাতে নিয়ে দুজন কনস্টেবলও আসছেন।

একজন দ্বিতীয় জনমেজয়

এই সেই ভয়ানক বিখ্যাত জঙ্গল, যার নাম দানুয়া-ভালুয়া। হাজারিবাগ জেলার উত্তরে সীমা ছাড়িয়ে গয়া জেলার দক্ষিণের চার-পাঁচটে মৌজার সব ঠাঁই জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে এই জঙ্গল। শাল সেগুন গাম্ভার ও গয়সার, মাঝে-মাঝে মস্ত ঢ্যাঙা এক-একটা পাকুড় আর দেওদার ; এই দানুয়া-ভালুয়ার যত গাছের ছায়ার মধ্যেও যেন একটা ছমছমে ভয়ের আবেশ আছে। অনেকদিন আগে গল্প শুনেছিল রামতমু, দানুয়া-ভালুয়া জঙ্গলের কোথাও জলস্রোতের এমন কোন নালা নেই, যার কিনারাতে কাদা কিংবা বালুর উপর বাঘের পায়ের দাগ গিজ গিজ করে না।

এ হেন এক জঙ্গলের ভিতরে যে মৌজাটা, ঠাকুর সাহেবদের এস্টেটের বড় রকম আয়ের একটা সম্পত্তি, সেটার নাম সিমারিয়া। এস্টেটের ম্যানেজার ত্রিভুবনবাবুর কাছ থেকে হুকুমের চিঠি আসতেই আর দেরি করে নি রামতনু, সেই ছোকরা তসীলদার রামতনু। সিমারিয়া মৌজার কিষাণদের অবস্থা এ-বছর বেশ ভাল হয়েছে, বেশ ভাল ফসল পেয়েছে ওরা সুতরাং বেশ ভাল করে খাজনা তসীল করতে হবে।

দানুয়া-ভালুয়া জঙ্গলের ভয়াল পরিচয় রামতনুর কাছে মোটেই ভয়াল নয়। বদলির হুকুমের চিঠি পেয়ে বরং একটু খুশিই হয়েছিল রামতনু। কিন্তু সিমারিয়াতে তসীল কাছারির ছোট ঘরে এসে ঠাঁই নেবার পর প্রথম রাত্রিতেই ঘুমোতে না পেরে ছটফট করতে হয়েছে। যাত্রীবাহী রাঁচি-গয়া মোটেরবাস, আর মালবাহী মোটরলরির ছুটন্ত হর্নের আওয়াজ কানে আসছে। কারণ, বড় সড়কটা বেশী দূরে নয়,। তার উপর, সিমারিয়ার চোহারাটা একটুও জংলী নয়, যদিও নিদারুণ একটা জঙ্গলরাজ্যের মধ্যেই তার ঠাঁই। তিন সিন্ধী কারবারী এখানে থেকে ফেলয়ার আর কেওলিন চালান দেবার কাজ করেন। তাদের হাতীর গলার ঘণ্টা সব সময় ঢং ঢং করে বাজছে। গয়ার বাজারের দুই মহাজনের আড়ত আছে এখানে, সিমারিয়ার সব মটর ছোলা আর অড়হর এই আড়তের মারফৎ গয়াতে চালান যায়। দেখে একটু আশ্চর্য হয়েছে রামতনু, এখানে একটি মাটির বাড়িতে এক বাঙালী দম্পতি থাকেন। আরও অস্বস্তির ব্যাপার, স্বামী ভদ্রলোক এসে নেমন্তন্ন করে গেলেন।—কাল সকালবেলা আমার ওখানে গিয়ে একটু চা আর এই সামান্য কিছু বাঙালী-খাবার খেয়ে আসবেন। তাছাড়া, খাওয়াদাওয়ার কোন অসুবিধে হলে আমাকে বলবেন। আমি আমার যথাসাধ্য সাহায্য করব। বাঙালীকে বাঙালী না রাখিলে কে রাখিবে, কথাটা তো মিথ্যে নয়। হ্যাঁ কি না, বলুন ?

নেমন্তন্ন করে চলে যাবার সময় ভদ্রলোক তাঁর নাম-ধাম ও কাজের পরিচয় সংক্ষেপে শুনিয়ে দিয়ে গেলেন।—আমি এখানে পুরো এক বছর ধরে কাজ করছি। আমার নিজের ব্যবসার কাজ। জঙ্গলের নানা জায়গা থেকে নানা রকমের ড্রাগ, নানা রকমের ঔষুধের গাছ-গাছড়ার শিকড় পাতা ফুল ছাল সবই যোগাড় করি আর কলকাতাতে চালান দিই। কাজে কষ্ট আছে বটে, তবে ইয়েটা, মানে লাভটা মন্দ নয়। একমণ কণ্টিকারী যোগাড় করতে চার-আনা খরচ হয়, আর বিক্রী করে পাই তিন টাকা। হ্যাঁ, আমার নাম মধুসূদন ঘোষ, কুষ্ঠিয়ার শ্যামনগরের ঘোষ। আর একটা কথা, তুমি যখন বয়সে আমার চেয়ে যথেষ্ট ছোট, তখন আমি নিশ্চয় তোমার মধুদা। তাই না?

মধুদার কথাগুলি শুনতে খুব খারাপ না লাগলেও তেমন-কিছু উৎফুল্ল হয় না রামতনু। কিন্তু সকালবেলা মধুদার বাড়িতে চা খেতে এসেই রামতনুর মনটা অপ্রসন্ন হয়ে যায়। যাঁকে দেখে রামতনুর দুই চোখের দৃষ্টিতে একটা অস্বস্তিকর সন্দেহের ছায়া নিবিড় হয়ে ওঠে তিনি একজন সন্ন্যাসী। গলাতে সোনার চেনের সঙ্গে একটা রুদ্রাক্ষ ঝুলছে, গেরুয়া বসনের বেশ পরিপাটি সাজ, মাথায় চারটে বড়-বড় জটের বাবরী, পায়ে হরিণ-ছালের চটি; সন্ন্যাসী মানুষটা রামতনুর মুখের দিকে তাকিয়ে যে-ভাবে হাসেন, সেই ভাবটা রামতনুর দুই চোখের সন্দেহ আরও ঘনিয়ে তোলে। রামতনুকে দেখে বেশ বিরক্ত হয়েছেন, তবু হাসতে চেষ্টা করছেন সন্ন্যাসী, যাঁর নামটাকেও বেশ চটুল ভাষার একটা কারসাজি বলে সন্দেহ করতে হয়! সন্ন্যাসীর নাম, হাসু ঠাকুর।

কেন? এ রকমের একটা অদ্ভুত নাম কেন?

রামতনুর প্রশ্নের কথা শুনে হেসে উঠলেন সন্ন্যাসী।—বাবু মশাই গো, আমি হলাম একজন সদাহাস্য মানুষ। তার মানে; সব সময় হাসি। দেখতেই তো পাচ্ছেন।

মধুদা বললেন, ঠাকুরের মুখে সব সময় হাসি, তিনি ভয়ের কথা, দুঃখের কথা, মরণ-মারণের কথা, দুর্ভিক্ষ বন্যা ভূমিকম্পের কথা শুনলেও হাসেন।

রামতনু কেন?

মধুদা—সেটা ঠাকুরই জানেন।

এইবার ঠাকুর অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে হাসতে থাকেন, খুব লজ্জিত ও খুব বিনম্র হাসি।

মধুদার স্ত্রী বলেন—আর একটা কথা শুনলে আপনি চমকে উঠবেন কিন্তু বুঝতে পারবেন, হাসু ঠাকুর সামান্য ঠাকুর নন। ঠাকুর একদিন ওই জবা গাছটার দিকে তাকিয়ে ছিলেন, কিন্তু হাসেন নি। এর পর কী হয়েছিল, শুনবেন কি?

—হ্যাঁ।

—জবা গাছে সে মাসে একটিও ফুলে ফোটে নি।

সন্ন্যাসী হাসু ঠাকুর আরও লজ্জিত হয়ে হাসেন।—কী যে বলে মনোরমা! শুনে সত্যিই আমার বেশ লজ্জা করছে।

মনোরমা বলে—আচ্ছা, আমার ছোড়দার সঙ্গে এক-কলেজে পড়তেন একজন রামতনু। আপনি কি সেই···

রামতনু—আপনার ছোড়দার নাম?

মনোরমা—সামন্ত দত্ত।

রামতনু—হ্যাঁ সামন্ত আর আমি এক-কলেজে পড়তাম।

মনোরমা উৎফুল্ল হয়ে হাসে।—বাঃ, তবে তো আপনিও আমার দাদা।

সন্ন্যাসী হাসু ঠাকুরের মুখের হাসি হঠাৎ যেন একটু মিইয়ে যায়।—আহা, তুমি সেজন্য এত দুঃখ করছ কেন মনোরমা? উনি বাইরে থেকে এসেছেন, বাইরেই থাকবেন। বার বার এখানে এসে তেমার ঝঞ্ঝাট বাড়াবেন না। তোমার দাদা হবার জন্য রামতনুবাবুর কোন গরজ নেই।

মধুদা বলেন।—ঠাকুরকে কত অনুরোধ করছি, যাবেন না, যাবেন না, এখানে থাকুন, চিরকাল থাকুন। কিন্তু ঠাকুর বলছেন, না, আর বেশীদিন এখানে তিনি থাকবেন না। দিন বুঝে সর্পযজ্ঞটা সেরে দিয়েই চলে যাবেন।

রামতনুর দুই চোখে এইবার বেশ শক্ত একটা ভ্রূকুটি ফুটে ওঠে।—সর্পযজ্ঞ মানে কী?

হাসু ঠাকুর চেঁচিয়ে হাসেন—জনমেজয় যেমন সব সাপ ধ্বংস করেছিল, আমিও তেমনই এই বাড়িটার সাপের ভয় একেবারে ধ্বংস করে দিয়ে তারপর চলে যাব।

ঠিক কথা, সাপের ভয় এই বাড়িটার শান্তি ও স্বস্তির একটা অভিশাপ। মধুদা বললেন—পৃথিবীতে যে এত রকমের সাপ আছে, এটা আমার জানা ছিল না। দিনরাত সব সময় অদ্ভুত রকমের নানা জাতের সাপ বাড়ির চারদিকে ঘুরে বেড়াত। ঠাকুর আসবার পর তিনবার তিনটে ছোট যজ্ঞ করে অনেক সাপ তাড়িয়েছেন। কিন্তু এখনও অনেক সাপ আছে। বিপদের ভয় কাটেনি। সবচেয়ে বড় ভয় এই যে, একটা অদ্ভুত রকমের চেহারার গোখরো সাপ প্রায়ই বাড়ির ভিতরে ঢুকে পড়ে, খাটের তলায় কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে থাকে। মেঝের উপর শীতলপাটি পাতা থাকলে, সাপটা এসে তার উপর শরীর এলিয়ে দেয়। চেঁচালে সরে যায় না, লাঠি ঠুকলেও নড়ে না। এ এক ভয়ানক দুঃসাহসী সাপ। ওর গায়ের ওপর গরম জল ছিটিয়ে দিতে ইচ্ছে করে, কিন্তু সাহস হয় না। মনোরমার ভয় সবচেয়ে বেশি। সাপটাকে দেখলেই মনোরমা যেন কাঠ হয়ে যায়। মাঝে-মাঝে সাপটাকে দিন পাঁচ-সাত দেখতে না পেয়ে ভাবে, আর বুঝি আসবে না। কিন্তু বৃথা আশা। সাপটা ঠিক আবার এসে ঘরের ভিতরে ঢুকবে।

মনোরমা বলে—ব্রতকথার গল্প পড়েছি, এক ছোট বউয়ের আট ভাই ছিল ঃ

ঢোঁড়া ঘোড়া চিতি আর পঁয়ে,৺খুরেসে চেতুয়া কেলে আর হেলে। কিন্তু গপ্প শুনে তো একটুও ভয় পাইনি। মনে হত, সত্যিই তো ছোট বউয়ের কত মজার-মজার আটটি সাপ ভাই। কিন্তু এখানে আসবার পর ভয়ে-ভয়ে সব সময় প্রাণটা যেন থর থর করছে। দেখলাম, ছোট বউয়ের আট ভাই নয়, বিশ-পঁচিশ রকমের ভাই এই বাড়ির চারদিকের জায়গাতে আনাগোনা করছে। এর মধ্যে সব চেয়ে ভয়ানক হল···

মধুদা—হ্যাঁ, ওই গোখরোটা। লোকে বলে, এটা হল একটা সন্ন্যেসী গোখরো। ওটার বয়স নাকি একশো বছর। সিমারিয়ার এক বুড়ো মাহাতো নাকি ছেলেবেলাতে এই সন্ন্যেসী গোখরোটাকে দেখেছিল। তবেই বুঝুন, বয়সের হিসাবে কত বুড়ো হয়েছে গোখরোটা। একদিন আপনিও দেখুন, তবেই বুঝবেন, ঠাকুর ছাড়া আমাদের জীবনের নির্ভাবনার কোন উপায়ই নেই। ওই সন্ন্যেসী গোখরোর একটি ছোবল খেলে সিন্ধী বাবুদের পোষা হাতিটাও এক মিনিটে মরে যাবে।

॥ দুই ॥

মধুদা আর মনোরমা যে বাড়িতে থাকেন, সেটা আজ সামান্য সাধারণ একটা মাটির বাড়ি বটে, কিন্তু অতীতে একদিন ওখানেই এক রাজপুত জমিদারের বিরাট বাড়ি ছিল। সে বাড়ির শেষ চিহ্ন কবেই ভূমিসাৎ হয়ে গিয়েছে, শুধু থেকে গিয়েছে কাঁচা ইঁটের বড় বড় কয়েকটা স্তূপ। সিপাহীদের সেই মিউটিনির দিনে সিমারিয়ার জমিদার কিশোর সিং-ও বিদ্রোহী হয়ে চৌপারন বাজারে ইংরেজের এক মিলিটারী চৌকির কাপ্তেন সাহেবকে গুলি করে মেরেছিল। তারপর একদিন প্রতিশোধ তুলতে আর একজন ইংরেজ কাপ্তেন সদলবলে এসে সিমারিয়ার কিশোর সিং ও তাঁর ছয় ভাইকে এবং দুই বুড়ো খুড়োকে যে বটগাছের ডালে ঝুলিয়ে ফাঁসির শাস্তি দিয়েছিল, সেই বট আজও আছে। জটার ঝুরিতে ভরা সেই বুড়ো বটের ছায়া আর ইংরেজের তোপ গর্জন করে কিশোর সিংয়ের যে বাড়িটাকে গুঁড়িয়ে দিয়েছিল, তার পচা-গলা কাঁচা ইঁটের ঢিবিগুলি নাকি সন্ন্যেসী গোখরোটার সবচেয়ে পছন্দের আশ্রয়। কেউ এখানে এসে ঘণ্টা তিন-চার অপেক্ষা করলেই দেখতে পাবে, গোখরোটা হঠাৎ কোথা থেকে এসে এখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে, যেন একটা ঠাণ্ডা সুখের বুকের উপর গড়াচ্ছে।

তিন গাঁয়ের তসীল সেরে নিয়ে সিমারিয়ার কাছারিবাড়িতে ফিরে আসবার সময় একদিন ঘোড়া থামিয়ে বুড়ো বটের কাছে আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করতেই দেখতে পেল রামতনু, সত্যিই অদ্ভুত চেহারার একটা গোখরো। মাথার দু'পাশের আঁস ফেঁপে উঠেছে। দেখে মনে হয় যেন দুটো শিং। গোখরোটার গলাতে

খোঁচা-খোঁচ কাঁটার মত একসারি রোঁয়া। ছবি তুললে ঠিক মনে হবে, যেন একটি ছোট জাতের ড্রাগন। কিন্তু শুধু এই একটা ড্রাগন ধরনের চেহারাওয়ালা গোখরোর নাম কি সন্ন্যেসী গোখরো ? না, এটা গোখরোর একটা জাতের নাম ? এরকম চেহারার গোখরো কী এখানে আর নেই ? সত্যি. কী চমৎকার চোহারার গোখরো !

বুড়ো মাহাতো বলেছে ঃ কে জানে, ঠিক মনে পড়ছে না, ঠিক এই রকম চেহারার দ্বিতীয় কোন গোখরো কখনও চোখে পড়েছে কি না।

সিন্ধী বাবুরা বলেন—এই রকম লালচে রংয়ের গোখরো সাপ আমাদের দেশে দেখা যায়। আমাদের দেশেও এই জাতের গোখরো সাপের নাম সন্ন্যাসী সাপ।

বুড়ো মাহাতো বলেছে ঃ যা-ই বলুন, আমি বিশ্বাস করি, এই সন্ন্যাসী গোখরো হলো সেই সেদিনের সাপ, সে আজও বেঁচে থেকে মিউটিনির দলপতি ও ইংরেজের দুশমন সেই কিশোর সিংয়ের ভিঠে পাহারা দিচ্ছে। এরকম সাপকে আমরা বলি ঘরবাবা, বাঙালী লোক বোলতা হ্যায়, বাস্তুবাবা।

হাসু ঠাকুর একদিন খুব রাগ করে হাসতে ভুলে গিয়ে আর চোখ পাকিয়ে মনোরমাকে শাসিয়ে দিলেন—খবরদার, সাপটাকে কখনও বাবা-টাবা বলে মনে করবে না। যাকে দেখে এত ভয় পাও, তাকে আবার বাবা বলা কেন ? হ্যাঁ, রাত-বেরাতে যদি গোখরোটার কথা ভেবে কিংবা গোখরোটাকে দেখতে পেয়ে ভয় পাও, তবে তখুনি আমার ঘরে চলে আসবে। আমি তোমাকে সেই মুহূর্তে এক মন্তরের জোরে নির্ভয় করে দেব।

মধুবাবু বলেছেন, ঠিক কথা, ঠিক কথা। ঠাকুর থাকতে আমার-তোমার কারও ভয় নেই, মনোরমা।

আরও দু-চার বার মধুদার এই বাড়িতে এসে চা খেতে হয়েছে। শুনতে বেশ ভালই লাগে, মনোরমার কথাবার্তার মধ্যে চমৎকার একটা অকপট মনের রূপ এবং ভাব আছে। মনোরমা বলে ঃ সত্যি বলছি রামতনুদা, আমাদের ঠাকুরের কাছে গিয়ে একবার বসলেই নির্ভয় হয়ে যাব, কোন ভুল নেই। তবু, সন্ন্যেসী গোখরোটা যখন ঘরে ঢোকে তখন ভয় পেয়ে আপনার দাদার হাতটাকেই জাপ্‌টে ধরি। দৌড়ে গিয়ে ঠাকুরের ঘরে ঢুকতে পারি না। বেশ লজ্জা করে। ইচ্ছেও করে না। মরি তো স্বামীর হাত ধরেই মরব। ঠিক কি না, রামতনুদা ?

মধুদা বলেন—ঠিক, সবই ঠিক, তবে ঠাকুরের চেয়ে বড় কে এমন আছেন যে, তোমাকে সব বিপদের ভয় থেকে রক্ষা করতে পারেন ?

পাশের ঘরের ভিতর থেকে উঠে এসে কাশতে আর হাসতে থাকেন হাসু ঠাকুর। এর পর আমার আর কিছু বলবার নেই।...কিন্তু এই বাবুমশাইয়ের কাছে এসব কথা না বললেই ভাল হয়।

রামতনু—আপনি এখানে আসবার আগে কোথায় ছিলেন ?

হাসু ঠাকুর—সন্ন্যেসী মানুষের পূর্ব আশ্রমের কোন কথা জিজ্ঞেসা করতে নেই। সে অধিকার আপনার নেই। আমি বরং জিজ্ঞেসা করতে পারি, আপনি এখানে আর কতদিন থাকবেন?

রামতনু—কোন ঠিক নেই।

—তাহলে তো ··তাহলে তো বলতে হয়···

শেষ পর্যন্ত কিছুই বললেন না হাসু ঠাকুর। কী যেন বলতে গিয়ে থেমে গেলেন।

মনোরমা বলে—আর দেরি নেই, ঠাকুর শিগগিরই যজ্ঞ করে ভয়ানক গোখরোটাকে মেরে ফেলবেন।

মধুবাবু—হ্যাঁ, ঠাকুর বলছেন, তার আগে বাড়ির চারদিকে কার্বলিক অ্যাসিড ছড়াতে হবে। তারপর চৌপারণ বাজারের সাপুড়েদের কাছ থেকে একজোড়া বেজী কিনে আনতে হবে। ঠাকুর একবার দেখে নেবেন, কার্বলিক অ্যাসিড আর বেজী কতদূর কী করতে পারে। তারপর তাঁর হাতের শেষ মার, সর্পযজ্ঞ।

রামতনুর কানের কাছে মুখ এগিয়ে দিয়ে ফিস-ফিস করেন মধুবাবু—ঠাকুর একটা কথা বলেছেন, তিনিই হলেন সেই জনমেজয়, আবার জন্মেছেন, মানুষের জীবন থেকে সাপের ভয় দূর করবার জন্য।

কলেজ-বন্ধু সুমন্তকে মনে পড়ে। কী সুন্দর দেখতে! সুমন্তর বোন এই মনোরমাও দেখতে খুবই সুন্দর দেখে একটু আশ্চর্যই হয়েছে রামতনু, মধুদার কারবারের কাজে সাহায্য করতে গিয়ে কী খাট নিই না খাটছে এই অল্পবয়সের মেয়েটা, মনোরমা। চাকর বলতে কেউ নেই, ওষুধের গাছ-গাছড়ার যোগাড়ীদের কাছ থেকে হিসেব করে আর ওজন করে সব যোগাড় বুঝে নেবার কাজ, দাম দিয়ে সবাইকে বিদেয় করা, আর রান্নার উনুন নিবিয়ে দিয়েই আবার গাছ-গাছড়াগুলিকে চিনে-চিনে ছালার মধ্যে ভরে ফেলা, সব কাজ এই মনোরমাকেই করতে হয়। মধুদা শুধু ছালার গায়ে কাগজ সেটে শিকড়-বাকড়ের পরিচয় লিখে দেন। বাসক কণ্টিকারী কুর্কসিমে আর কুকুরশোঁকা। হাতীশুঁড়ো খলখলে কালকাসুন্দে আর বেণার মূল। সোনামুখী বনজিরা আর পাতালগরুড়ী। মাহাতোর একটি ছেলে এইসব মাল গো-গাড়িতে চড়িয়ে মাসের মধ্যে একটি দিনে একটানা কোডারমা রেলস্টেশনে গিয়ে কলকাতার ঠিকানায় সব চালান করিয়ে দেয়।

মধুদা বলেন—কী আর করব বল, ভাই। ইংরেজী লেখাপড়া শিখিনি, বাপের পেশা কবরেজীও শিখিনি। শুধু কিছু গাছ-গাছড়া চিনতে শিখেছি। তাই সাপের বাঘের আর ভালুকের ভয় সহ্য করে এখানে পড়ে আছি। কিন্তু জানি না আর কতদিন সহ্য করে টিঁকে থাকতে পারব, ঠাকুর যদি দয়া না করেন।

রামতনু—তার মানে, সর্পযজ্ঞ করে সন্ন্যাসী গোখরোটাকে না মারেন?

—হ্যাঁ। এই হাসুঠাকুর, বলতে গেলে একটা মস্ত-বড় আশীর্বাদের মত আমাদের

ভাগ্যের ঘরে এসে ঠাঁই নিয়েছেন। কোথা থেকে হঠাৎ একদিন এসে, এই বাড়ির দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ডাক দিলেন, ভয় নেই, আমি এসেছি। মনোরমা জিজ্ঞেসা করেছিল—কিসের ভয়ের কথা বলছেন? হাসু ঠাকুর। বলেছিলেন—সাপের ভয়।

মধুদা বলেন—আমাদের এই সাপের ভয়ের কথা তিনি যে কী ক'রে বুঝলেন, সেটা আমার কাছে একটা আশ্চর্য রহস্য। আমার মনে হয়েছে, হাসু ঠাকুর সত্যিই একজন অন্তর্যামী ঠাকুর। সিন্ধীবাবুরা অবশ্য একদিন একটা বাজে কথা বলেছিলেন।

রামতনু—কীরকম বাজে কথা?

—হাসু ঠাকুর নাকি চৌপারণ বাজারে একদিন সিন্ধীবাবুকে জিজ্ঞেসা করেছিলেন, এক বাঙালীবাবু সস্ত্রীক এই জঙ্গলের ভিতরে কোথায় কোন গাঁয়ে থাকেন, বলতে পারেন?

রামতনু—সিন্ধীবাবু নিশ্চয় জবাব দিয়েছিলেন।

—হ্যাঁ। সিন্ধীবাবুর যে-কথাটা আমি সবচেয়ে অবিশ্বাস করি, সেটা খুবই বিশ্রী একটা কথা। হাসু ঠাকুর নাকি জিজ্ঞেসা করেছিলেন, বাঙালীবাবুর স্ত্রী দেখতে কেমন? বয়স কত? সে বাড়িতে কিসের ভয় আছে?

মনোরমা—ভয়? এ কী সামান্য ভয়! সহ্য করতে গিয়ে আমার প্রাণ শুকিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কী আর করি বলুন? এই মানুষটাকে এখানে একা ফেলে রেখে বাপের বাড়ি চলে যেতে তো পারি না। ভদ্রালাককে কে তাহলে ডাল-ভাত আর একটু ঝিঙে-চচ্চড়ি তৈরী করে খাওয়াবে বলুন? কিন্তু আমার এসব কথা জানিয়ে দিয়ে আপনি ছোড়দাকে একটা চিঠি লিখে ফেলবেন না, রামতনুদা।

রামতনু—সর্পযজ্ঞ তাহলে সত্যিই হবে?

মধুদা—হ্যাঁ, অবশ্যই হবে। দেড় সের খাঁটি ঘি এনে রেখেছি। এক সের বেল-কাঠ যোগাড় করেছি। বাসু ঠাকুর বলেছেন, ওতেই হবে, ওতেই হবে। ছোট যজ্ঞ করতে লেগেছিল আধসের ঘি, বড় যজ্ঞ করতে এক সের। এই তো পার্থক্য।

॥ তিন ॥

কার্বলিক অ্যাসিড ছড়িয়ে দেবার পর সাপেরা সত্যিই কোথায় যেন পালিয়ে গেল। ছোট-বউয়ের বিশ-পঁচিশ রকমের ভাইদের কাউকেই দেখা গেল না। কিন্তু সন্ন্যেসী গোখরো তার ড্রাগন-ড্রাগন চেহারা নিয়ে স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়ায়। যেমন ঘরের বাইরে, তেমনই ঘরের ভিতরে দুপুরে বেলা উঠোনের এক কোণে বসে এঁটো বাসন মাজতে মাজতে হঠাৎ একেবারে স্তব্ধ হয়ে যায় মনোরমা। সন্ন্যেসী গোখরো মনোরমার পায়ের কাছে এসে যেন একটা আহ্লাদের স্বাদে বিলোল হয়ে লতিয়ে পড়েছে। ফণা তুলে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। হঠাৎ যেন চমকে উঠল ফণাটাই। দেখতে

পেয়েছে সন্ন্যেসী গোখরা, সামনের নেড়া জমিটার ধুলোর উপর মারামারি করছে দুটো চড়ুই। চড়ুই দুটোর দিকে ছুটে চলে গেল সন্ন্যেসী গোখরো। সত্যিই কী অদ্ভুত রং এই সাপটার! ইঁটের গুঁড়োর মত লালচে গৈরিক রং।

ভয় ভেঙে যাবার পর হেসে ফেলেছিল মনোরমা।—শুনছ? সাপটাকে সত্যিই যে একটি সন্ন্যেসী বলে মনে হচ্ছে!

পরের দিনই চৌপ্যারণ বাজারের সাপুড়েদের কাছ থেকে একটা বেজী কিনে নিয়ে আসে বুড়ো মাহাতোর বড় ছেলে—এই লিন আপনার বেজী, এখনই দুধ খেতে দিন। নয় তো দু'চারটে মুরগি-বাচ্চা খেতে দিন।

সাতদিন পরেই লোক পাঠিয়ে খবর দিল মনোরমা। একবার এসে দেখে যান, রামতনুদা।

সব দেখে আর শুনে বুঝতে পারে রামতনু, বেজী সত্যিই কাজ করেছে। ছোট-বড় নানা জাতের সাপের কাটা-ছেঁড়া ধড় বাড়ির বাইরে আর আশেপাশে অনেক দেখতে পাওয়া গিয়েছে। আর, সন্ন্যেসী গোখরোও তার ভবলীলা সাঙ্গ করেছে।

রামতনু—সর্পযজ্ঞ হয়ে গিয়েছে নাকি?

মধুদা আর মনোরমা একসঙ্গে চেঁচিয়ে ওঠে।—হ্যাঁ।

—কবে?

—এই তো আজ। আজই সকালে ঠাকুর ঘি পুড়িয়ে সর্পযজ্ঞ করেছেন, মনে মনে একলক্ষ মন্তর জপেছেন, আর, আজই দুপুরে সন্ন্যেসী গোখরোটা মারা পড়েছে। সর্পযজ্ঞ সার্থক হয়েছে।

দেখতে পায় রামতনু, ঠিকই, সন্ন্যেসী গোখরোর সেই ড্রাগন-ড্রাগন চেহারাটা রক্তমাখা হয়ে নেড়া জমিটার উপর পড়ে রয়েছে। একটা শকুন উড়ে এসে মরা গোখরোটার দশ হাত দূরে বসেছে।

রামতনু—যাক, এবার তাহলে আপনাদের জীবনের সবচেয়ে বড় ভয়টা সরে গেল।

মধুদা ঠিক ঠিক। আঃ, ভাবতে কী যে স্বস্তি বোধ করছি, কী বলব।

মনোরমা—এবার সত্যিই একেবারে নির্ভয় হয়ে গেলাম, রামতনুদা।

মধুদা—এবার আমি মাঝে-মাঝে মনোরমাকে একা রেখে দিয়ে হাটবাজারে যেতে, কিংবা ইচ্ছে হয়তো, একটা দিন-রাত কোডারমা'র হোটেলে কাটিয়ে দিয়ে আসতে পারি। জঙ্গল আর ভাল লাগে না রে, ভাই?

রামতনু—আপনাদের ঠাকুর কি আজই চলে যাবেন?

মধুদা—না না, তাঁর যেদিন ইচ্ছে হবে সেদিন যাবেন। তিনি থাকলেই তো ভাল। মনোরমাকে তাহলে আর একা থাকতে হবে না। সাপের ভয় না থাকুক, হায়েনার ভয় তো আছে।

রামতনু—আমার কথা শুনুন, মধুদা। মনোরমাকে একা রেখে একটি দিনের জন্যও দূরে কোথাও যাবেন না। আপনাদের ঠাকুর চলে যাক, তারপর আপনি

একদিন কোডারমার একটা নোংরা হেটেলের চপ-কাটলেট যত খুশি খেয়ে আসবেন

মধুদা আশ্চর্য হয়ে বলেন—এ আবার কেমনতর কথা হল, ভাই ?

আর কোন কথা না বলে চলে গেল রামতনু।

একটা প্রশ্ন যেন রামতনুর মনটাকে কষ্ট দিয়ে কথা বলছে। বেচারা সন্ন্যেস গোখরোটার জীবনটার এরকম একটা রক্ত-মাখা অন্তিম কি সত্যি সত্যি মধুদা আ মনোরমার জীবনের ভয় আর দুর্ভাবনার অন্তিম ?

॥ চার ॥

সারা রাত ধরে বৃষ্টি হয়ে শেষ রাতের দিকে থেমে গেল। শুধু গাছের পাত থেকে ঝরে পড়া ফোঁটা-ফোঁটা জলের শব্দও ফুরিয়ে গিয়েছে।

পূর্বের আকাশের অন্ধকার ফিকে হয়ে আসছে। আর কোন শব্দ নেই। ভো হতে আর তো দেরি নেই।

ভয়ানক দানুয়া-ভালুয়া জঙ্গলের সব সাড়া-শব্দ বৃষ্টিতে ভিজে যেন চুপ গিয়েছে। হঠাৎ একটা ভীত প্রাণের আর্তস্বর শেষরাতের সেই স্তব্ধতা বুকটাকে যেন শিউরে দিয়ে বেজে উঠল। যেমন করুণ, তেমনই তীব্র একট চিৎকার। মেয়েলি গলার চিৎকার।—কী সর্বনাশ, কী সর্বনাশ! সাবধা সাবধান!

প্রথমে জেগে উঠলেন সিন্ধীবাবুরা। তাঁরাই ডাক দিয়ে বলেন—শুনছে তসীলদারবাবু ? মধুবাবুর স্ত্রী ভয় পেয়ে চিৎকার করছেন।

সিন্ধীবাবু দুজন আর রামতনু উদ্বিগ্ন হয়ে আর দৌড় দিয়ে মধুবাবুর বাড়ি কাছে এসে থমকে দাঁড়ায়। মধুবাবুর সেই বাড়ির সেই বন্ধ ঘরের জানালাটাবে ভেঙে দিল সিন্ধুবাবুদের হাতের লাঠির চারটে আঘাত, যে ঘরে মনোরমা থাকে ভিতরে উঁকি দিয়ে দেখতে পায় রামতনু, টিম টিম করে একটা তেলের পিদি জ্বলছে। বিছানার উপর বসে থর থর করে কাঁপছে মনোরমা। আর, যেন একট বিভীষিকার দিকে তাকিয়ে আছে।

ঘরের ভিতরে মেঝের উপর এক ঠাঁয় দাঁড়িয়ে আছেন হাসু ঠাকুর, আর ভয়ানক ক্রুদ্ধ রুষ্ট ও বিরক্ত সেই সন্ন্যেসী গোখরো ফণা তুলে হাসু ঠাকুরকে থমকিয়ে রেখেছে। এক পা এদিক-ওদিক নড়তে পারছেন না হাসু ঠাকুর নড়লেই ফণা তুলে ছোবল দিতে চায় নিষ্ঠুর দৃষ্টি সেই সন্ন্যেসী গোখরো।

এ কী ব্যাপার? কোথা থেকে এল সেই সন্ন্যেসী গোখরো? সে তো ছিন্নভিন্ন হয়ে মরেই গিয়েছে! রামতনুর বিস্ময়ের ভাষা শুনে সিন্ধীবাবুর বলেন: আরে ভাই, ওটা অন্য একটা সন্ন্যাসী সাপের মরা চেহারা আপনি দেখেছিলেন। ধরবাবা এই সন্ন্যেসী গোখরোকে কেউ মারতে পারেনি। ও নিজে

না মরলে কেউ ওকে মারতে পারবে বলে মনে হয় না।

হাসু ঠাকুর বিড় বিড় করে কথা বলেন—ওগো মশাইরা, আগে এই যমটাকে কোনমতে সরিয়ে নিয়ে যান অপনারা। তারপর আমার কথা শুনুন।

ড্রাগন-ড্রাগন চেহারারসন্ন্যেসী গোখরোও কী সুন্দর ভঙ্গীতে ফণা তুলেছে। সন্ন্যেসী গোখরোর গলার রোঁয়ার সরু-লম্বা রেখাটা করাতের দাঁতের রেখার মত শক্ত হয়ে গিয়েছে। গোখরোর জিভটা যেন একটা আক্রোশের আনন্দে লিক লিক করে খেলছে হাসু ঠাকুরের দুই হাঁটুতে সেই জিভের ছোঁয়া না লাগলেও দুই হাঁটু কাঁপছে। দৃশ্য দেখে রামতনুর প্রাণটাও বোধহয় একটা আক্রোশের সার্থক আনন্দে উতলা হয়ে উঠেছে।

রামতনু—কী ব্যাপার? কী হয়েছে মনোরমা? কেন ভয় পেয়েছ?

মনোরমা কেঁদে ফেলে।—দেখতেই তো পাচ্ছেন।

রামতনু—কে? ওই সন্নেসী গোখরাটা?

মনোরমা—না দাদা, ওই উনি। উনি কেন ঘরের বন্ধ দরজা ভেঙে আম্যর ঘরে ঢুকলেন?

রামতনু—কে? ওই হাসু ঠাকুর?

মনোরমা—হ্যাঁ। অপনার দাদা কোডারমা গিয়েছেন। কাল কিংবা পরশু ফিরবেন। কিন্তু উনি, যিনি একজন সন্ন্যেসী মানুষ তিনি বার-বার আমাকে বিশ্রী কথা বলেছেন: রাত্রিবেলা তোমার ঘরের দরজা খোলা রাখবে, মনোরমা। আচ্ছা বলুনতো দাদা কেন দরজা খোলা রাখব?

মাঝরাতে যখন বৃষ্টির শব্দ জঙ্গলের রাতটা ঝিম-ঝিম করেছে তখন একটা শাবল দিয়ে মনোরমার বন্ধ ঘরের কপাটটাকে ভেঙে ফেলেছেন হাসু ঠাকুর। ঘুমন্ত মনোরমার কানে সেই দস্যুতার কোন আওয়াজ পৌঁছয়নি। কিন্তু শেষরাতে হঠাৎ জেগে উঠেছে মনোরমা—কী সর্বনাশ, কী সর্বনাশ! আপনি এই ঘরের ভিতরে কেন? কপাট ভাঙলেন কেন?

সাবধান, আর এক-পা এগিয়ে আসবেন না।

সেই মুহূর্তে দেখতে পেয়েছেন দ্বিতীয় জনমেজয় এই হাসু ঠাকুর সন্ন্যেসী গোখরো মনোরমার খাটের তলা থেকে বের হয়েই ফণা তুলেছে। সাপ তো নয়, যে সাক্ষাৎ যম। ভয় পেয়ে বমি করে ফেলেছেন হাসু ঠাকুর আর এক পা-ও এগতে পারেননি।

এইবার বাড়িতে ঢোকবার প্রথম দরজার কপাট ভেঙে দিয়ে সবাই মনোরমার ঘরের কাছে এসে দাঁড়ায়। দাঁতে দাঁতে ঘষে কথা বলে রামতনু।—সন্নেসী গোখরোকে ধন্যবাদ, মনোরমাকে একটা গোখরো সন্ন্যাসীর বিষাক্ত কামড় থেকে রক্ষা করেছে। কিন্তু।

কী আশ্চর্য, রামতনু এগিয়ে এসে হাসু ঠাকুরের একটা হাত ধরতেই সন্ন্যেসী

গোখরো তার ফণা নামিয়ে নিয়ে আস্তে-আস্তে চলে যায় ঘরের বাইরে, তারপর উঠানে, তারপর নেড়া জমিটি পার হয়ে, বুড়ো বটের ছায়ার পাশে পুরনো একটা উইঢিবির ভিতরে ঢুকে পড়ে।

রামতনু—চলুন ঠাকুর মশাই, আমার কাছারিঘরের ভিতরে দুটো দিন বন্ধ হয়ে পড়ে থাকুন। তারপর মধুদা আসবার পর একটা হেস্তনেস্ত করা যাবে।

হাসু ঠাকুরের হাস্যহীন চেহারাটাকে হাত ধরে টেনে নিয়ে এসে কাছারিঘরের দাওয়ার উপর উঠতেই হেস্তনেস্ত হয়ে গেল। চৌপারণ থানার দারোগার সঙ্গে হাওড়ার সদর থানার দুই এস-আই এসেছেন। হাসু ঠাকুরকে দেখেই দুই এস-আই বলে উঠলেন হ্যাঁ, এই তো সেই সাংঘাতিক পাপীটি! দুটি বলাৎকার, তিনটি ডাকাতি, আর চার-পাঁচটি জোচ্চুরির এক পাকা শয়তান এই লোকটাকেই আমরা তিন বছর ধরে খুঁজছি।

মিঠুয়া জঙ্গলের সবই মিষ্টি

এই জঙ্গলটার নাম, মিঠুয়া। যেমন নামে, তেমনই রূপেও মিষ্টি।

আরও বলতে হয়, জঙ্গলটাকে শুনতেও মিষ্টি। তার মানে, এত বেশি পাখি এবং তাদের কলরবের এত মিষ্টি স্বর অন্য কোন জঙ্গলের বাতাসে বাজে না। মিঠুয়া জঙ্গলের ভিতরে যেমন পিয়াল গাছের ভিড়, তেমনই শিমুল পলাশ আকাশনিম আর অর্জুনের ভিড়। গাছে ফুল ধরলে মিঠুয়া জঙ্গলের রূপ খুলে যায়, বড়ই মিষ্টি রূপ। ঠাকুরসাহেবদের সম্পত্তি এই মিঠুয়া জঙ্গলের ভিতরে তসীল কাছারির দাওয়ার উপর বসে জঙ্গলের মিষ্টি চেহারা দেখে দেখে আর হরেক রকমের পাখির মিষ্টি কাকলি শুনে শুনে রামতনুর মনে সত্যিই একটা মিষ্টি স্বাদের আবেশ থমথম্ করে। মনে মনে স্বীকার করে রামতনু, তসীলের কাজে মিঠুয়াতে বদলি হয়ে এসে ভালই হয়েছে। আগে বেশ সন্দেহ হয়েছিল, রামগড়ের মত একটা শহুরে জায়গায় খুব কাছের এই মিঠুয়া জঙ্গলে শহুরে হৈ-হুল্লোড়ের আনাগোনার দৌরাত্ম্যে ছায়াময় শান্তিও স্বস্তির প্রাণ নিশ্চয়ই সর্বক্ষণ ত্যক্ত-বিরক্ত হয়। কিন্তু না, তা নয়। মিঠুয়া জঙ্গলের শান্তি আর জঙ্গলের ভিতরে মিঠুয়া নামের ছোট্ট বস্তিটার শান্তি বিঘ্নিত করবার মত কোন দুরন্ত চঞ্চলতা চিৎকার করে কিংবা ধুলো উড়িয়ে রামগড় থেকে ছুটে আসে না।

দেখে জেনে আর শুনে খুশি হয় রামতনু, কাছারির ভাণ্ডারী যুগলবাবু সপরিবারে এই জঙ্গলের ভিতরে মিঠুয়া বস্তির একটি মাটির বাড়িতে বিশ বছর ধরে রয়েছেন। আর, ওই অর্জুন গাছের ভিড়ের ফাঁক দিয়ে যে মেটে দেয়ালের বাড়িটাকে দেখা যায়, যার মাথার উপর খাপ্‌রার চালা, সে বাড়িতেও আজ ত্রিশ বছর ধরে সপরিবারে বাস করছেন ভরতবাবু। তাঁর ছেলে সাইকেল চড়ে রোজই রামগড়ে যায়। কন্ট্রাক্টর গুপ্ত অ্যাণ্ড কোং, অর্থাৎ গুপ্ত কোম্পানী রামগড় এলাকায় সরকারী ঘর-বাড়ি কালভার্ট আর সড়ক তৈরী করবার যে-কাজ আজ দশ বছর ধরে চলছে, সেই কাজেরই একজন তদারক মুহুরীবাবু, ভরতবাবুর ছেলে মনোহরকুমারের পঁচিশ বছর বয়সের চেহারাটাও বেশ মিষ্টি, অর্জুনের কাঁচা মঞ্জরীর মত। ভরতবাবু অনেকদিন আগে এই জঙ্গলেরই একটা গাছের শিকড় যোগাড় করে নিয়ে গিয়ে ছোট ঠাকুরসাহেবের দশ বছরের হাঁপানি সারিয়ে দিয়েছিলেন। উপকৃত ছোট ঠাকুরসাহেব ভরতবাবুকে এই মিঠুয়া জঙ্গলের তিন বিঘে জমি দান করে দিয়েছিলেন। তিন বিঘে জমিতে ভুট্টার ফলন যা হয়, তাই বেচে ভরতবাবুর পারিবারিক জীবনের খাওয়া-পরার দায় মোটামুটি মিটেই যায়। তার উপর এই তিন বছর ধরে আরও একটা আয়ের সৌভাগ্য এসেছে। ছেলে মনোহরকুমারের

চাকরি। ঠিকেদার গুপ্ত কোম্পানীর কাছে তদারকী মুহুরীর কাজ, মাইনে পঁচিশ টাকা।

মিঠুয়া জঙ্গলের বাইরের জগতের মানুষ হলেও এঁদের জীবন এই বিশ বছরের মধ্যে যেন জঙ্গলের ছায়ার স্নেহ পান করে করে মিষ্টি হয়ে গিয়েছে। পিয়ালের হাওয়া একটু উতলা হতেই দেখা যায়, ভাণ্ডারী যুগলবাবুর মেয়ের মিষ্টি মুখের হাসি আর এলোচুল দুই উতলা হয়ে উঠেছে। তসীলদার রামতনুর কাছে মন খুলে যুগলবাবু তাঁর দুশ্চিন্তার একটা কথা এরই মধ্যে বলে ফেলেছেন—আমার এই মেয়ের বিয়ে হবে কেমন করে?

রামতনু—কেন, বিয়ের খরচ যোগাবার মত টাকা-পয়সা কি...

যুগলবাবু—না, রামতনুবাবু। টাকার অভাব আছে বটে, তবু সেটা খুব বড় একটা সমস্যা নয়। সমস্যা হল, আমার মেয়ে এই বিমলার স্বভাবটা। ওর বয়স এখন বিশ বছর, তবু এই বেশি বয়সটাও কোন সমস্যা নয়। সমস্যা হল, মেয়েটা এই জঙ্গলের বাইরের কোন আলো-ছায়া আর জল-বাতাসকে সহ্যই করতে পারে না। গিরিডিতে ওর মামার বাড়িতে গিয়ে একটা সপ্তাহও টিঁকে থাকতে পারে না বিমলা। সর্বদা ভয়-ভয় ভাব, সামান্য একটা আওয়াজ শুনলেই চমকে ওঠে। ক্ষিদে হয় না, খেতে পারে না। মামী আশ্চর্য হয়ে কোন কথা জিজ্ঞেসা করলে কেঁদে ফেলে। এই এক মিঠুয়া জঙ্গল ছাড়া পৃথিবীতে অন্য কোথাও কোন সুখ-শান্তি সেই, কোন মায়া-মমতা নেই, এইরকম একটা বিশ্বাস যেন ওর প্রাণেরই ভিতরে শক্ত হয়ে বসে আছে। আমারও সত্যি বড় ভয় করে, রামতনুবাবু। যদি পাটনা গয়া রাঁচির কোন পাত্রের সঙ্গে ওর বিয়ে দিয়ে দিই, তবে শ্বশুর বাড়িতে গিয়ে দশটা দিনও বোধ হয় বেঁচে থাকবে না আমার মেয়ে, মরেই যাবে।

যুগলবাবু চোখ মুছে নিয়ে একটা হাঁফ ছাড়লেন, আর, সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন, চেঁচিয়ে উঠলেন—ও কী, ও কী, ও কী!

দেখতে পায় রামতনু, যুগলবাবু তাঁর মাটির বাড়ির একটা একচালা ঘরের মাথাটার দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে কী যেন দেখছেন।

রামতনু—কী ব্যাপার, ভাণ্ডারীজী?

যুগলবাবুর গলার স্বরে যেন একটা উতলা বিস্ময়ে আবেগ কাঁপতে থাকে। যুগলবাবু বলেন—আমি যে চোখে দেখেও বিশ্বাস করতে পারছি না, রামতনুবাবু।

রামতনুবাবু—কী দেখছেন!

যুগলবাবু—ওই যে দেখেছেন, আমার বাড়ির ওই একচালা ঘরটার মাথার উপর আমগাছের একটা ডাল এলিয়ে পড়ে রয়েছে, সেখানে যত হাবিজাবি কাঠ কাঠি কাণ্ড আর ছেঁড়া চটের টুকরো ও ছেঁড়া ঝাঁটার জঞ্জাল দিয়ে তৈরী একটা পাখির বাসা দেখতে পাচ্ছেন কি?

রামতনু—হ্যাঁ।

যুগলবাবু—ওটা নীলকণ্ঠ পাখির বাসা। বিশ বছরের মধ্যে আমি এই বাসাটাকে কখনও শূন্য হয়ে থাকতে দেখিনি। এক নীলকণ্ঠ গিয়েছে তো অন্য নীলকণ্ঠ এসেছে। শুনলেন তো কী বিশ্রী কর্কশ স্বরে ডাক দিয়ে নীলকণ্ঠটা উড়ে গেল।

রামতনু—না, শুনতে পাইনি।

যুগলবাবুর দুই চোখের বিস্ময় এবার জ্বল জ্বল করে। গলার স্বর কর্কশ হলে হবে কি? নীলকণ্ঠ হল মহাদেবের ইচ্ছার দূত। বেশ বড় রকমের একটা সৌভাগ্যের শুভযোগ আসন্ন হলে তবেই নীলকণ্ঠ উড়ে গিয়ে অনেক উঁচু আকাশে চক্কর দিয়ে ঘুরতে আর ভাসতে থাকে। ওটা একটা লক্ষণ, জানিয়ে দেয় নীলকণ্ঠ, আসছে, আসছে শিগগিরই একটা শুভ ঘটনা ঘটবে।

যুগলবাবুর দুই বিস্ময়ভরা চোখ আবার ভিজে গিয়ে চিকচিক করে—আমি তো আশা একরকম ছেড়েই দিয়েছিলাম, রামতনুবাবু। কখনও ভাবিনি যে, আমাদের ওই নীলকণ্ঠ কখনও উড়ে গিয়ে উঁচু আকাশে ভাসবে।...ওই ওই দেখুন রামতনুবাবু, নীলকণ্ঠটা কত উঁচু আকাশে উঠে আমাদের এই মিঠুয়া জঙ্গলের মাথার উপর ভাসছে আর পাক দিয়ে উড়ছে।

রামতনু—হ্যাঁ, তাই তো দেখছি।

যুগলবাবু—না, এইবার একটা শুভ সৌভাগ্যের ব্যাপার না হয়ে যায় না।

॥ দুই ॥

শুভ সৌভাগ্য বলতে কী বলছেন ও কী বোঝাতে চাইছেন যুগলবাবু, সেটা খুব স্পষ্ট না করে হোক, একটু অস্পষ্ট করেই বুঝতে পারে রামতনু। এইবার ও এতদিনে তাঁর মেয়ে বিমলার বিয়ে ভালয়-ভালয় হয়ে যাবে, এই তাঁর বিশ্বাস। উঁচু আকাশে উড়ে উড়ে নীলকণ্ঠটা এই বিশ্বাসেরই বিলক্ষণ সংকেত যুগলবাবুকে জানিয়ে দিয়েছে।

মিঠুয়া জঙ্গলে পাখির জীবনের চমৎকার এক সমারোহের দৃশ্য দেখে আর মুগ্ধ হয়ে রামতনুর মনের চিন্তাতেও যেন মিষ্টি রকমের কলরব মাঝে মাঝে বেজে ওঠে। তার মধ্যে বাংলার প্রফেসর সেই চারুবাবুর গলার স্বর শুনতে পায় রামতনু। পাখিরা আমাদের এই পার্থিব জীবনের রূপ ও প্রকৃতির মধ্যে যেন একটি পুণ্যময় বিস্ময়। কোটি বছর আগে গম্ভীর পৃথিবীর গম্ভীর বাতাসে প্রথম মিষ্টি শব্দ সঞ্চারিত করেছিল যে, তারই নাম পাখি। এটা বোধ হয় মহা-মহা প্রকৃতিবিজ্ঞানী মহাশয়েরাও স্বীকার করবেন। কিন্তু আমি যদি বলি, পাখিরাই ডেকে-ডেকে সূর্যোদয় ঘটায় তবে কি খুব ভুল কথা বলা হবে?

সেদিন রামতনুই চারুবাবুকে পাল্টা প্রশ্ন করেছিল। কিন্তু একথা বললে কি খুব একটা সত্যি কথা বলা হবে?

চারুবাবু হেসেছিলেন—তোমাদের বিচারবুদ্ধিতে যা বলে তাই তোমরা বিশ্বাস কর। কিন্তু আমিও হোরাশিওদের কাছে এই কথা জোর গলায় বলব যে, স্বর্গে-মর্ত্যে এমন অনেক সত্য কাজ করছে, যার পরিচয় তোমাদের দার্শনিক বিজ্ঞতার পক্ষে স্বপ্নেও দেখা সম্ভব নয়। বৈজ্ঞানিকের পক্ষেও সম্ভব নয়।

আজ এখন মিঠুয়া জঙ্গলের ভিতরে কাছারিবাড়ির দাওয়ার উপর বসে প্রফেসর চারুবাবুকে আর ওইরকম প্রশ্ন করতে রামতনুর মনটা একটুও উৎসাহ বোধ করে না। রামতনুর মনে বরং অন্য একটা প্রশ্ন মুখর হয়ে বাজতে থাকে। বাইবেলের এ যুগে কি সলোমোনের মত দ্বিতীয় কোন জ্ঞানীর আবির্ভাব সম্ভব নয়, যিনি পাখির ভাষা বুঝতে পারেন? এই যে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত জঙ্গলের বাতাসে নানা রূপের নানা পাখির কলরবের গীতালি বাজতে থাকে, তার মধ্যে কি কোন ভাষা নেই? তার মধ্যে কি সুখ-দুঃখ ও আনন্দের কোন বার্তা নেই? থাকতে প্যারে। রামতনুর মুগ্ধ মনের গভীরে এই বিশ্বাসের গুঞ্জন চলতে থাকে। প্রফেসর চারুবাবুর দার্শনিক ধারণা যদি সত্য হয়, তবে এটাও সত্য যে পাখিদের ভাষা আছে। আর ভাণ্ডারী যুগলবাবু নীলকণ্ঠ পাখির যে গল্প শোনালেন, তার মধ্যে কিছু সত্য যদি থেকে থাকে, তবে তো বিশ্বাস করতেই হয় যে, পাখিরা তাদের নিজেদের ইচ্ছার গুনে ঘটনা তৈরী করতে পারে। চারুবাবু যেমন বলতেন, পাখিরা জেগে উঠে আর ডাক দিয়ে ভোরের আকাশে আলো জাগিয়ে তোলে। ভোরের আকাশে আলো জাগে বলে পাখিরা জেগে ওঠে, এটা প্রাকৃতিক নিয়মের আসল সত্য না হতেও পারে।

কিন্তু কই, নীলকণ্ঠ উড়ে গিয়ে উঁচু আকাশে ভেসে বেড়াবার পর তো অনেকগুলি দিন পার হয়ে গেল, আগন্তুক শুভ ঘটনার কোন মূর্তি তো দেখতে পাওয়া গেল না।

রামতনুর চিন্তাগুলিকে চমকে দিয়ে সত্যিই এক আগন্তুকের মূর্তি কাছারিবাড়ির বারান্দাতে উঠে হেসে ফেলে আর কথা বলে—আমি মিঠুয়া জঙ্গলের সব বাঁশের ঝাড় কিনে নিয়েছি। আপনাদের মালিক ঠাকুরসাহেবদের দপ্তরে টাকা জমা দিয়েছি, মোট দেড় হাজার টাকা। খবরটা পেয়েছেন নিশ্চয়। রামতনু—হ্যাঁ পেয়েছি। বড় কম টাকায় অনেক বেশি দামের জিনিস আপনি বাগিয়ে ফেলেছেন।

আগন্তুক বেশ বিরক্ত হয়ে কথা বলে—সেটা তো আপনার বিচারের বিষয় নয়।

রামতনু—যা-ই হোক। আমার এখন কর্তব্য, আপনার থাকবার মতো একটা ঘরের ব্যবস্থা করা।

আগন্তুক—একটা বড় ঘরের ব্যবস্থা করবেন। আমি আছি, আমার সঙ্গে

একজন চাকরও আছে। তাছাড়া আমার বাঁশের হিসেব রাখবার একজন সরকারবাবুও আছে।

আগন্তুক এই ব্যক্তির নাম, পরেশনাথ। বেশ ফর্সা ও বেশ তেজী চেহারার মানুষ। বয়সও ত্রিশের বেশি নয় বলে মনে হয়। কাছারিবাড়ির লাগোয়া একটা বেশ বড় ঘরে আগন্তুক পরেশনাথের থাকবার ব্যবস্থা করে দেবার পর দুটি দিনও পার হয়নি, দেখে আশ্চর্য হয় রামতনু ভাণ্ডারী যুগলবাবুর বাড়ির কাছের পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে পরেশনাথ। আর, ওদিকে যুগলবাবুর বাড়ির একটি ঘরের জানালার কাছে দাড়িয়ে চুল বাঁধছে বিমলা। বিমলা যেন মুখ টিপে অদ্ভুত রকমের একটা মিষ্টি নরম হাসিতে দুই ঠোঁটের উপর ছড়িয়ে দিয়েছে।

রামতনুর দুই চোখ থেকে সন্দেহের ছায়াটা হঠাৎ সরে গেল। কারণ বিমলার মুখের হাসির সত্যিকারের কারণটা বুঝতে পারা গেল। শুনতে পেয়েছে রামতনু, যুগলবাবুর স্ত্রী এসে ডাক দিয়েছেন—কীরে মেয়ে, হাসছিস কেন?

বিমলা—কোকিলগুলো কী সুন্দর ডাকছে, মা!

ঠিকই, কী সুন্দর ডাকছে কোকিলগুলো। একটা দুটো নয়, মিঠুয়া জঙ্গলের অনেক কোকিল। কুহু কুহু কুহু! কী চমৎকার মিষ্টি স্বরের ডাক। জীবনে কত বার কত কোকিলেরই তো ডাক শুনেছে রামতনু। কিন্তু সে ডাক আজকের এই মিঠুয়া জঙ্গলের কোকিলের ডাকের মতো বিহ্বল এক আবেগের বুক থেকে ঝরে-পড়া নিবিড় মধুরতার উৎসার নয়। কিন্তু জানালার দিকে দুই চোখের অপলক দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রেখে ওই যে পরেশনাথ হাঁটাহাঁটি করছে সে কী শুনতে পেয়েছে বিমলার দুঃখের কথাগুলি? শুনতে পেলেও সে-কথার অর্থ কি বুঝতে পেরেছে?

না, কিছুই বুঝতে পারেনি। কারণ মিঠুয়া জঙ্গলের বিশ বয়সের ওই মেয়ের প্রাণের স্বভাবটার কোন খবর রাখে না পরেশনাথ।

দেখতে পেয়ে বেশ বিরক্ত হয় রামতনু। এইবার একেবারে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছে আর হাসছে পরেশনাথ। কিন্তু খোলা জানালার কাছে দাঁড়িয়ে-থাকা বিমলার দুই চোখে যেমন কোন বিস্ময়ের জ্বলজ্বলে উদ্ভাস নেই, তেমনই কোন ভ্রুকুটিও নেই। বিমলা কি তবে এতদিন পরে একজন অচেনা আগন্তুককে···

নীলকণ্ঠ কি তবে এইরকম একটা ঘটনার সঙ্কেত জানাবার ইচ্ছায় উঁচু আকাশে উড়ে উড়ে ঘুরেছিল? এটা কি তবে একটা শুভযোগের ঘটনা? ভগবান জানেন।

হঠাৎ নিজের মনে হেসে ফেলে রামতনু। সরোজিনী নাইডুর একটা কবিতার কথা শোনাতে গিয়ে প্রফেসর চারুবাবু হেসে ফেলতেন। সেই হাসির ছবিটাকে যেন চোখে দেখতে পাচ্ছে রামতনু। সরোজিনী নাইডুর সেই ইংরেজি কবিতাটাটা বলছে : নদীর সবুজ চরের একটি নিরালাতে চাঁপা গাছের ডালে ডালে কুঁড়ি ধরেছে।

আর, সেই চাঁপা গাছেরই একটি ডালে বসে কোয়েল ডাকছে—লিরা লিরি। লিরা লিরি।

ফুঁপিয়ে হেসে উঠেছিলেন প্রফেসর চারুবাবু—কোকিলের গলাতে লিরা লিরি ডাক শুনতে হলে আমি মরেই যাব। এত চমৎকার ও মধুর কুহুরব যদি ইংরেজী স্টাইল ধরে লিরা-লিরি হয়ে যায়, তবে ও তাই শুনে একজন ভারতীয় মানুষের পক্ষে হেসে কেঁদে মরে যাওয়াই ভাল।

একটা সাইকেলের শব্দ বেজে ওঠে। ভরতবাবুর ছেলে মনোহরের সাইকেলের শব্দ। ভাণ্ডারী যুগলবাবু বলেছেন, প্রায়ই রামগড়ের একটা ওষুধের দোকান থেকে তাঁর জন্যে মাথাধরা সারাবার ট্যাবলেট কিনে এনে দেয় মনোহর। মনোহর আজ বোধ হয় সেই ট্যাবলেট কিনে নিয়ে এসেছে।

মনোহরের সাইকেলের শব্দটাও কি মিঠুয়া জঙ্গলের কোকিলের ডাকের মতো মিষ্টি? তা না হলে দুই কান পেতে সাইকেলের শব্দটাকে শুনবে কেন বিমলা? মরে যায়নি, চলেও যায়নি পরেশনাথ। দেখে মনে হয়, সাইকেলের শব্দ শুনে পরেশনাথের দুই চোখে যেন একটা রুক্ষ বিরক্ত ভাব চমকে উঠেছে।

যুগলবাবুর বাড়ির খাস দরজার দিকে এগিয়ে যায় পরেশনাথ। আর, বেশ রুক্ষ রকমের দৃষ্টি তুলে যার মুখের দিকে তাকায়, সে হল ভরতবাবুর ছেলে মনোহর। ঠিকই, ওষুধ নিয়ে এসেছে মনোহর। এগিয়ে যেয়ে বাড়ির যে ঘরের ভিতরে ঢুকে কথা বলে মনোহর, সেই ঘরে বসে আছেন যুগলবাবু। দেখতে পায় পরেশনাথ, অন্য ঘরের ভিতর থেকে বের হয়ে এসে এই যুগলবাবুর গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রইল বিমলা। দুই চোখ অপলক করে মনোহরের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে বিমলা। যুগলবাবুর স্ত্রী এসে যেন চাপা ধমকের সুরে কথা বলেন।

—তোর এখানে এসে দাঁড়াবার তো কোন দরকার নেই যা, ভিতরে যা।

এই কদিনের মধ্যেই যুগলবাবুর বাড়ির অনেক কথা স্বয়ং যুগলবাবুই রামতনুকে শুনিয়ে দিয়েছেন—মেয়েটার বিশ বছর হয়েছে বটে, কিন্তু এই সামান্য কাণ্ডজ্ঞানও হয়নি যে, একজন অনাত্মীয় বাইরের ছেলে আমার কাছে যখন দাঁড়িয়ে থাকে, তখন ওর এসে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা উচিত নয়। তবু কিছুটা উচিত হত যদি মনোহরের সঙ্গে বিমলার বিয়ে দেওয়া সম্ভব হত। মনোহরের মত ছেলেকে আমাদের পক্ষে তো অপছন্দ করবার কিছু নেই। মনোহরকে আমাদের সবারই খুব পছন্দ হয়। মনে হয়, আমাদের বিমলাও মনোহরকে বেশ পছন্দ করে।

রামতনু হাসে। হতে পারে। দুজনেই তো এই মিঠুয়া জঙ্গলের মতো মিষ্টি স্বভাব ও মিষ্টি চেহারার মানুষ।

যুগলবাবু—কিন্তু ভরতবাবুর মত উঁচু কায়েত তো আমার মত নীচু কায়েতের সঙ্গে কুটুম্বিতা করবেন না। কখখনো না। তাই আমার সব সময়ের চিন্তার মধ্যে এই উদ্বেগের জ্বালাটা যেন লেগেই আছে। মেয়ের বিয়ে দেব কী করে? কোথায়?

কার সঙ্গে ?

রামতনু—কিন্তু এই পরেশনাথের সঙ্গে হতে পারে কি ?

যুগলবাবু—হতে পারে বৈকি। পরেশনাথ ও আমরা একই জাতের মানুষ। কিন্তু হলে কি ভাল হবে ? আপনি শুনেছেন কিনা, জানি না, আমি এরই মধ্যে শুনতে পেয়েছি, পরেশনাথের হিসেব সরকার বংশীলাল বলেছে যে, পরেশনাথ বিয়ে করেছিল। সেই বউ একদিন পরেশনাথের গালাগালি সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করে বসলো।

আতঙ্কিতের মত চেঁচিয়ে ওঠেন যুগলবাবু—তবে কি, পরেশনাথের মত পাত্রের সঙ্গে আমার বিমলার বিয়ের চেষ্টা করতে হবে ? হায় কপাল। নীলকণ্ঠ কি বিমলার জন্য এইরকম একটা শুভ পরিণাম ডেকে আনলো ?

॥ তিন ॥

ঝাঁকে ঝাঁকে বাঁশতিতিরের দল উড়ে চলে যাচ্ছে। দেখে মনে হয়, টিয়ার ঝাঁক উড়ে যাচ্ছে। বুঝতে পারে রামতনু পরেশনাথের কারবারের কাজ খুব জোর শুরু হয়ে গিয়েছে। রামগড় থেকে লোকজন নিয়ে এসে মিঠুয়া জঙ্গলের সব বাঁশঝাড় উজাড় করতে লেগে গিয়েছে পরেশনাথ। বাঁশতিতিরের ঝাঁক যেন মিঠুয়া জঙ্গলের বাতাসটাকেই সন্দেহ করে আর ভয় পেয়ে নীল আকাশের সুদূরের সবুজ বলয়ের দিকে উড়ে চলে যাচ্ছে।

পরেশনাথই এসে দাঁড়াল—বলুন কেমন আছেন রামতনুবাবু।

রামতনু—ভাল নই।

পরেশনাথ—কেন ?

রামতনু—ওই সে বাঁশতিতিরের ঝাঁক ভয় পেয়ে আর জঙ্গলের মায়া ছেড়ে দিয়ে দূরের কোথাও উড়ে চলে যাচ্ছে, সেটা তো কারও চোখে ভাল লাগবার মত দৃশ্য নয়।

হেসে ওঠে পরেশনাথ—ওঃ হো, তাই বলুন। বাঁশঝাড় উজাড় করে কেটে নিলে বাঁশতিতিরই যে উড়ে চলে যাবে রামতনুবাবু। গর্তের সজারু তো উড়ে যাবে না।

রামতনু—আপনার এই কথাটা শুনতে আরও খারাপ লাগছে।

পরেশনাথ—বাস্ বাস্ রামতনুবাবু, বাঁশতিতিরের জন্য মায়া করে কেঁদে ফেলবেন না। যেতে দিন, যেতে দিন।

রামতনু—কী যেতে দেবে ?

পরেশনাথ—এই সব পাখি-টাখি দূর হয়ে গেলেই ভাল। শুনুন তবে, আজ দশদিন হল এই মিঠুয়াতে এসেছি। এই দশ দিনের মধ্যে অত্যন্ত পঞ্চাশবার পাখির

দল আমার ঘরে ঢুকে উৎপাত করেছে। আটা ছাতু ভুট্টা, সবই কিছু-না-কিছু খেয়ে নিয়ে পালিয়েছে। কী আশ্চর্য, দু'তিন রকমের পাখি নয়। কত রকমের চেহারার কত জাতেরই না পাখি। আমি ভাবছি, জন্মেজয় যেমন সাপ ধ্বংস করবার যজ্ঞ করেছিলেন, তেমনই তিনি যদি পাখি ধ্বংস করবার যজ্ঞ করতেন, তবে—

রামতনু—থামুন মশাই। বাজে কথা আর বাড়াবেন না।

পরেশনাথ—বেশ তো, তবে একটা কাজের কথা শুনুন।

রামতনু—বলুন।

পরেশনাথ—আপনাদের ভাণ্ডারী যুগলবাবুর মেয়ে তো দেখতে বেশ ভালই। তা ছাড়া…

হঠাৎ যুগলবাবু এসে খুব খুশির স্বরে চেঁচিয়ে ওঠেন—শুনতে পাচ্ছেন তো।

রামতনু—হ্যাঁ, একটা পাখি। যেন কী একটা কথা বলে-বলে ডাকছে।

যুগলবাবু—কী আশ্চর্য, আজ সেই কোন সকালে পাখিটা এসে ডাকাডাকি শুরু করেছে। আমার ঘরের আঙিনার চারদিকের যত আম চালতে আর কদম গাছের এ-ডাল থেকে সে-ডালে উড়ে উড়ে বসছে আর ডাক ছাড়ছে, কুটুম আয়! কুটুম আয়। শুনতে পাচ্ছেন তো তসীলদারজী?

রামতনু—হ্যাঁ, শুনছি।

পরেশনাথ কোন কথা না বললেও তার চোখমুখের ভঙ্গী দেখে বোঝা যায়, সে-ও শুনতে পেয়েছে। ডেকেই চলেছে পাখিটা—কুটুম আয়, কুটুম আয়।

যুগলবাবু যেন শুভ আশার একটা সংকেত দেখতে পেয়েছেন, তাই অমন উৎফুল্ল হয়ে হাসছেন—ওটার নাম কুটুম পাখি।

রামতনু—আমি আমার মামাবাড়ির বাগানের গাছে অনেক কুটুম পাখি দেখেছি। আমার মনে হয়, ওটা পাপিয়া জাতের পাখি।

পরেশনাথ যেন তার দুই বিরক্ত চোখের ভ্রুকুটিকে সামলে দেবার চেষ্টায় হাসতে থাকে। জিজ্ঞাসা করে—কুটুম পাখি ডেকেছে তো কী হয়েছে? মিঠুয়া জঙ্গলের মাথার উপর রসগোল্লার বৃষ্টি ঝরে পড়বে?

রামতনু হাসে—না; কুটুম পাখি ডাকছে বলে যুগলবাবুর বাড়িতে সত্যিই কোন কুটুমের আগমন হবেই হবে। কিংবা কুটুমের আগমন হবে বলে বুঝতে পেরে পাখিটা ডাকছে।

পরেশনাথ—বাঃ, আপনাকে মস্ত বড় এক জ্ঞানী মানুষ বলে মনে হচ্ছে।

উৎফুল্ল যুগলবাবু চলে গেলেন। বিষণ্ণ পরেশনাথও চলে গেল। আর, যুগলবাবুর জন্যে একটা মায়ার ভাব ব্যাকুল হয়ে রামতনুর মনের কামনায় বাজতে থাকে—আসুক আসুক বেচারা যুগলবাবুর বাড়িতে কুটুমের আগমন হোক। কুটুম পাখির বিচারবুদ্ধির গল্পটা সত্যি হোক বা মিথ্যে হোক।

বিকালের সূর্য যখন বেশ লাল হয়ে মিঠুয়া জঙ্গলের পিয়াল শিমুল আর

অর্জুনের মাথায় রঙীন আলোর আভা মাখিয়ে দিয়েছে, ঠিক তখন পরেশনাথ এসে ডাকতে থাকে—রামতনুবাবু, দেখুন তো ওরা কারা যুগলবাবুর বাড়িতে ঢুকছে।

দেখতে পায় রামতনু, সত্যিই তো, যুগলবাবুর কুটুম হতে পারেন কিংবা হবেন এমনতর কয়েকজন আগন্তুক যুগলবাবুর বাড়ির দরজায় কাছে দাঁড়িয়ে আছেন। তার মধ্যে একজনকে চিনতে পারা যায়। তিনি হলেন মনোহরের বাবা ভরতবাবু।

পরেশনাথ—ওদের কাউকে আপনি চেনেন কি?

রামতনু—একজনকে চিনি। ওই যে বুড়ো ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন আর হাসলেন উনি এখানকারই লোক মনোহরের বাবা ভরতবাবু।

পরেশনাথ—মনোহর আবার কে?

রামতনু—ওই যে সাইকেল চড়ে রোজই রামগড়ে যায়, সেই হল মনোহর।

পরেশনাথের শক্তপোক্ত চেহারাটা যেন হঠাৎ একটা জ্বালার ছোঁয়া লেগে ছটফটিয়ে ওঠে। দাঁতে দাঁত ঘষে কথা বলে পরেশনাথ—ওই যে লোকটা মাঝে-মাঝে এসে যুগলবাবুর বাড়ির একেবারে ভিতরে ঢুকে পড়ে মুখটা যার মেয়েছেলের মুখের মত দেখতে, যে ব্যাটা রামগড়ে গিয়ে ঠিকাদার গুপ্ত কোম্পানির তদারক মুহুরীর কাজ করে পঁচিশ টাকা মাইনে পায় সে ব্যাটারই নামটা বুঝি মনোহর?

রামতনু—হ্যাঁ, কিন্তু আপনি এত বেশি রাগ করে কথা বলছেন কেন?

কোন কথা না বলে, দুঃসহ একটা আক্রোশের মূর্তি ধরে তখনই চলে গেল পরেশনাথ।

আর সন্ধ্যা হতেই উৎফুল্ল যুগলবাবু একেবারে বুকভরা খুশির উল্লাস নিয়ে ছুটে আসেন—কুটুম পাখির ডাক খুব সার্থক হয়েছে রামতনুবাবু। ভরতবাবু নিজেই প্রস্তাব করেছেন, আমার বিমলার সঙ্গে তিনি তাঁর ছেলে মনোহরের বিয়ে দিতে চান। তিনি একেবারে স্পষ্ট করে বললেন, তিনি জাতের বাধা আর মানবেন না। তাঁর মতে, তিনি উঁচু কায়েত নন আর আমরাও নীচু কায়েত নই। আমি ভেবে আশ্চর্য হচ্ছি রামতনুবাবু, কী করে ভরতবাবুর মত একরোখা জাতগর্বুটে মানুষ একেবারে বদলে গেলেন।

শুভ সংবাদটা জানিয়ে দিয়েই চলে গেলেন যুগলবাবু। রামতনুর মনে একটা বিস্ময়ের প্রশ্ন পাখির মিষ্টি স্বরের মত শব্দ ধরে বাজতে থাকে—মিঠুয়া জঙ্গলের সেই কোকিল ডাকা বিকালের আলো ও বাতাসের বিহ্বল প্রাণের ইচ্ছাটাই কি জয়ী হয়েছে? ভরতবাবুর মনের এতদিনের জাতমার্কা গর্বের তেতো বাধাটা কোকিল-ডাকা সেই বৈকালী বাতাসের মিষ্টি আবেশের ছোঁয়া লেগে সত্যিই কি একেবারে মিষ্টি হয়ে গলে গিয়েছে?

কিন্তু সাতটা দিন পার হতে না হতেই বুঝতে পারে রামতনু, পাখির ডাকের সব সংকেত মিথ্যে হয়েছে, ব্যর্থ হয়েছে। যুগলবাবু খুব বিষণ্ণ ও খুব হতাশ হয়েছেন। একটা বেনামী চিঠিকে হাতে করে নিয়ে এসে রামতনুর চোখের সামনে

রেখে দিলেন। বেনামী চিঠিটা বলছে, খুব সাবধান যুগলবাবু, ভরতবাবুর ছেলে মনোহরের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবার আগে একবার খোঁজ করে দেখবেন, মনোহরের শরীরে টি বি রোগের মত কোন ক্ষয়রোগ আছে কিনা।

যুগলবাবু চলে যাবার কিছুক্ষণ পরে ভতরবাবু এসে বেশ করুণ স্বরে কথা বলে—আপনার কাছ থেকে একটা পরামর্শ পেতে চাই রামতনুবাবু। এই যে, এই দেখুন, এই বেনামী চিঠির সব কথা বিশ্বাস করব কি করব না ?

ভরতবাবুর কাছে লেখা বেনামী চিঠিটা বলছেঃ আপনি কোন্ দুঃখে আপনার জাতের মান খোয়াবেন ? জাতের মান ও ধর্মের মান, দুই একই বস্তু। আশা করি, যুগলবাবুর মেয়ের সঙ্গে আপনার ছেলের বিয়ে দিয়ে আপনি ধর্মের মান খোয়াবেন না। তাছাড়া আরও একটা সন্দেহ করবার কথা আছে। যুগলবাবুর মেয়ে বোধ হয় এই বয়সেই ডাইন-বিদ্যার সব তুকতাক শিখে ফেলেছে। তা না হলে মনোহরের মত চমৎকার ছেলে যুগলবাবুর মেয়ের মুখের দিকে অমন করে তাকিয়ে থাকবে কেন ? দেখে মনে হয়, মনোহর যেন যুগলবাবুর মেয়ের চেহারটাকে পুজো করছে।

যুগলবাবু যে-কথা বলেছেন, ভরতবাবুও সেই কথা বলে চলে গেলেন—সন্দেহ করতে পারছি না, কে এই রকম বেনামী চিঠি লিখতে পারে। চিঠিটা সত্যি কথা বলছে, না মিথ্যে কথা বলছে, তাও যে বুঝে উঠতে পারছি না।

কয়েক দিনের মধ্যে ঘটনার লক্ষণ দেখে বুঝতে পারে রামতনু, বেনামী চিঠিরই জয় হয়েছে। যেমন যুগলবাবুর বাড়িতে, তেমনই ভরতবাবুর বাড়িতে বিয়ের কথা নিয়ে সামান্য কোন আলোচনার সাড়াও আর নেই। এই উদাস ও বিষণ্ণ পরিবেশের মধ্যে শুধু পরেশনাথের উৎফুল্ল হাসির শব্দটা যেন বিরাট এক পরিতৃপ্তির চিৎকার।

॥ চার ॥

পিউ কাঁহা, পিউ কাঁহা বলে ডাক দিয়ে এই ক'দিন ধরে উড়ে বেড়াচ্ছে যে পাখিটা, সেটা কী রকমের কোন জাতের পাখি ? সেটা কি চাতক জাতের কোন পাখি ? একটা পাপিয়া ?

যুগলবাবু বলেন একটা বেনামী চিঠিকে এত ভয় করবার কোন মানে হয় না, রামতনু। বিশ্বাস কর রামতনু পাপিয়াটাই ডেকে ডেকে আমাদের ভয় ভেঙে দিয়েছে। শুনলে আশ্চর্য হবে, আমাদের বিমলা নিজেই মুখ খুলে কথাটা বলে দিয়েছে, না, ভরতবাবুর ছেলে মনোহরের ভয়ানক রকমের কোন রোগ আছে বলে আমি বিশ্বাস করি না। তাছাড়া রোগ থাকলেই বা কী ?

শুনে চমকে ওঠে রামতনু—এরকম একটা অদ্ভুত কথা বলেছে আপনার মেয়ে ?

যুগলবাবু—হ্যাঁ। বিমলা এরকম কথা বলেছে বলে শুনতে পেয়ে ভরতবাবুও

বলে ফেলেছেন—জাত না ছাই। আমি জাতের মানের কোন ধার ধারি না····আরও সুখবর শুনুন, ভরতবাবুরা আজ আবার আসছেন, বিয়ের কথা একেবারে পাকাপাকি করে তাঁরা আজ বিয়ের দিনও ঠিক করে দিয়ে যাবেন।

কিন্তু আবার কে জানে কেন, বিয়ের কথা পাকাপাকি হয়ে যাবার পর আর কোন কথার সাড়া আর শোনা যায় না। আবার নীরব উৎসাহ আর অলস হয়ে গিয়েছে দুই বাড়ির প্রাণের সব উৎসাহ।

জানতে দেরি হয় না রামতনুর আবার এরকম একটা অবসাদের কারণ কী। হ্যাঁ, আবার দুই বেনামী চিঠির অভিযোগ এসে দুই বাড়ির উৎসাহে একেবারে স্তব্ধ করে দিয়েছে। দুই বেনামী চিঠির প্রায় একই রকমের অভিযোগ। ভরতবাবুকে বলছে বেনামী চিঠিটা—যুগলবাবুর মেয়ের চরিত্র বেশ গোলমেলে। খুব সাবধান, যুগলবাবুকে বলছে বেনামী চিঠিটা—ভরতবাবুর ছেলে মনোহরের একটি বে-আইনী স্ত্রী আছে, রামগড়ের বাজারের কাছে একটি বাসাঘরে সেই বে-আইনী স্ত্রীকে পুষে রেখেছে মনোহর।

বেশ কঠোর রকমের একটা উত্থান পতনের নাটক বলে মনে হয়। বেনামী চিঠির আঘাত এসে বিমলা ও মনোহরের দুই ভাগ্যের মিলনের আশা ছিন্ন করে দিয়েছে। আবার মিঠুয়া জঙ্গলের এক-একটা পাখির ডাকের মিষ্টি শব্দ যেন ভয়ানক এক ঠাট্টার আঘাত দিয়ে বেনামী চিঠির অভিযোগ গুঁড়ো করে দিচ্ছে।

বিয়ের দিন ঠিক হয়ে যাবার খবরটা পেয়ে ভ্যাংচি দেবার সেই অদৃশ্য আত্মাটা আবার বেনামী চিঠি ছাড়ে। এবার বেনামী চিঠির অভিযোগ শুধু ভরতবাবুর কাছে এসেছে। অভিযোগের কথা : একবার খোঁজ নিয়ে দেখবেন ভরতবাবু, যুগলবাবুর মেয়ে বিমলার সঙ্গে পরেশনাথবাবুর কোন গুপ্ত প্রেমের সম্পর্ক আছে কি নেই। ভয়ানক এই বেনামী চিঠিটা হাতে নিয়ে আর স্তব্ধ হয়ে বসে থাকেন ভরতবাবু। ভরতবাবুর স্ত্রী বারবার চোখ মোছেন, আর দেখে ভীরু ও করুণ স্বরে কথা বলেন—এ চিঠি পড়ে কি মনোহরের মন একেবারে ভেঙে পড়বে না? মনোহর কি বিমলার এই বদনামের কথাটাকে একেবারে তুচ্ছ করতে পারবে?

ডেকে উঠেছে একটা পাখি, বউ কথা কও। ভরতবাবুর বাড়ির কাছে মস্ত বড় শিমুলের ডালের উপর বসে পাখিটা ডাক ছাড়ছে। শুনতে পেয়েছে যুগলবাবুর বাড়ির সব মানুষ, শুনতে পেয়েছে রামতনু। শুনতে পেয়েছে পরেশনাথ।

রামগড় থেকে ফিরে বাড়িতে ঢুকতেই শুনতে পায় মনোহর, পাখিটা যে সত্যিই একবার স্পষ্ট করে আসন্ন এক শুভাগমনের কথা বলছে, বউ কথা কও। ঘরে ঢুকে ভরতবাবুর হাত থেকে বেনামী চিঠিটা তুলে নিয়েই পড়ে ফেলে মনোহর। চেঁচিয়ে হেসে ওঠে মনোহর। বেনামী চিঠিটাকে কুচি-কুচি করে ছিঁড়ে ফেলে দেয়।

সন্ধ্যা হতেই যখন ঝুরু ঝুরু বৃষ্টি শুরু হয়েছে আর গর গর করে মেঘ ডাকছে, তখন প্রায় উন্মত্তের মত ছুটে রামতনুর কাছে এসে চিৎকার করে পরেশনাথ—

শুনলাম, এই কিছুক্ষণ আগে যুগলবাবুকে খবর পাঠিয়েছেন ভরতবাবু. এই সোমবারেই তাঁরা যুগলবাবুর মেয়েকে আশীর্বাদ করতে আসবেন।

হেসে ফেলে রামতনু—তাই নাকি ? এ তো খুবই চমৎকার সুখবর। পাখি যখন ডাক দিয়ে বলছে, বউ কথা কও তখন তো বিয়ের কোন বাধাই আর থাকতে পারে না। যুগলবাবুর মেয়ে এইবার বউ মানুষ হয়ে যাবেই যাবে।

পরেশনাথ—আপনি কি সত্যিই বিশ্বাস করেন যে, বউ-কথা-কও পাখিটাই ডাক দিয়ে যুগলবাবুর মেয়েকে একেবারে।

রামতনু—হ্যাঁ, কোন সন্দেহ নেই, মনোহরের সঙ্গে যুগলবাবুর মেয়ে বিমলার এইবার বিয়ে হয়ে যাবেই যাবে। তাই বউ-কথা-কও পাখিটা ডাকছে।

যেমন আশীর্বাদের দিনে, তেমনই বিয়ের দিনেও সারা সন্ধ্যা বউ-কথা-কও পাখিটা ডাক দিয়ে উড়ে বেড়ায়। শাঁখের শব্দ ঢাকের শব্দ থামলেই শোনা যায়, পাখিটা ডেকে ডেকে যেন শুভলগ্নের আনন্দটাকে বিহ্বল করে দিচ্ছে। পরের দিন সকালবেলা শুভবিবাহিত বিমলা তার সুন্দর মুখ আর রঙীন সিঁথির শোভা সঙ্গে নিয়ে শ্বশুর বাড়িতে চলে যেতেই পাখিটাও কোথায় যেন চলে গেল। দেখে মনে হয়, সত্যিই যেন তার একটা সাধ পূর্ণ করে দিয়েই চলে গিয়েছে।

কিন্তু আবার কী আশ্চর্য, বিমলার ফুলশয্যারই দিনে একটা বেনামী চিঠি এসে ভরতবাবুর বাড়ির সবাইকে ভাবিয়ে তুলল। চিঠিটা বলছে, আপনি খুব ভুল করলেন ভরতবাবু। যে মেয়েকে ছেলের-বউ করে ঘরে নিয়ে এলেন, সে মেয়ের শরীরে অদ্ভুত একটা রোগ আছে। সে মেয়ে কোনদিন কখনও সন্তানবতী হবে না। বুঝে দেখুন, বিমলা ঠিক আপনার পুত্রবধূ নয়, একটা মিথ্যে মেয়েমানুষের চেহারা মাত্র। এখনও উপায় হতে পারে, এমন মেয়েকে আপনার ঘরে ঠাঁই না দিয়ে বিদায় করে দিন।

ডেকে ওঠে একটা পাখি। ভরতবাবু বেনামী চিঠিটাকে ছিঁড়ে ফেলে দিয়েই হেসে ওঠেন। সেই হাসির ছোঁয়াচ লেগে ভরতবাবুর বাড়ির সব মানুষের প্রাণ হেসে ওঠে ফুলশয্যার নেমন্তন্ন রক্ষা করতে কুটুম্বমানুষ যাঁরা এসেছেন, তাঁরাও হেসে ওঠে।

পাখির ডাকের শব্দ যুগলবাবুর বাড়ির কানেও পোঁছে যায়। যুগলবাবুর বাড়িতে হাসির হল্লা জাগে। পাখিটা ডাকছে, গৃহস্থের খোকা হোক্।

এই পাখির নাম হলদে পাখি। কেউ কেউ বলেন, বেনে-বউ। কী মিষ্টি এই হলদে পাখির স্বর। গৃহস্থের খোকা হবে, ভাগ্যের এই চমৎকার একটা অঙ্গীকার যেন হলদে পাখির রূপ ধরে নিয়ে ডাকাডাকি করছে। বেনামী চিঠির জঘন্য দংশন একেবারে ব্যর্থ করে দিয়েছে এই হলদে পাখির ডাক।

পরেশনাথও কি এই হাসির হল্লাটাকে শুনতে পাচ্ছে না ? পাচ্ছে বৈকি। দেখতে পায় রামতনু ঘরের বাইরে বারান্দার উপর একেবারে নিথর-নিঝুম একটা

মূর্তি হয়ে বসে আছে পরেশনাথ। পরেশনাথের চোখ-মুখের চেহারাটা বার বার যেন একটা বীভৎস আক্রোশের যন্ত্রণায় বীভৎস হয়ে উঠেছে। চোখের দুরন্ত দৃষ্টিটা যেন তাকেই খুঁজছে আর হাতের কাছে একবার পেতে চাইছে, যেন তার ইচ্ছা আর আশার দাবিটাকে এক রাত্রে একটুকুও সাড়া দিয়ে সম্মানিত করল না।

অনেক রাত্রে, যখন মিঠুয়া জঙ্গলের শেয়ালও যেন রাতের স্তব্ধতার মত নীরব হয়ে গিয়েছে, ঠিক তখন এমন এক পাখির গম্ভীর গলার স্বরে ভয়াল ভৎর্সনার বুলি বেজে উঠল, যে পাখিকে এর আগে এই মিঠুয়া জঙ্গলের কোন রাতের কোন অন্ধকারের মধ্যে গা-ঢাকা দিয়ে ডাক ছাড়তে শোনেনি রামতনু। ডাকছে একটা পেঁচা, তুই থুলি কি মুই থুলি? এটা যেন ভয়ানক এক অন্ধকারের বুক থেকে উৎসারিত একটা প্রশ্নের ডাক। শুনলে ভয় না করে পারা যায় না। বেচারা নিরীহ নিষ্পাপ মানুষগুলিও যখন এত ভয় পায়, তখন পাপকর্মের মানুষগুলির ভয় কত ভয়াবহই না হবে!

চিৎকারের শব্দ শুনে রামতনুর এত জমাট ঘুমও হঠাৎ ভেঙ্গে গেল। কে এইরকম ভীরু আর্তনাদের মত শব্দ করে চিৎকার ছাড়ছে?

বুঝতে পেরে আশ্চর্য হয় আর চমকে ওঠে রামতনু, চিৎকার করে ডাকছে পরেশনাথের ভয়ে-ভরাট বুকের যত থরথরে শিহর—শিগগির একবার আসুন রামতনুবাবু। দেরি করবেন না, এখনই আসুন। নইলে ওরা আমাকে মেরেই ফেলবে।

দৌড়ে গিয়ে দেখতে পায় রামতনু, পরেশনাথের ভয়াতুর শরীরটা কেঁপে কেঁপে মাটির উপর গড়াগড়ি দিচ্ছে। রামতনুকে দেখতে পেয়ে চেঁচিয়ে ওঠে—বাঁচান আমাকে বাঁচান, রামতনুবাবু।

—কিন্তু কী হয়েছে, কিসের ভয়ে এসব কথা বলছেন।

কোন জবাব দেয় না পরেশনাথ। এইবার একটু স্পষ্ট করে দেখতে পেয়ে রামতনুর দুই চোখে একটা সন্দেহের আগুন যেন দপ্ করে জ্বলে ওঠে। পরেশনাথের সাজটা অদ্ভুত, একটা গেঞ্জি আর ছোট একটা হাফ-প্যাণ্ট। পাটনাতে ধরা-পড়া একটা সিঁদেল চোরের গায়ে এই রকমের সাজ দেখেছিল রামতনু।

পরেশনাথের ভীতশিহরিত শরীরের একটা হাত খুব শক্ত কেরোসিন তেলে ভরা একটা টিনকে ধরে রেখেছে। একি এটা আবার কোন্ মতলবের বস্তু!

রামতনু গর্জন করে—কেরোসিনের ভরা টিন কেন?

পরেশনাথের দুই চোয়াল ঠক ঠক করে কাঁপে। পরেশনাথের জিভটাও তোতলা হয়ে যায়—ভরতবাবুর ঘরে আগুন লাগাবার জন্য।

রামতনু—কেন?

পরেশনাথ—বিমলাকে পুড়িয়ে মারবার জন্য।

রামতনু—কেন?

পরেশনাথ—বিমলা আমাকে অনেক অপমান করেছে। কতবার ডেকেছি, তবু কাছে আসেনি। মুখ ঘুরিয়ে সরে গিয়েছে।

পরেশনাথের চুলের ঝুঁটিকে শক্ত হাতের মুঠোর মধ্যে চেপে ধরে রামতনু।

—তারপর কী হল?

পরেশনাথ—বের হবার জন্য যে-ই এক পা বাড়িয়েছি, অমনি যমের ডাকের মত এই পাখিটার ডাক অন্ধকারের বুক কাঁপিয়ে সেই সঙ্গে আমারও বুকের সব পাঁজর কাঁপিয়ে দিল আপনি না এসে পড়লে এতক্ষণে আমি বোধ হয় মরেই যেতাম।

রামতনু—আপনার ঘরে অন্য যারা থাকত, তারা কোথায়?

পরেশনাথ—তাদের আমি সাতদিনের ছুটি দিয়ে সরিয়ে দিয়েছি।

চেঁচিয়ে কাঁদতে থাকে পরেশনাথ—আমি জানতাম না যে, পাখি এত ভয়ানক হয়। হ্যাঁ, কী বলছে পাখিটা?

পরেশনাথের চুলের ঝুঁটি আরও শক্ত করে ধরে নিয়ে কথা বলে রামতনু—বলছে তুই থুলি কি মুই থুলি!

পরেশনাথ—এ কথার মানেটা কি?

পরেশনাথের মাথাটাকে মেজের খুঁটির গায়ে ঠুকে দিয়ে কথা বলে রামতনু—মানে হল, তুই জিতলি কি মুই জিতলি?

মেজের মাটিতে মুখ ঘষে-ঘষে কাঁদতে থাকে পরেশনাথ। রামতনু বলে—কেঁদে আর কি হবে মশাই? আমি এখনই আমার কাছারির চাকরদের ডাক দিয়ে দড়ি আনতে বলবো।

উতলা হয়ে কাঁদতে থাকে পরেশনাথ—কেন স্যার?

রামতনু—দড়ি দিয়ে তোমাকে এখনই শক্ত করে বেঁধে রেখে দেব, যতক্ষণ না সকাল হয় আর পুলিস এসে পড়ে।

শ্রীমতী নিনা ভরদ্বাজ ও হরিণী

কবিরা কল্পনা করেছেন, কস্তুরী মৃগ আপন গন্ধে আকুল হয়ে বনে বনে ঘুরে বেড়ায়। এখানে এসে দেখতে পেয়েছে রামতনু, চিতল হরিণ আর হরিণীরা শালফুলের গন্ধে আকুল হয়ে বনে-বনে ছুটে বেড়ায়। এই মৌজার নাম ছতরপুরা, তাই জঙ্গলটাকেও ছতরপুরার জঙ্গল বলা হয়। এটা ঠাকুরসাহেবদের জমিদারী। গত বছরও এখানে প্রায় মাস তিনেক থেকে মৌজার খাজনা তসীল করেছিল রামতনু। প্রজাদের মধ্যে বেশীর ভাগই আদিবাসী, বাকি সব কৈরী আর কুর্মি। দেখে আশ্চর্য হয়েছিল রামতনু, কোন প্রজা নগদ টাকায় বকেয়া খাজনা শোধ করে দিতে পারল না। টাকার বদলে তারা মুর্গী দিয়ে আর ছাগল দিয়ে খাজনা শোধ করে দিয়েছিল। যার কাছে দু' টাকা দু' আনা বাকি, সে প্রজাও তিনটে ছাগল এনে তসীলদার রামতনুর হাতের কাছে ঠেলে দিয়ে বলেছিল, হেই, লে যা বাবু।

তসীল কাছারিতে জমা করা সেই মুর্গী ও ছাগলের বিপুল সম্ভার নিয়ে রামতনুর বিশেষ কোন দুর্ভাবনায় পড়তে হয়নি। কারণ দুই জবরদস্ত ব্যক্তির দুইজন চাকর এসে নগদ টাকা দিয়ে সব মুর্গী ছাগল কিনে নিয়ে গিয়েছিল। ফৌজদারী দাঙ্গার কাজে ওই দুই জবরদস্ত প্রতিদ্বন্দ্বীর দুই লাঠিয়াল দলকে পেট ভরে মাংস আর মদ খাওয়াবার দরকার হয়েছিল। যতদূর সাধ্য হিসেব করে খুব গরীব অবস্থার কয়েক শো প্রজাকে কিছু টাকা রিলিফ হিসাবে দিয়ে ফেলেছিল রামতনু। খবর পেয়ে এস্টেটের ম্যানেজার বেশ একটু অখুশি হয়ে চিঠি দিয়েছিল, দয়া ধরমকা মূল হ্যায়, নরক মূল অভিমান ঠিক কথা। ধর্মের মূল হল দয়া, আর নরকের মূল হল অহংকার—কিন্তু আপনাকে ওখানে দয়া আর খয়রাতি করবার জন্য আমরা পাঠাইনি। পাঠিয়েছি বকেয়া খাজনা পাই-পাই উসুল করতে।

এক বছর আগে সেদিন যে দুই জবরদস্ত মানুষ সব মুর্গী-ছাগল কিনে নিয়েছিল, তসীলদার রামতনু তাদের আজ আবার দেখতে পেয়েছে। দেখে আশ্চর্য হয়েছে : এ কি? এই দুজনই কি সেদিনের, এক বছর আগের সেই দুজন? সেই জগদীশ আর দিবানাথ? জগদীশের চওড়া বুকটা চুপসে এতটুকু হয়ে গিয়েছে। আর, দিবানাথের গায়ের দুধে আলতা রং পুড়ে কালচে হয়ে গিয়েছে।

সত্যিই তো, একটা নিতান্ত অভাবিত ও অকল্পিত ঘটনার দৃশ্য। এক বছর আগে কোন মুহূর্তেও রামতনু ভাবতে পারেনি যে একই জায়গাতে একই সতরঞ্চির ওপর পাশাপাশি বসে, ঠিক একই রকমের চেহারার দুটি শালু-বাঁধানো খাতার

ওপর প্রায় একই ভঙ্গীতে কলম চালিয়ে হিসেব লিখবে জগদীশ আর দিবানাথ। দানেশগঞ্জের সবচেয়ে বড় গোলাদার মহাজন ত্রিভুবন চৌধুরীর দুই অভ্রখনির আয়-ব্যয়ের হিসাব লেখবার চাকরি করছে জগদীশ আর দিবানাথ। বয়সে রামতনুর চেয়ে ওরা বড় হলেও খুব বেশী বড় নয়। ছোকরা তসীলদার রামতনুর বয়স এই বছরের মাঘ মাসে তেইশ পার হয়ে চব্বিশে পড়েছে। তবু ছতরপুরার তসীল কাছারির শুকদেববাবু ডাকেন, এ রামতনু, এ খোকাবাবু, আপনি কিন্তু ওই সাংঘাতিক দুই মানুষের সঙ্গে কখনও মেশামিশি করবেন না।

সে তো এক বছর আগেকার কথা। যখন ওরা সাংঘাতিক ছিল। আজ সেই দুটি মানুষকে দেখে একটুও সাংঘাতিক বলে তো মনে হয় না। এক বছর আগে অবশ্য মনে হয়েছিল যে, জগদীশ ও দিবানাথ, দানেশগঞ্জের দুই বড়লোকের দুই ছেলে যেন ভূতে-পাওয়া দুটি উন্মাদ। একদিন হঠাৎ কোথা থেকে ঘোড়া ছুটিয়ে ছতরপুরার তসীল কাছারীর সামনে এসে থেমেছিল জগদীশ। সঙ্গে একটা ভয়ানক রকমের জনবল। পঞ্চাশজন মানঝিকে মদ খাইয়ে মাতাল করে দিয়েছে জগদীশ। মানঝিদের হাতের টাঙি ফল্‌সা আর তীরধনুকও যেন মাতাল হয়ে টলছে ঢলছে আর কাঁপছে। চেঁচিয়ে ডাক দেয় জগদীশ, আমাকে এখুনি গোটা দশেক ভাল লাঠিয়াল যোগাড় করে দিতে পারেন তসীলদারজী?

দেরী করে না জগদীশ, রামতমুর জবাবের অপেক্ষায় না থেকে ছুটতে থাকে আগে আগে ঘোড়সওয়ার জগদীশ, পিছনে মারকুটে জনবল! দিবানাথের একটা সম্পত্তি, চুপরাতু নামে জঙ্গলটার ভিতরে একটা অভ্রখনিকে দাঙ্গাকরে আজ দখল করবে জগদীশ।

সাতদিন পর ঠিক এই রকমই একটি দৃশ্য। দানেশগঞ্জ থেকে একদল গোয়ালা লাঠিয়াল, আর একদল রাজপুত জাতের লাঠিলাল সঙ্গে নিয়ে ছুটে এসেছিল দিবানাথ। চেঁচিয়ে ডাক দিয়েছিল, এ ভাই তসীলদার, কিছু লোক দিতে পারবেন? ফাটাফাটি করতে পারবে, এ রকম বিশ-ত্রিশজন মজবুত লাঠিবাজ?

রামতনু: কোথায় যাচ্ছেন আপনি?

দিবানাথ: যাচ্ছি চান্দুয়া।

রামতনু: কেন?

দিবানাথ: জগদীশের সম্পত্তি ওই চান্দুয়া জঙ্গলটাকে আমি আজ আগুন লাগিয়ে পোড়াব। আর চান্দুয়া খাদের সব অভ্রও লুটে নেব। কী ভেবেছে মোক্তারের বাচ্চা জগদীশ? উকীলের ছেলে দিবানাথ বুঝি ফৌজদারী করতে জানে না? শুনে রাখুন রামতনুবাবু, আমি ওকে কোনদিনও ক্ষমা করতে পারব না। আমার গায়ে যতদিন এক ফোঁটাও রক্ত থাকবে, ততদিন আমি ওর সর্বনাশ করতেই থাকব।

জগদীশের সম্পত্তি চুপরাতুর জঙ্গল আর খাদ যেমন দিবানাথের দলবলের

হামলায় দিবানাথের সম্পত্তি ওই চান্দুয়ার জঙ্গল আর খাদও তেমনই জগদীশের দলবলের হামলায় তছনছ হতে হতে তিন মাসের মধ্যে নিদারুণ রকমের একটা হতশ্রী অস্তিত্ব হয়ে পড়ে রইল।

ছতরপুরার জঙ্গলের শাল আজ ফুলে ফুলে ভরে গিয়েছে, কিন্তু সত্যিই যে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, আজকের চান্দুয়া জঙ্গল ও চুপরাতু জঙ্গলের কোন শালে ফুল ফোটেনি।

শুকদেববাবু বলেন, শুধু দুটো শাল জঙ্গলকে নয়; ওরা নিজেদের দুটো জীবনকেও একেবারে নিষ্ফুল করে দিয়েছে।

জগদীশ আর দিবানাথের মধ্যে কে একটু বেশী এবং কে একটু কম এমনতর তুলনা বোধহয় সম্ভব নয়। আজ তো কোন তুলনাই চলে না, দুজনে যেন একই কঠোর অদৃষ্টের একটা পাথরের ওপর আছড়ে পড়েছে ও একাকার হয়ে গিয়েছে। কিন্তু সেদিন, এক বছর আগেও কি ওদের দুজনের মধ্যে কোন প্রভেদ ছিল?

না, ছিল না, ওরা দুজনেই পাটনা কলেজের ছাত্র। দুজনেই বি. এ. পরীক্ষায় ফেল করে একই দিনে দানেশগঞ্জে ফিরে এসেছিল।

জগদীশের মোক্তার বাবা ছেলেকে অত্যন্ত ভালবাসেন। দিবানাথের উকীল বাবাও ছেলেকে অত্যন্ত ভালবাসেন। দানেশগঞ্জের সবাই জানে, দিবানাথ আর জগদীশ দুজনেরই টাকার অভাব হয় না। দুই বড়লোক বাবা দুই ছেলেকে তাঁদের ব্যাংকের আমানতের টাকা ইচ্ছা মত তোলবার অধিকার দিয়ে দিয়েছেন। দুজনেই বাপের এক ছেলে তাই খুব আদুরে ছেলে।

শুকদেববাবু, ছতরপুরা তশীল কাছারীর ভাণ্ডারীজী বলেছেন, সত্যি, বিশ্বাস কর রামতনু, দানেশগঞ্জের এই দুই নওজোয়ানের মধ্যে বড়ই অন্তরঙ্গতা ছিল। একবার ওরা ঠিক করেই ফেলেছিল যে, দুজনে বিশ হাজার টাকার মূলধন নিয়ে একটা তেলকল বসাবে—দিবানাথের দশ হাজার ও জগদীশের দশ হাজার। একটা মেশিন কোম্পানিকে বায়না করবার জন্য দুজনের একসঙ্গে কলকাতা যাবার দিনও ঠিক হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু……।

কিন্তু হঠাৎ একটা নতুন রকমের ঘটনা যেন চমৎকার এক মায়াময় হাসির গুঞ্জন তুলে দুজনেরই কলকাতা যাবার সংকল্পটাকে একেবাকে বিবশ করে টলিয়ে দিল। শুকদেববাবু গল্প করতে গিয়ে বলেছেন, হ্যাঁ রামতনু, একটি সুন্দরী মেয়ের সুরেলা হাসির মিষ্টি শব্দ শুনে ওদের দুজনের প্রাণ উতলা হয়ে গেল।

রেলওয়ের এক রিটায়ার্ড অফিসার, মিস্টার ভরদ্বাজ, কে জানে কোথা থেকে এসে দানেশগঞ্জের একটি বাড়ির ভাড়াটিয়া বাসিন্দা হতেই জগদীশ আর দিবানাথের বন্ধুত্ব ভয়ানক রকমের বিচ্ছেদে পরিণত হয়ে গেল। ট্রেজারির খাজাঞ্চীবাবুর কাছ থেকে দাশগঞ্জের সব উকীল মোক্তার সেই চমৎকার জ্ঞাতব্য তথ্যটি জেনে নিতে পেরেছিলেন। কত টাকা পেনসন পান মিস্টার ভরদ্বাজ? মোটে একশো দশ টাকা।

তবে তিনি আর কি এমন মিস্টার? তবে ধুতি কোর্তার বদলে এত প্যান্ট-শার্টই বা পরবার অভ্যাস কেন? দুটো চাকর আর একটা বাবুর্চিই বা কেন? একশো দশ টাকা পেনসনের জোরে কি এ রকম স্টাইল করে দিন যাপন করা চলে? বাড়ি ভাড়াই তো পঁয়তাল্লিশ টাকা দিতে হয়। একটা উড়ো খবর ওদের কাছে পৌঁচেছে। মিস্টার ভরদ্বাজ নাকি গয়াতে দোকানীদের কাছে পাঁচ হাজার টাকা ধার রেখে দিয়ে হঠাৎ একদিন চুপচাপ এই দানেশগঞ্জে চলে এসেছেন।

শুকদেববাবু যে কথা বলেছেন, সেটা শুনতে অবিশ্বাস্য রকম বলে মনে হলেও সত্যি কথা, নিরেট বাস্তব অথচ অদ্ভুত এক ঘটনার কথা। মিস্টার ভরদ্বাজের মেয়ে, যার নাম নিনা ভরদ্বাজ, লক্ষ্ণৌ এর কোন এক কলেজের পড়া শেষ করে যে মেয়ে সেদিন দানেশগঞ্জে এসে প্রথম দিনই একটা সাড়া জাগিয়েছিল, সেই মেয়ের মুখের সুরেলা হাসির গুঞ্জনের চেয়ে চোখ মুখের চেহারাতে বুঝি অনেক বেশী মধুরতা ছিল।

ছোট একটি মহকুমা শহর হল এই দানেশগঞ্জ, যার চারদিকে জঙ্গল আর পাহাড়ের বলয়। এ হেন ছোট শহরে যদিও বড় বড় কারবারের সাড়া ও বস্তুতা আছে, কিন্তু নিনা ভরদ্বাজের মত সুহাসিনী মেয়ে, সুন্দরী মেয়ে ও মিষ্ট সৌজন্যের মেয়ে একটিও নেই।

বাড়ির সামনের পথ দিয়ে জগদীশ আর দিবানাথকে একসঙ্গে হেঁটে যেতে দেখে নিনা যেন হঠাৎ খুশির আবেগে চঞ্চল হয়ে হেসে উঠেছিল আর ডাক দিয়েছিল, শুনেছেন? আপনারা কি কখনও পাটনাতে ছিলেন?

হঁ্যা, ছিলাম বইকি। কিন্তু কেন এ কথা জিজ্ঞাসা করছেন?

জামালপুরের টেনিস চ্যাম্পিয়ন মোহন ভরদ্বাজকে চেনেন কি?

না।

মোহন ভরদ্বাজ আমার খুড়তুতো দাদা। যাই হোক, আমাদের এখানে একটু চা খেয়ে যেতে কি আপনাদের কোন আপত্তি আছে? গায়ে পড়ে কথা বলছি বলে কিছু মনে করবেন না। মনের সুখে দুটো কথা বলব কিম্বা দু'মিনিট বসে মন খুলে একটু গল্প করব, এ রকম সোসাইটি তো এখানে পাচ্ছি না। কী যে অস্বস্তি হচ্ছে কি বলব!

নিনা ভরদ্বাজের বাড়িতে সেদিন দুই বন্ধু একটা টেবিলে পাশাপাশি বসে চা খেয়েছিল, তারপর এই দানেশগঞ্জের কেউই কোনদিন দুই বন্ধুকে একসঙ্গে দেখতে পায়নি, যারা ছিল দুই বন্ধু তারা হয়ে গেল দুই শত্রু। দানেশগঞ্জের ভদ্রলোকরা খুব বিরক্ত আর উদ্বিগ্ন হয়ে ভাবছেন, ছেলে দুটোর কি সত্যই মাথা খারাপ হয়েছে? মিস্টার ভরদ্বাজের মেয়েটা কি ওদের তুক করেছে?

এক মাসের মধ্যে নিনা ভরদ্বাজের প্রাণটা যেন নিগূঢ় অনুরাগের জটিল এক দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়ে গেল বুঝি। দুজনকেই সমান আবেগে ভালবেসে ফেলেছে নিনা।

তাই প্রশ্নটা হল, কাকে রাখবে ও—কাকে ছাড়বে নিনা? দিবানাথ আর জগদীশ সপ্তাহের মধ্যে অত্যন্ত দুটো ভিন্ন ভিন্ন দিনে এ বাড়িতে আসে। আর চা খেয়ে ও নিনার গলার গান শুনে চলে যায়। মিস্টার ভরদ্বাজ অন্য ঘরে বসে নিনার গানের সঙ্গে তাল রেখে আস্তে আস্তে হাততালি দিতে থাকেন। এবং নিনার আন্টি হন যে প্রৌঢ়া মহিলা, তিনি মিস্টার ভরদ্বাজের কাছে দাঁড়িয়ে মৃদু-মৃদু হাসেন।

দিবানাথ যেমন এখানে একাই আসে, জগদীশও তেমনই একাই আসে। নিনার অভ্যর্থনার আর সৌজন্যের মধুর স্বাদ সব যেন পান করে নিয়ে ওরা চলে যায়।

খোঁজ নিয়ে জানতে পারলেন দিবানাথ আর জগদীশের দুই উদ্বিগ্ন ও আতঙ্কিত পিতা, ব্যাঙ্কের জমা টাকার হিসেবটা ক্ষীণ হতে হতে প্রায় নিশ্চিহ্ন হতে চলেছে। কোন সন্দেহ নেই, নিনা ভরদ্বাজ নামে ওই রূপসী মেয়েটার যত সাধ শখ আর ইচ্ছে ডাকিনীর পিপাসার মত ওই দুই ছেলের কাণ্ডজ্ঞানকেও শুষে নিয়েছে। কি মনে করেছে ওরা, ওই মেয়ে ওদের দুজনের একজনকেও বিয়ে করবে?

বাবার সন্দেহের ভাষাটা একদিন একটু বেশী সরব হয়ে কানে পৌঁছতেই হেসে ফেলেছে দিবানাথ। দিবানাথ ভাল করেই জানে, সে নিনার চোখের জল দেখেই বুঝে নিয়েছে, নিনা তাকে ভালবেসে ফেলেছে। নিনার ভালবাসাকে নয়, জগদীশের মতলবটাকে সন্দেহ করে দিবানাথ। জগদীশও তেমনই নিনার অনুরাগের হৃদয়টাকে নয়, ওই দিবানাথের অভিসন্ধিকে সন্দেহ ও ঘৃণার আবেগ এইবার যেন একটা জ্বালাময় প্রদাহ নিয়ে ফেটে পড়বে।

তাই হল। নিনা ভরদ্বাজ যেদিন একটু গম্ভীর আর বিষণ্ণ হয়ে, রুমাল দিয়ে সুন্দর মুখের আধখানা ঢেকে নিয়ে দিবানাথের সামনের চেয়ারে বসে রইল, সেদিন দিবানাথের বুকের পাঁজর যেন একটা দুর্যোগের আভাষ পেয়ে থরথর করে কেঁপে উঠল। নিনা বলে, আমি ভেবে রেখেছিলাম তিনমাসের জন্য একবার লণ্ডন বেড়িয়ে আসবার পর এই জীবনের আর প্রাণের সবচেয়ে সুন্দর ইচ্ছাটার একটা হেস্তনেস্ত করে ফেলব।

কি বললে? হেস্তনেস্ত? তার মানে?

নিনা হেসে ফেলে।—তার মানেটা যদি না তুমি বুঝতে পারো, তবে কে আর বুঝবে? তুমি ছাড়া…।

দিবানাথ: তিন মাসের জন্য লণ্ডন বেরিয়ে আসতে কত টাকা লাগবে?

নিনা: কত আর লাগবে? বড় জোর পাঁচ হাজার।

দিবানাথ: কিন্তু…।

নিনা: না না, তুমি টাকার কথা ভেবে মন খারাপ করো না। যে করেই হোক, আমার বিলেত যাবার ওই সামান্য টাকাটা যোগাড় হয়েই যাবে।

বুঝতে এবং সন্দেহ করতে দেরি হয় না দিবানাথের, হতভাগা জগদীশ, শত

চেষ্টা করেও যে নিনার ভালবাসার একটি ছিটেফোঁটাও পাননি, সে এইবার সুযোগ বুঝে পাঁচটি হাজার টাকা এনে নিনার হাতে তুলে দিয়ে নিনার বিলেত বেড়াবার স্বপ্নটাকে সত্য করে দিতে সাহায্য করবে।

ঠিক এই রকম সন্দেহ ও দুর্ভাবনা নিয়ে, ঠিক একই রকম যুক্তি দিয়ে জগদীশও বুঝেছে, দিবানাথ এইবার পাঁচটি হাজার টাকা নিনাকে উপহার দিয়ে নিনার প্রাণের কৃতজ্ঞতা কিনে ফেলবে। না, নিনাকে এ রকম একটা ভুল পথে চলবার সুযোগ দেবে না জগদীশ। কি করে জগদীশ ভুলতে পারে যে, এই সেদিন জগদীশের চোখের কত কাছে মুখটা এগিয়ে দিয়ে কথা বলেছিল নিনা : তুমি কি আজও কিছু বুঝলে না ?

জগদীশ : বুঝেছি, কিন্তু তুমি যদি একেবারে স্পষ্ট করে না বল তবে আমি কি করে বাবার কাছে বলতে পারব যে, আমার সঙ্গে তোমার ··· ।

নিনা : চুপ চুপ! এত তাড়াতাড়ি ও কথাটা বলে ফেলতে নেই। যখন জানো যে নিনা তোমাকে··· ।

দেখতে পায় জগদীশ, নিনার দু'চোখের কোণে দু'ফোঁটা জল চিকচিক করছে।

এইবার শুরু হল দুজনের যত ভূসম্পত্তি বিক্রি করে দেবার মারাত্মক প্রতিযোগিতা। বিক্রি করতে কোন অসুবিধে নেই। দুই ছেলের দুই বাপ রাগ করে জমিজমা বিক্রী করবার অনুমতি লিখে দিয়ে কাশী চলে গিয়েছেন।

কিন্তু কি অদ্ভুত দুরদৃষ্ট, দুজনের কারও হাতে পাঁচটি হাজার টাকা এল না। গোলাদার ত্রিভুবন চৌধুরী দুজনের দুই ভূ-সম্পত্তির দাম হিসাবে দুজনের প্রত্যেককে তিন হাজার টাকার এক পয়সাও বেশি দিলেন না।

দুজনেই শুভলগ্ন বুঝে ভিন্ন ভিন্ন দুটি দিনে নিনা ভরদ্বাজের বাড়িতে গিয়ে নিনার হাতে তিন হাজার টাকা তুলে দেয়।—আরও একটু সবুর কর নিনা। বাকি দুই হাজার···।

হেসে ফেলে নিনা।—হ্যাঁ হ্যাঁ, বুঝেছি। আর বেশি বলতে হবে না। আমি সবুর করব, কিন্তু তুমি দুশ্চিন্তা করো না।

জগদীশ ও দিবানাথ, দুই শত্রুর উতলা মনের বাতাস এইভাবে নিনা ভরদ্বাজের কথার এক একটি আবছা ইঙ্গিতেই শান্ত হয়ে যায়।

এর পরের অধ্যায়টা হল দুই প্রতিযোগী ভালবাসার দুরন্ত এক ফৌজদারী মত্ততার অধ্যায়। এক বছর আগে দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর, এই দুরন্ত মত্ততারই কিছু দৃশ্য দেখেছিল রামতনু। টাকা নেই, টাকা সংগ্রহও আর সম্ভব নয়। নিনা ভরদ্বাজের কাছে গিয়ে দাঁড়াবার সাহসটাই যেন ভীরু হয়ে জগদীশের চওড়া বুকের ভিতরে লুকিয়ে পড়েছে। টাকার চিন্তায় দিবানাথের চেহারার দুধে-আলতা রংটা দিন দিন শুকিয়ে আর গুঁড়ো হয়ে ঝরে পড়ছে।

ফৌজদারী মত্ততার কাণ্ডটা যেন টাকা যোগাড় করবার একটি করুণ অক্ষমতার

বিদ্রোহ। কিংবা অক্ষমতার একটা আক্রোশ। কেউ কাউকে ইহজীবনে ক্ষমা করতে পারবে না। ক্ষমাহীন এই আক্রোশ। ফৌজদারী করে দুজনের অদৃষ্টকে শেষে সর্বনাশের টাঙি, লাঠি ও তীরধনুক দিয়ে ছিন্নভিন্ন করে জয়ী হবার স্বস্তি ও শান্তি পেতে চাইছে।

শুকদেববাবু বলেন, বাস্, এখন ফৌজদারী মেজাজের সব আগুন ঠাণ্ডা। দুজনের এখন যে দশা হয়েছে, তা তো দেখতেই পাচ্ছ। ত্রিভুবন চৌধুরীর উকীল নোটিশ দিয়ে দুজনকে সাবধান করে দিয়েছিল। ভুলে গিয়েছ কেন যে, চুপরাত্তু আর চান্দুয়ার দুই জঙ্গল ও দুই খাদ এখন আমার সম্পত্তি। সাবধান, কোনদিন আমার ওখানে গিয়ে কোন রকম হামলাবাজি করলে আমি মামলা দায়ের করব।··· কি অদ্ভুত দশা, ওরা আজ ত্রিভুবন চৌধুরীর মাইনে করা কেরাণী হয়ে সেই দুই খাদেরই লাভ লোকশানের হিসেব লিখছে, যে দুই খাদ একদিন ওদেরই সম্পত্তি ছিল।

॥ দুই ॥

ক'দিন ধরে অনেকবার একটা দুরন্ত চঞ্চলতার দৃশ্য রামতনুর চোখে পড়ছে। ছতরপুরার জঙ্গলের হরিণ আর হরিণীরা চঞ্চল হয়েছে। এরা সবাই চিতল হরিণ, কোন কোন কবির মতে চিত্রা হরিণ। একদিন তসীলের কাজে বের হয়ে জঙ্গলের পথে যেতে যেতে হঠাৎ থমকে দাঁড়ায় রামতনু। দু'চোখের দৃষ্টি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। ওই তো, একটা ডুমুর গাছের তলায় সবুজ ঘাসের ওপর গলা এলিয়ে দিয়ে কি শান্তি আরামের ঘুম ঘুমোচ্ছে একটা হরিণী। কবি কালিদাস নিজের চোখে এ রকম একটা দৃশ্য দেখেছিলেন, তাই লিখেছেন ঃ নবীন শাদ্বলের উপর শায়িতা নির্মীলিতাক্ষী হরিণী।

ভেলাডিহিতে থাকতে কতবার দেখতে পেয়েছে রামতনু, চিতল হরিণ আর হরিণীর দল কচি শালের পাতা ছিঁড়ে খাচ্ছে, মাহাতোদের মকাই ক্ষেত তছনছ করছে। কিন্তু এই হরিণীটার গায়ের ছোপের মত এত ছোট ছোপ কোন হরিণ বা হরিণীর গায়ে কখনও দেখতে পায়নি। এই হরিণীর গায়ের ছোপগুলি যেন ছোট ছোট সাদা সাদা তারার আকারের ছবি। কে জানে কবে কোন্ এক কাঁটার সঙ্গে ঘষা লেগে হরিণীটার পেটের চামড়ার ওপর লম্বা একটা আঁচড় পড়েছিল। কাটা দাগের মত সেই আঁচড়ের লম্বা দাগ। হরিণীর পেটের ছোট ছোট তারা আকারের অনেকগুলি ছোপকে দু'ফালি করে কেটে দিয়েছে।

চমকে উঠল হরিণীটা। এক লাফ দিয়ে জঙ্গলের হাজার গাছের ভিড়ের মধ্যে উধাও হয়ে গেল।

খুব ভোরে শুকদেববাবু ডাক দিয়ে রামতনুর ঘুম ভাঙিয়ে দিলেন।—শুনছ

তসীলদার? একটা অদ্ভুত শব্দ কি শুনতে পাচ্ছ? খট্‌খট্‌ ঠোকাঠুকি শব্দ?

রামতনু: হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি।

কিসের শব্দ বল তো?

কী করে বলি? বুঝতে পারছি না।

জঙ্গলের এক সুন্দরী হেলেনের দুই দাবিদার প্রেমিকের যুদ্ধ বেধেছে।

হেলেন তো একজনের বিবাহিত স্ত্রী ছিল।

ছিল তো ছিল। এখানে হেলেনকে এখনও কেউ বিয়ে করেনি। দুজনই হেলেনকে বিয়ে করতে চায়। কাজেই মারামারি শুরু হয়েছে।

কী ব্যাপার? কী বলতে চাইছেন শুকদেব? কট্‌কট্‌ ঠোকাঠুকির শব্দটা তো খুবই নিকটের শব্দ বলে বোধ হচ্ছে। মনে হচ্ছে খেজুর আর বাঁশের দুই ভিড়ের মাঝখানে চোরকাঁটায় ভরা যে ছোট্ট এক টুকরো খোলা জমি আছে, সেই দিক থেকে শব্দটা আসছে।

শুকদেববাবু বললেন, চলুন, এখনই গিয়ে একবার দেখে আসি। কিন্তু খুব সাবধানে পা টিপে টিপে হাঁটবেন।

চোরকাঁটায় ভরা ছোট্ট এক টুকরো ফাঁকা জমির ওপর বিচিত্র এক ফৌজদারী দৃশ্য। দুই চিতল হরিণ, তাদের দুই মাথায় প্রকাণ্ড দুটি শিং এর ঝাড়। দুরন্ত আক্রোশের আবেগে ক্ষিপ্ত হয়ে দুই হরিণ মারামারি করছে। শিং-এ শিং-এ সংঘর্ষের উৎকট শব্দ বেজে উঠছে, কট্‌কট্‌ পট্‌পট্‌ কটরু।

শাল আর জংলী কদমের ছোট একটা ভিড়ের আড়ালে একটা পাথুরে টিলার ওপর দাঁড়িয়ে দৃশ্যটাকে বেশ স্পষ্ট করে দেখতে পাওয়া যায়। শুকদেব বলেন এইবার ওই দিকে দেখ। মহুয়াটার তলায় ওটা কে দাঁড়িয়ে আছে? একজন হেলেন সুন্দরী নয় কি?

খুব ভুল কথা বলেননি শুকদেব। কিন্তু দেখে আশ্চর্য হয়, যাকে হেলেন বলছেন শুকদেব, সে তো রামতনুর নিতান্ত অচেনা কোন হেলেন নয়। সেই চিতল হরিণীটা, যার গায়ের ওপর ছোট ছোট তারার আকারের ছোপ আর পেটের ওপর লম্বা একটা কাটা দাগ। সেই হরিণী একটু দূরে, ফাঁকা জমিটার শেষ প্রান্তে একটা মহুয়ার গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে আছে। একটি চরম ঘটনার অপেক্ষায় যেন সময়ের মুহূর্তগুলিকে প্রাণের সব কৌতুহল দিয়ে গুনছে আর দেখছে হরিণীটা, তার প্রণয়ের দুই দাবিদারের মারাত্মক হানাহানির দৃশ্য। পরাজিত হয়ে, ভীত হয়ে, হতাশ হয়ে এক দাবীদার পালিয়ে গেলে তবেই নিষ্পত্তিময় শান্তি দেখা দেবে। জয়ী হরিণের সঙ্গিনী হয়ে চলে যাবে হরিণী।

না, আর কতক্ষণ? দুই হরিণের মারামারি শিগগির থামবে বলে মনে হয় না। ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলে গিয়ে ওরা সকাল সন্ধ্যা ও রাত্রির সব মুহূর্তকে উদ্বিগ্ন করে লড়তেই থাকবে।

ঘরে ফেরবার পথে চলতে চলতে শুকদেব বলেন, আগে রাগ করে বলতাম, এখন বলতে গিয়ে বেশ দুঃখ হয়, রামতনু। জগদীশ আর দিবানাথ, দুটো ভাল ছেলে একটি মেয়েকে ভালবেসে কী ভুলই না করেছিল!

রামতনু হাসে।—যত কাব্য নাটক নভেল আছে, তার মধ্যে তো এই একই ব্যাপার শুকদেববাবু। ভালবাসাবাসির সব গল্পের শতকরা নব্বইটা গল্পই তো এই রকমের একটি মেয়ের জন্য ভালবাসার দুই দাবিদারের ঠোকাঠুকির গল্প।

জগদীশ আর দিবানাথের জন্য শুকদেব যেমন দুঃখ কষ্ট করেন আজ সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত রামতনুর আনমনা চিন্তার মধ্যে ওই রকম একটা দুঃখের ছোঁয়া লেগে থাকে, ছোঁয়াটা সামান্য হলেও তার মধ্যে কেমন যেন বেদনা আছে।

ছোড়দি চিঠি লিখেছেন, ভাই—তুমি কি চিরকাল বনবাসী হয়েই থাকবে? বিয়ে করবে না? লক্ষ্মী ভাইটি, একটিবার কি বনের মায়া ছেড়ে দিয়ে এখানে আসবে, আর আমার খুব চেনা একটি সুন্দর মেয়েকে দেখে যাবে? পছন্দ না হয় ইচ্ছে না হয়, বিয়ে কর না। বিয়ে না করতে তো কোন বাধা নেই, অসুবিধে নেই। কিন্তু একবার এসে অন্তত মেয়েটাকে একটু দেখে যাও।

মনে মনে ছোড়দির চিঠির জবাব দেয় রামতনু।—যতই প্রশংসা কর, তোমাদের চেনা-শোনা মেয়েরা তো দানেশগঞ্জের নিনা ভরদ্বাজেরই মত মেয়ে, এককাঠি বেশী কিংবা এককাঠি কম।

একটির পর একটি দিন পার হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু ছতরপুরার জঙ্গলের শালফুলের গন্ধ যেমন থামছে না, ওই দুই হরিণের মারামারির শৃঙ্গ-সংঘর্ষের শব্দও তেমনই থামছে না। শালফুলের গন্ধ যেমন বাতাসে ভেসে বেড়ায়, দুই হরিণের এই মারামারির শব্দটা না হোক, খবরটা যেন তেমনই জঙ্গলের বাতাসে ভেসে অনেক গাঁ ও ডিহির কানে পৌঁছে দিয়েছে।

প্রায়ই দেখা যায়, লোকের দল ব্যস্ত হয়ে ছতরপুরার তসীল কাছারীর কাছে এসে দাঁড়িয়েছে, শব্দ শুনছে। তারপর ব্যস্ত হয়ে শব্দেরই দিকে ওরা ছুটে যায়। দুই হরিণের মারামারির দৃশ্য দেখে নিয়ে ওরা আবার ফিরে যায়। একদিন দুজন চেনা মানুষকে আসতে দেখে চমকে ওঠে রামতনু। কিন্তু ঠিক বুঝতে পারে না, জগদীশ আর দিবানাথকে আসতে দেখে কেন চমকে উঠেছে।

এই ভাই রামতনু, ভাই তসীলদার, কোথায় কোন্ দিকে দুই হরিণের লড়াই চলছে সাত দিন ধরে?

আরো রোগা হয়ে গিয়েছে জগদীশ আর দিবানাথ। গায়ের জামাতে তালি, বেশ ময়লা জামা। এবং দুজনের ভাবভঙ্গীর রকম দেখলেই বোঝা যায়, দুজনের মধ্যে বন্ধুত্বের ছিন্ন ডোর জুড়ে গিয়ে আবার একটা অন্তরঙ্গতার চমৎকার রাখী-ডোর হয়ে উঠেছে। জগদীশ তার মুখের জলন্ত সিগারেটের চেহারাটা পাঁচ টানে অর্ধেক পুড়িয়ে দিবানাথের হাতে তুলে দেয়। দিবানাথ সেই সিগারেটের ধোঁয়া টেনে মুখে আর

বুকে যেন বন্ধুত্বের নতুন একটা সুখের স্বাদ পায়।

দুই হরিণের যুদ্ধ দেখবার জন্যে উৎসুক দর্শকের সমাগম ক্রমেই ক্ষীণ হয়ে আসতে থাকে। বারো-তের দিন তো হয়ে গেল। কী ব্যাপার শুকদেববাবু? এ কেমন মারামারি? এখনও তো মারামারি থামছে না।

চমকে ওঠেন শুকদেব।—তবে তো মরেছে?

কি বললেন?

এবার ওদের দুজনেরই মরণ ছাড়া নিষ্পত্তি হবে না।

ঠিকই, ভুলই সন্দেহ করেনি শুকদেব। পাথুরে টিলাটার ওপর শুকদেবের পাশে দাঁড়িয়ে একটা নিদারুণ নিষ্ঠুর-করুণ দৃশ্য দেখতে পায় রামতনু। দুই হরিণের শিং-এ শিং-এ এমনই জড়াজড়ি হয়েছে যে, দুই মাথার শত ঝাঁকুনি আর টানা-টানিতেও খুলছে না। মারামারি করবার সেই বিকট উত্তেজনা আর নেই। দুই হরিণের দুই জোড়া ডাগর চোখে দুঃসহ একটা ভয় যেন স্তব্ধ হয়ে রয়েছে। দুই মাথার দুই শিং-এর ঝাড়ে এইবার যে গিঁট পড়েছে, সেটা নিষ্ঠুর এক মৃত্যুরই গিঁট ওদের পক্ষে সরে যাওয়া কিংবা পালিয়ে যাওয়া এখন অসম্ভব। এইবার ওদের দুই জীবনের চরম অন্তিম জঙ্গলে ওই ছোট্ট ফাঁকা জমিটার চোরকাঁটার ওপর লুটিয়ে পড়বে।

শুকদেব বলেন, আমারও মনে হয়, আর আশা নেই। ওদের শিং-এর গিঁট আর খুলবে না, ঢিলেও হবে না। আর দশটা দিনের তেষ্টাও সহ্য করবার ক্ষমতা ওদের আছে বলে মনে হচ্ছে না। ওরা মরবে। মরতে বাধ্য।

কিন্তু কই? মহুয়া গাছের গা ঘেঁষে সেই সুন্দরী হেলেন তো নেই! চলে গিয়েছে হরিণীটা। শুকদেব বলেন, হরিণীটা তো বুঝতেই পেরেছে যে, ওর প্রেমের দুই দাবিদারের মরণ ঘনিয়ে এসেছে।

॥ তিন ॥

মাঝরাতে বাঘের ডাক শুনতে পেয়ে রামতনুর বুকের ভিতরটা যেন ডুকরে উঠল। ছতরপুরার জঙ্গলে গত চার-পাঁচ বছরের মধ্যে কোন বাঘ আসেনি। ডোরাকাটা বাঘ নয়, গুলে বাঘ নয়, তেন্দুয়া নয়, সোনাচিতা নয়, শুধু দুটো নেকড়ে এসে একবার মাহাতোদের একটা গরুকে মেরেছিল। ব্যস, ওই পর্যন্ত।

শুকদেববাবুর ঘরে গলা খাকারির শব্দ শুনে বুঝতে পারে রামতনু, বাঘের ডাক শুকদেববাবুকেও ভাবিয়ে আর জাগিয়ে তুলেছে। না, আর কোন সন্দেহ নেই, দুই জীবন্ত হরিণকে এখন বাঘটা মনের সুখে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে। শিং-এ শিং-এ গিঁট বাঁধা হয়ে অচল অসহায় দুই প্রতিদ্বন্দ্বী হরিণের দুই দেহ এখন বাঘের ভোজ্য হবার দুর্ভাগ্যে রক্তাক্ত হয়ে ছটফট করছে।

সকাল হয়, বাঘের গর্জন যখন আর নেই, ছত্রপুরার শালজঙ্গলে মাথার ওপর যখন সোনালী রোদ ছড়িয়ে পড়েছে, তখন শুকদেব তাঁর ঘরের দাওয়ায় দাঁড়িয়ে ডাক দিলেন।—এ রামতনু, শুনছ, যা হবার ছিল তাই হয়েছে। বুঝতে পারছ তো। নিজের চোখে দেখতে চাও?

রামতনু: না।

কী আশ্চর্য, আর কেউ নয়, দুই বন্ধু জগদীশ আর দিবানাথ ব্যস্তভাবে হেঁটে এসে তসীল-কাছারীর দরজার কাছে থামে।—কী ব্যাপার রামতনু ভাই, বাঘ কি দুটোকে মেরেছে?

রামতনু: তাই তো মনে হচ্ছে।

জগদীশ: আপনি দেখেননি?

দিবানাথ: দেখতে যাবেন না?

জগদীশ: চলুন চলুন, একবার দেখে আসুন।

সকালবেলার সোনালী রোদের মধ্যে দাঁড়িয়ে কত শান্ত স্বরে কথা বলছে দুই বন্ধু জগদীশ আর দিবানাথ। সোনালী রোদের মধ্যে তবু একটু উত্তাপ আছে, কিন্তু এই দুই বন্ধুর রোগা ঝিঁকুটে দুই করুণ মূর্তির গলার স্বরে ও বুকের ভিতরেও এতটুকু উত্তাপ নেই। কিন্তু দুই হরিণের শেষ পরিণামের ছবিটাকে চোখে দেখবার জন্য ওদের দুই প্রাণই বা এত উৎসুক হল কেন?

শুকদেব বললেন, বেশ তো, আপনারাই যখন দুই হরিণের শেষ পরিণামের ছবিটাকে দেখবার জন্য এত ব্যাকুল, তখন আমরাই বা কেন—চলুন, দেখে আসি। চল হে রামতনু।

শুকদেব বাবুর ব্যস্ততার ভাষা শুনে জগদীশ আর দিবানাথ ওদের শান্ত চোখ দুটোকে নিষ্পলক করে কী যেন বুঝতে চেষ্টা করে। তারপরেই ডাক দেয়, চলুন তসীলদারজী, চলুন।

পাথরের টিলাটার ওপর দাঁড়িয়ে এই দৃশ্যটাকে দেখবার আর দরকার হয় না। কারণ দুই জীবন্ত হরিণের মারাত্মক সংঘর্ষের জীবন্ত দৃশ্য নয়। এক জোড়া হরিণের এক জোড়া ভাঙা ছেঁড়া কঙ্কালের দৃশ্য। হাড়, পাঁজরাও চিবিয়ে দিয়ে গিয়েছে বাঘটা। কিন্তু একজোড়া শিং তেমনই জড়াজড়ি করে পড়ে আছে। বাঘটার থাবার মার খেয়েও দুই শিং-এর জট খোলেনি।

কি ধবধবে সাদা হাড়-পাঁজর। শুকদেব বলেন, মনে হচ্ছে বাঘটার পিছু পিছু শেয়ালেরও একটা দল এসেছিল। ওরাই বাঘে খাওয়া হরিণ দুটোর রক্ত-মাংসের শেষটুকু চেটেপুটে সব হাড়-পাঁজর সাদা করে দিয়েছে।

ও কে? মহুয়া গাছটার ছায়ার কাছে যেন একটা সুন্দর জীবন্তপনা হরিণীর ছবি দাঁড়িয়ে আছে। যেন শেষ দেখা দেখবার জন্য এক জোড়া মায়াময় চোখ নিষ্পলক করে একটা হরিণী দুই হরিণের দুই ধবধবে সাদা হাড়-পাঁজরের দিকে

তাকিয়ে আছে।

রামতনু চেঁচিয়ে ওঠে, ও শুকদেববাবু দেখে বুঝতে পারছেন, কে এসেছে?

শুকদেব : হ্যাঁ, ওটা তো সেই হরিণীটা সেই ছোট ছোট তারার মত আকারের ছোপ, আর পেটের ওপর সেই দাগটা, আর··· ··।

দিবানাথ আর জগদীশ একসঙ্গে আশ্চর্য হয়ে চেঁচিয়ে ওঠে, কি বললেন? সেই হরিণীটা?

শুকদেব হেসে ফেলেন।—হ্যাঁ, শাল জঙ্গলের এক হেলেন-সুন্দরী। ওরই জন্যে মারামারি করে মরেছে যে দুই হরিণ, ওদের শেষ অবস্থার দৃশ্য দেখতে এসেছে হরিণীটা।

দিবানাথ : সত্যিই কি তাই?

জগদীশ : এটা কি সম্ভব? হরিণীটা দুই হরিণের শেষ দশার খবর নেবে?

শুকদেব : আরে ভাই, সত্যি হতে পারে মিথ্যাও হতে পারে। কিন্তু এ রকম একটা গল্প তো তৈরী করা যেতে পারে।

হঠাৎ একটা লাফ দিয়ে সরে গেল হরিণীটা। সবারই চোখের দৃষ্টি সেই মুহূর্তে চমকে ওঠে, একটু দূরে দুই শালের ফাঁকের ওপারে একটা হরিণও লাফিয়ে উঠেছে। সেই হরিণের মাথায় মস্ত বড় শিং-এর ঝাড় দুলছে।

শুকদেব বলেন, বা বা, ওই দেখুন, হরিণীর নতুন জীবনসঙ্গীর চেহারাটা একবার দেখে নিন। বেশ হৃষ্টপুষ্ট আর বেশ খুশি মেজাজের হরিণ বলে মনে হচ্ছে। নয় কি?

খুশি মেজাজে হরিণটার সঙ্গে সঙ্গে আর দৌড়ে দৌড়ে হরিণীটা চলে গেল। শুকদেববাবু ঘটনার দৃশ্যটাকে বুঝবিচার করে যেন একটা গবেষণার ভাষ্য শোনাতে থাকেন।—এই খুশি মেজাজের হরিণটা নিশ্চয় একটা জয়ী হরিণ। হরিণীর চোখের সামনে আর এক দাবিদার হরিণের সঙ্গে মারামারি করে জিতেছে। হরিণীও খুশি হয়ে জয়ী হরিণটার গলায় মালা পরিয়ে দিয়ে...

কথা থামিয়ে হেসে ফেলেন শুকদেব।—যাই ভাবুন আর বলুন, জানোয়ারদের প্রেম-ট্রেমের নিয়ম কানুনগুলি বড়ই কুৎসিত। দুটোকে মরিয়ে দিয়ে জীবন্ত একটা তৃতীয়ের সঙ্গে চলে যাওয়া! ছিঃ,

শুকদেবের কথা শুনে অস্বস্তি বোধ করে রামতনু। ইচ্ছে করে নয়, শুকদেববাবু নিজের যুক্তি-বুদ্ধির আবেগে কথাগুলি বলে ফেলেছেন। কিন্তু বুঝতে পারছেন না যে তাঁর কথাগুলিকে জগদীশের আর দিবানাথের শেষ দশার মত শোনাচ্ছে।

অদ্ভুত ও অভাবিত ব্যাপার—জগদীশ আর দিবানাথ, দুই বন্ধুর দুই চোখের দৃষ্টিটাও হঠাৎ উৎফুল্ল হয়ে হাসতে শুরু করেছে। গম্ভীর বিষণ্ণ ও উদাস এই দুই বন্ধুকে এই ক'মাসের মধ্যে একদিনও হাসতে দেখেনি রামতনু। কিন্তু

হুতরপুরার শাল জঙ্গলের ওই হেলেন-হরিণীর কাণ্ড দেখে ওদের দুজনের খুশি হবার কি আছে ?

রামতনু : আপনারা কি দেখে এত খুশি হলেন ?

জগদীশ হাসে।—হ্যাঁ, দেখতে পেয়ে সত্যিই খুশি হয়েছি।

দিবানাথ হাসে।—দেখতে খুব ভাল লাগল যে, হরিণীটা হরিণ দুটোর শেষ দশার একটু খবর নিয়ে গেল।

॥ চার ॥

ত্রিভুবন চৌধুরীর দুই অভ্রখনির কাজ কিছুদিনের মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে। অভ্রের দর এখন ভাল নয়। তাই এখন কিছুদিনের মত অভ্রর কারবারের কাজকর্ম বন্ধ রাখতে হবে। ত্রিভুবন চৌধুরী দানেশগঞ্জ থেকে নিজেই এসে বলে গিয়েছেন। —তোমাদের দুজনকে এখন আর পঞ্চাশ টাকা মাইনে দিয়ে পুষতে পারব না। শুনতে পাচ্ছ তো, বাবা জগদীশ, বাবা দিবানাথ ?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

শুকদেব শুনেছেন খবরটা। নিজের চোখে একবার দেখেও এসেছেন, চেয়ার টেবিল নেই। ত্রিভুবনবাবুর মাইকা অফিসের সেই মাটির বাড়ির দাওয়াতে একটা সতরঞ্চির ওপর বসে তাস খেলছে জগদীশ আর দিবানাথ। আরও রোগা হয়ে গিয়েছে ওরা। শুকদেব বলেন, দানেশগঞ্জের ত্রিভুবন চৌধুরীও একটা বাঘ। জগদীশ আর দিবানাথের সব স্থাবর সম্পত্তি ওই লোকটাই সস্তায় কিনে নিয়েছে। ওদের দুজনের ভাগ্যের রক্তমাংস একেবারে চেটেপুটে খেয়েছে ওই ত্রিভুবন চৌধুরী। যাই হোক, জগদীশ আর দিবানাথ এখন এখানে আর থাকবে কেন ? থাকতে পারবেই বা কেন ? থাকবার দরকারই বা কি ?

শুনে আশ্চর্য হয়েছেন শুকদেব, এরা দুজনেই থাকবে। অন্তত আরও পাঁচ সাতটা দিন থাকবে।

রামতনু : কেন ? আর এখানে থেকে ওদের লাভ কি ?

শুকদেব : তা তো বুঝতে পারছি না। তাই আশ্চর্য হচ্ছি।

একদল লোক সঙ্গে নিয়ে জঙ্গলের ভিতরে মাচান বাঁধবার জন্য দুই চৌকিদারকে যেতে দেখে শুকদেব ডাক দিলেন, কি ব্যাপার, কোথা থেকে কোন্ সাহেব শিকার করতে এসেছেন ?

চৌকিদার : রেলওয়াইকা একঠো বড়া সাহাব।

শুকদেব : ইংরেজ সাহেব, না দেশী সাহেব ?

চৌকিদার : দেশী সাহাব। ঔর উন্‌কা মেমসাহাব।

শুকদেব : দেশী মেমসাহেব, না বিলাতী মেমসাহেব ?

চৌকিদার হাসে।—দেশী, দেশী মেমসাহাব। চমকিলা শাড়ি পরেন, ডাকবাংলার বারান্দাতে বসে থাকেন।

দানেশগঞ্জ থেকে একটানা যে সড়কটা ছতরপুরার জঙ্গলের কাছে এসে থেমেছে, সেই সড়কের দু'পাশে শুধু ইউক্যালিপটাস গাছের সারি। অন্য কোন গাছ নেই। শিকার প্রিয় ডেপুটি কমিশনার লিস্টার সাহেব এই সড়ক তৈরী করিয়েছিলেন, ওই ডাকবাংলাটি তাঁর আদেশে সৃষ্টি। শুধু ইংরাজ ব্যক্তি, আর খুব বড়-রকমের কোন পদস্থ ইণ্ডিয়ান অফিসার ছাড়া এই ডাকবাংলাতে ঠাঁই নেবার অধিকার কারও নেই।

শুকদেব বুঝতে পারেননি, রামতনুও অনুমান করতে পারে না, জগদীশ আর দিবানাথ দুজনেই কেন আরও পাঁচ-সাতটা দিন ওই অসহায় দশার একটা সতরঞ্চির ওপর পড়ে থাকতে চায়!

খবর শুনে আশ্চর্য হয়ে গেলেন শুকদেব, রামতনু। জগদীশ আর দিবানাথ দুজনেই আশা করছে যে, পাঁচসাত দিনের মধ্যে অন্তত একটি দিন সেই নিনা ভরদ্বাজের সঙ্গে ওদের দেখা হবে।

ওই ডাকবাংলাতে রেলওয়ের যে বড় অফিসার সস্ত্রীক এসে উঠেছেন, যাঁর শিকারের মাচান তৈরি করবার ভার নিয়েছে ছতরপুরার দুই চৌকিদার, তাঁর নাম হল মিস্টার সি কে মূর্তি। দানেশগঞ্জের সেই নিনা ভরদ্বাজ আজ এই মিস্টার সি কে মূর্তির জীবনসঙ্গিনী, বিবাহিতা স্ত্রী।

নিনা ভরদ্বাজের ভাগ্যে এ রকম একটা চমৎকার শুভোদয়ের খবর শুনে এই দুই বন্ধুর কেউই একটুও ভ্রূকুটি করেনি, বরং দুই বন্ধুর কথাবার্তার মধ্যে নিনা ভরদ্বাজের কথা মাঝে মাঝে বেশ স্পষ্ট করে যেন একটা চমক দিয়ে বেজে ওঠে। শুকদেববাবু একদিন নিজের কানে শুনে এসেছেন, দুই বন্ধুতে বেশ স্বচ্ছন্দে ওদের জীবনের স্মৃতিকথা বলাবলি করছে। নিনার জন্যে কে কত কাজ করেছে, কত টাকা খরচ করেছে, নিনা কবে কখন কত খুশি হয়েছে, হেসেছে, কিংবা চোখের জল ফেলেছে, সব ঘটনার স্মৃতি ওদের কথাবার্তায় মুখরিত হয়। খুব শান্ত ও শীতল রকমের একটা মুখরতা, তার মধ্যে একটুও সন্দেহময় কোন জিজ্ঞাসার উত্তাপ নেই।

কিন্তু কই? কোন দেশী সাহেব তো শিকার করবার জন্যে চুপরাতুর জঙ্গলে গেল না। চান্দুয়ার জঙ্গলের দিকেও না। কোন দিকের জঙ্গলে যেতে হলে ছতরপুরা তসীল কাছারির সামনের এই পথ দিয়েই তো যেতে হবে।

দুই চৌকিদার একদিন ফিরে যাবার পথে তসীল কাছারির সামনে দাঁড়িয়ে খবর শুনিয়ে দিল—মিথ্যে হয়রানি। মিথ্যে এত মেহনত করে মাচান তৈরি করা হল। সাহেব শিকার করবেন না। সাহেব শুধু পাখির ফটো তুলবেন।

দশটা দিন পার হয়ে যাবার পর রামতনুর মনের ভিতরের প্রশ্নটা চমকে ওঠে,

দিবানাথ আর জগদীশ ওদের শেষ দশার মধ্যে পড়ে আছে, না চলে গিয়েছে ?

শুকদেব বলেন, চলেই গিয়েছে বোধহয়। চল, একবার দেখে আসি, আছে না চলে গিয়েছে।

হ্যাঁ, দৃশ্যটা চোখে পড়ে। এটা জঙ্গলের দুই হরিণের শেষ-দশার দৃশ্য নয়। জগদীশ আর দিবানাথ নামে দুই মানুষের শেষ-দশার দৃশ্য। মুল মাইকা অফিসের মাটির বাড়ির দাওয়াতে ময়লা সতরঞ্চির ওপর পাশাপাশি গা ঘেঁষাঘেঁষি করে বসে আছে রোগা ও রুগ্ন দুটি চেহারা, জগদীশ আর দিবানাথ। যেন দুটো ভাঙা বুকের হাড় পাঁজরের দুর্ভাগা জড়াজড়ি করে আর গিঁটবাঁধা হয়ে পড়ে আছে।

শুকদেব বলেন, আপনারা এখনও কিসের আশায় এখানে বসে আছেন ?

জগদীশ ঃ না, আর আশা করবার কিছু নেই।

দিবানাথ ঃ নিনা ভরদ্বাজ চলে গিয়েছে।

রামতনু ঃ কে ?

জগদীশ ঃ আপনি জানেন না, বললে বুঝবেনও না।

জগদীশ ঃ ডাকবাংলাতে এসে ঠাঁই নিয়েছেন রেলওয়ের বড় অফিসার, যাঁর নাম মিস্টার মূর্তি, তাঁরই স্ত্রী হল নিনা ভরদ্বাজ।

দিবানাথ ঃ কিন্তু বুঝতে পারছি না, নিনা আমাদের সব খবর জেনেও, এখানে এত কাছে এসেও, একবার কেন আমাদের চোখে দেখতেও এল না। নিনা তো কবেই জেনেছে যে, আমরা দুজন এখন এই জঙ্গলের ভিতরে বসে অভ্র খাদের লাভ লোকসানের হিসেব লিখছি।

শুকদেব : তাই তো, অন্তত অতীতের কথা স্মরণ করে এখানে একবার এসে আপনাদের সঙ্গে দুটো শুকনো কথাও তো বলতে পারত নিনা ভরদ্বাজ। কিন্তু বুঝি না, এই সামান্য সৌজন্যটুকু দেখাতে পারল না কেন।

রামতনু ঃ একটা কথা বলছি, কিছু মনে করবেন না শুকদেববাবু, আপনারাও কিছু মনে করবেন না, জগদীশবাবু ও দিবানাথবাবু।

বলুন বলুন, সত্যি কথা কিংবা মিথ্যে কথা, যা-ই হোক না কেন, বলে ফেলুন, আমরা কিছুই মনে করব না।

রামতনু ঃ নিনা ভররাজ তো আর এই শালজঙ্গলের হরিণীটার মত একটা জানোয়ার নয় যে, একবার ফিরে এসে দুজন চেনা মানুষের শেষদশার দুঃখটাকে দেখে যাবে ?

জঙ্গলের বাতাসে কোন সৌরভের সামান্য ছোঁয়াও আর নেই। শালজঙ্গলের বসন্তদিন কবেই শেষ হয়ে গিয়েছে। হাত তুলে চোখ মুছে নিয়ে দিবানাথ বলে, হ্যাঁ ঠিকই বলেছেন।

জগদীশ বলে, হ্যাঁ আমরা এখনি চলে যাব।

মধুগঞ্জের স্মৃতি

কুব্জদেহ ন্যুব্জদেহ একটি উট। তার চলবার ও তাকাবার দৃপ্ত রকমের ভঙ্গী দেখে মনে হবে যে, সে যেন বিকানীরের উট রেজিমেণ্ট গঙ্গা রিসালাতে ছিল আর মেসোপটেমিয়ার যুদ্ধে অনেক মরুভূমির উপর ছুটোছুটি করে তুর্কী শিবিরের অনেক তাঁবু গুঁতিয়ে ভূমিসাৎ করেছিল। রামতনু হঠাৎ দেখতে পেয়ে চমকে উঠেছে, তসীল কাছারির পূব দিকের জঙ্গলের বড়-বড় কোনার গাছের ডাল গুঁতিয়ে ভেঙ্গে দিচ্ছে একটা উট, আর সেই ঝুলে পড়া ভাঙ্গা ডালের কচিপাতা খাচ্ছে। খেতে খেতে ঘাড় তুলে তসিল কাছারির বারান্দার দিকে তাকিয়ে রামতনুকেই দেখছে। উটটার চোখে যেন একটা কড়া রকমের জিজ্ঞাসা ভাসছে, কে আপনি? হঠাৎ কোথা থেকে মধুগঞ্জের এই জঙ্গলে এসে ঠাঁই নিলেন?

উটটার ভঙ্গী দেখে বেশ কৌতুক বোধ করে রামতনু। দেখে মনে হয়, জঙ্গলের প্রাণী না হয়েও এই উট যেন জঙ্গলকে ভালবাসে। উটের গলাতে মস্ত বড় একটা কড়ির মালা ঝুলছে, হঠাৎ দেখলে মনে হতে পারে, ওটা বুঝি সাদা বনফুলের একটা মালা।

শুনতে পায় রামতনু, কাছারিঘরের পিছনে একজোড়া হায়েনা খ্যাক-খ্যাক করে কেশে কেশে দৌড়াদৌড়ি করছে। বেচারা উট এইবার নিশ্চয় উদ্বিগ্ন হয়ে আর একছুট দিয়ে পালিয়ে যাবে। কিন্তু কী আশ্চর্য, কোনার গাছের ভিড়ের ভিতর থেকে অবিচল উটের লম্বাগলা বের হয়ে আর উটের নির্ভীক মাথাটাকে উঁচিয়ে তুলতেই হায়েনার কাশির শব্দটাই ভয় পেয়ে থেমে গেল। পালিয়ে গেল দুই হায়েনা। বাঃ, এত তো বেশ জবরদস্ত মেজাজের উট।

জানতে দেরি হয়নি রামতনুর, এই উট সার্কাসের তাঁবু থেকে পলাতক কোন উট নয়। এ হলো মানুষের পোষা উট এবং মানুষেরই ঘরে থাকে। মধুগঞ্জ জমিদারীর বারো-আনা মালিক যিনি, সেই রায়সাহেব মহাদেব চৌধুরীর কারবারের কাজে সব রকমের দৌড়াদৌড়ির খাটুনি খাটে এই উট যার ডাক নাম বাহাদুর। রায়সাহেবের বাঙালী গোমস্তা, গোরাবাবু যাঁর নাম, তিনি নিজে এসে সেদিন আলাপ করে অনেক কথা বললেন, তাই জানতে পেরেছে রামতনু গত পাঁচ বছরের মধ্যে চারবার লাট সাহেবের শিকার খেলবার দরকারে সবরকম ব্যবস্থা করে দেবার কৃতিত্বে মহাদেব চৌধুরী রায়-সাহেব খেতাব পেয়েছেন। মধুগঞ্জ জমিদারীর বাকি চার-আনা মালিক যাঁরা, সেই ঠাকুরসাহেবদের তসিলদার হয়ে এই মধুগঞ্জের ঘোর জঙ্গলের ভিতরে যে কাছারি ঘরে আজ বসে আছে রামতনু, সেটা নিতান্ত দীনহীন চেহারার একটা কুঁড়েঘরের চেয়ে বেশি শোভাময় কোন অস্তিত্ব নয়।

তসিল কাছারির এই ঘরটা মধুগঞ্জ জঙ্গলের মধ্যে যেমন একটা দীনহীন চেহারার কুঁড়েঘর, বারো আনা জমিদারীর মহাদেব চৌধুরীর বাড়িটা তেমনই মাটির তৈরি বিশালকায় এক প্রাসাদের মতো চেহারার বাড়ি। প্রতি গুরুবারে মহাদেব চৌধুরীর বিরাট বাড়ির আঙিনাতে ঘট বসিয়ে পুজো আর ভজন হয়। দশ সের আটার হালুয়া প্রসাদ বিতরণ করা হয়। লোক পাঠিয়ে রামতনুকে একদিন নেমন্তন্ন করলেন রায়সাহেব মহাদেব চৌধুরী, তাই রামতনু এক গুরুবারে এসে হালুয়া প্রসাদ খেয়ে গেল।

আগে কখনও চোখে পড়েনি, তাই ধারণা করতে পারেনি রামতনু, ঘোর জঙ্গলের ভিতরে এত বড় একটা বাড়ি থাকতে পারে। পুরনো কালের বড়-বড় গড়-বাড়ির ধ্বংসের অবশেষ অনেক জঙ্গলের ভিতরে দেখতে পাওয়া গিয়েছে, কিন্তু এ-রকমের এতবড় চেহারার জীবন্ত কোন বাড়ি কখনও চোখে পড়েনি। বাড়িতে অনেক লোক ছোট-ছোট অনেক ছেলে ও মেয়ে বিরাট আঙিনার উপর ছুটোছুটি করে খেলা করছে চিৎকার করছে, কাঁদছে হাসছে আর মারামারিও করছে। আর ভারিক্কি ভঙ্গীর চেহারা নিয়ে উটটা আঙিনার একপাশে মাটির উপর এলিয়ে বসে বাচ্চা ছেলে-মেয়েদের এই খেলা দেখছে।

রায়সাহেব মহাদেব চৌধুরী বললেন—আমার এই উট নামেও বাহাদুর কাজেও বাহাদুর।

উটকে মরুভূমির জাহাজ বলা হয়েছে। মহাদেব চৌধুরীর উট এই বাহাদুরকে তাই জঙ্গলের হাওয়া-গাড়ি বলতে হয়। সারা দিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত নানা রকমের বস্তুসম্ভারের বোঝা পিঠে নিয়ে বাহাদুর এই জঙ্গলের পথে যাওয়া-আসা করে। কাঠের বোঝা, মকাইয়ের বোঝা, ঘিয়ের টিন তেলের টিন আর চাল-ডাল মশলার বোঝা। এখান থেকে তিন মাইল দূরে জঙ্গলের ভিতরে মহাদেব চৌধুরীর খনিজ সম্পত্তির যে বিরাট সমাবেশ আছে, সে জায়গাটার একটা নতুন নাম দিয়েছেন মহাদেব চৌধুরী—লছমিপুরা। সেখানে একটি বাজারও বসিয়েছেন মহাদেব চৌধুরী, সেই বাজারের চাহিদা হলো এই সব বস্তু। সব চেয়ে বেশি বইতে হয় বস্তাবন্দী যত খনিজ বস্তুর বোঝা। সোপস্টোন, ডেলোমাইট, অ্যাসবেসটস আর সিলিকেট। খনিজ মাল পিঠের উপর চাপিয়ে নিয়ে লছমিপুরা থেকে গুমিয়াতে ডেভিড ব্রাদার্সের ডিপোতে পৌঁছে দেওয়াও বাহাদুরের প্রায় নিত্যদিনের কাজ। তা ছাড়া দেশী মদের তিন-চারটে ড্রামও প্রতি সপ্তাহে অন্তত দুইবার গুমিয়ার আবগারী ডিপো থেকে বয়ে নিয়ে জঙ্গলের ভিতরে লছমিপুরার ওই নতুন বাজারের তিনটে লাইসেন্সওয়ালা কালালী দোকানে পৌঁছে দেবার কাজও আছে।

তসিলদার রামতনুর দীনহীন চেহারার কাছারিঘর মহাদেব চৌধুরী এই বিরাট চেঁচামিচি আর হাঁকডাকের বিরাট বাড়ি থেকে মাত্র আধ মাইল দূরে, তবু এ-বাড়ির জীবনের কোন ব্যস্ততার শব্দ রামতনুর তসিল কাছারীর ঘরে পৌঁছয় না, কারণ

জঙ্গল এখানে খুবই ঠাসা। আর আনাগোনার যে-সড়ক মহাদেব চৌধুরীর লছমিপুরা থেকে শুরু করে আর মধুগঞ্জ হয়ে গুমিয়া পর্যন্ত চলে গিয়েছে, সেটা খুবই সরু। এই সড়কের গোরুর গাড়ির ভয়ানক ক্যাঁচকেঁচে শব্দ যেন অচল হয়ে জঙ্গলের এই সরু পথের গায়ের উপরেই পড়ে থাকে। আধমাইল দূরের কোন জংলী বাড়ির কানে পেঁছিয় না।

মহাদেব চৌধুরী হেসে হেসে বলেন—ওই বাজে আর বিশ্রী জংলী সড়কে গোরু-গাড়ি চালিয়ে গুমিয়া পেঁছিতে দশ ঘণ্টা সময় লাগে। কিন্তু আমার এই বাহাদুরের লাগে দু ঘণ্টা। কেন বলুন তো?

রামতনু হাসে—আমি বলতে পারি না।

মহাদেব চৌধুরী—এক নম্বর কারণ, আমার উট এই বাহাদুর একটি তেজী দৌড়নেওয়ালা। দু নম্বর কারণ, বাহাদুর কখনও ওই সরু সড়ক ধরে যাওয়া-আসা করে না। জঙ্গলের ভিতরের যত নদীর গায়ের শুকনো বালিয়াড়ির উপর দিয়ে একটানা দৌড় দিয়ে গুমিয়া চলে যায় বাহাদুর। নদীগুলির চেহারা খুব আঁকা-বাঁকা হলেও নদীর শুকনো বালিয়াড়ীর উপর দৌড়তে বাহাদুরের যেমন সময় কম লাগে, তেমনই দূরও কম পড়ে। এখন বুঝলেন তো তসিলদারজী, কেন আমি উট পুষেছি।

হাজারিবাগে ক্যারিং কোম্পানি নামে এক কোম্পানির অনেক উটগাড়ির মধ্যে একটি উটগাড়ির উট ছিল এই বাহাদুর। কোম্পানির উটগাড়ি যাত্রী আর মাল বহন করবার নিয়মিত সার্ভিস পালন করতো। চাতরা গিরিডি রাঁচি গুমলা লোহারডাঙা, কোথায় না যেত ক্যারিং কোম্পানির উটগাড়ি। সড়কের পাশে রাতের অন্ধকারের মধ্যে ডোরাকাটা বাঘের চেহারার কালো পিণ্ডটাকে যাত্রীদের কেউ দেখতে না পেলেও, উটগাড়ির উট খুব সহজেই দেখে ফেলতো। সড়কের উপর শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আর গলা দুলিয়ে ডাক ছাড়তো গাড়ি-টানা নির্ভীক উট। যাত্রীরা হল্লা শুরু করলেই পালিয়ে যেত বাঘ। সেইরকমই একটি উটগাড়ির নির্ভীক উট হলো এই বাহাদুর।

উটগাড়ির সার্ভিস নবাগন্তুক মোটর বাসের প্রতিযোগিতা সহ্য করতে না পেরে একেবারে স্তব্ধ হয়েই গেল। উঠে গেল কোম্পানী। সব উট বিক্রি করে দিলেন ক্যারিং কোম্পানীর মালিক সামসুল সাহেব। বাহাদুরকে কিনে নিলেন মহাদেব চৌধুরী। কিন্তু কী অদ্ভুত সমস্যা, বিক্রী হওয়া উট এই বাহাদুর এক পা-ও নড়তে চায় না। মহাদেব চৌধুরীর তিন চাকর একে একে এগিয়ে এসে বাহাদুরের গলার দড়ি ধরে টান দেয়, কিন্তু বাহাদুর নড়ে না।

সামসুল সাহেব বলেন, বুঝলেন তো সমস্যা? উটগাড়ির চালক যে লোকটি, যার নাম মোহনরাম, যে এতদিন এখানে বাহাদুর নামে এই উটের হেফাজত করেছে, তাকে চাইছে বাহাদুর। সে যদি বাহাদুরের গলার দড়ির ধরে, তবেই নড়বে আর

চলবে বাহাদুর। নইলে নয়।

তাই, নইলে অন্য কোন কারণ ছিল না, বাহাদুরের এতদিনের চালকি; রোগা-পটকা আর একচোখ কাণা মোহনকেও নিয়ে এলাম। কিন্তু সত্যি, স্বীকার করতে হয়, কী চমৎকার কাজ করছে মোহন আর বাহাদুর।....এই মোহন, ইধর আও।

খুব রোগা-পটকা আর ছোটখাটো এইটুকু একটি মানুষ মোহন এগিয়ে এসে আর হাত তুলে রামতনুকে সেলাম জানায়। এই মোহন কেমনকরে আর কোন গুণে অত বড় একটা প্রাণীকে চালনা করে, কে জানে? হাঁটু পর্যন্ত লম্বা একটা খাকি রঙের ছেঁড়া কোট, ছোট বহরের একটা ময়লা ধুতি আর মাথাতে শক্ত করে জড়ানো বেশ পরিষ্কার একটা লাল রঙের গামছা। মুখের হাসিটা কিন্তু বেশ মিষ্টি। রামতনুকে আবার একটা সেলাম জানিয়ে নিজের কাজে চলে যায় চালকি মোহনরাম।

মহাদেব চৌধুরী এইবার বেশ-একটু দৃপ্ত ভঙ্গীতে মাথা দুলিয়ে হেসে ফেলেন ও কথা বলেন।—ভাগবতের অবধূতের সাতাশ জন গুরুর মধ্যে কয়েকজন প্রাণীও ছিল। তার মধ্যে বক একজন। বকের কাছ থেকে ধৈর্য শিক্ষা করেছিল অবধূত। আপনিও ইচ্ছে করলে আমার উট এই বাহাদুরের কাছ থেকে প্রেম শিক্ষা করতে পারেন।

রামতনু—কী বললেন, প্রেম?

মহাদেব চৌধুরী—হ্যাঁ, প্রেম।' কী বলবো তসিলদারজী, বিশ্বাস করুন উটটা ওর চালকি মোহনরামকে ওর নিজের প্রাণের চেয়েও বেশি ভালবাসে।

দেখতে পেয়েছে রামতনু, পুজোর প্রসাদ নেবার জন্য আঙিনার একদিকে বাড়ির মেয়েদের ভিড়ের সঙ্গে এমন এক তরুণী দাঁড়িয়ে আছে, যাকে এই মহাদেব চৌধুরীর গেঁয়ো বনেদিপনার মধ্যে একটি বেমানান রূপ বলে মনে হয়। বাড়ির অন্য যে-সব মহিলা দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁদের সবারই মাথায় ছোট-বড় ঘোমটা। কিন্তু ওই তরুণীর মাথায় ছোট বা বড় কোন রকমেই ঘোমটা নেই। চোখ-মুখ খুবই সুন্দর, কিন্তু তার মধ্যে হাসিখুশির সামান্য চিহ্নও নেই। তরুণী যেন নিরেট বিষাদের একটি রূপসী মূর্তি।

মহাদেব চৌধুরী বললেন—এই যে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের দেখছেন, এরা হলো আমার তিন ভাইয়ের ছেলে আর মেয়ে। তিন ভাই লছমিপুরাতে থেকে খনির কাজ দেখাশোনা করে। আর, ওই যে দাঁড়িয়ে আছে গম্ভীর মেয়েটি ওটি আমারই মেয়ে সুমতি। মনে শান্তি নেই, তাই গম্ভীর। কী দুর্ভাগ্য মশাই, মেয়ে আমার সধবা হয়েও একরকমের বিধবা। জামাই হলো ঘরজামাই, তার উপর যক্ষারোগী লেখা-পড়ায় খুব ভাল দেখে, পটনা কলেজের বি-এ ক্লাসের ছাত্র, যে-ছাত্র আই-এ পরীক্ষাতে ফার্স্ট হয়েছিল, গরীবের ছেলে গরীব সেই শশিনাথের সঙ্গে এই বিশ্বাসে আমার একমাত্র সন্তান সুমতির বিয়ে দিয়েছিলেন যে, শশিনাথ নিশ্চয় এক-

দিন মস্ত বড় পদের কেউ-একজন হবেই হবে। হয় জজ, না হয় হাকিম। জানতাম না, ভাগ্যের ঠাট্টা এত কসাই হতে পারে। সেই শশিনাথ এখন যক্ষ্মারোগী হয়ে আমার এখানে, ওই যে কেষ্টচূড়া গাছটার কাছে ছোট একটা ঘর দেখছেন, সেই ঘরে একটি খাটের উপর পড়ে আছে। তবে আমার কর্তব্য আমি করেছি। যক্ষ্মারোগী শশিনাথের চিকিৎসার জন্য গুমিয়ার বাঙালী কবিরাজ, বৈদজী বিজয়বাবুকে মাসিক একশো টাকা দিয়ে ব্যবস্থা করেছি, প্রতি সপ্তাহে দুটি দিন গুমিয়া থেকে তিনি এখানে এসে শশিনাথকে দেখে যাবেন আর ওষুধ দেবেন। যক্ষ্মারোগীর ঘরের অন্য সব কাজের জন্য একটা দাইও আছে, এক বুড়ি সিধুয়া ডোমের মা।

চলে যাবার জন রামতনু উঠে দাঁড়াতেই মহাদেব চৌধুরী বলেন— আবার আসবেন। আমার পূর্বপুরুষ আপনারই মতো বাঙালী ছিল, দেশ ছিল বরধোমান।

॥ দুই ॥

মহাদেব চৌধুরীর এই বড় বাড়ি থেকে একটু বিছিন্ন হয়েও অনেক ঘর নিয়ে ফাটল-ধরা চেহারার যে বাড়িটার দেয়ালের গায়ে কয়েক হাজার কাঁচা ঘুঁটে সব সময় লেগে থাকে আর শুকোয় সেটা যেন আদিবাসী গাঁয়ের ধুমকুড়িয়ার মতো ভিন্নতর অবস্থা ব্যবস্থা ও নিয়মের বাড়ি। বাইরের সব মানুষ, চাকর-বাকর মুন্সী মুনিব আর গোমস্তা, সবাই এই বাড়িটার ভিন্ন-ভিন্ন ঘরে থাকে আর ভিন্ন-ভিন্ন উনানের আগুনে রান্না করে। এই বাড়িটারই কাছে একটা কেষ্টচূড়া গাছের পাশে যে ঘরের ভিতরে ঘুঁটে মজুত করা হতো, আজ সেটা হলো ঘরজামাই শশিনাথের থাকবার ঘর। এই ঘরের খোলা জানালার দিকে তাকালে দেখতে পাওয়া যায়, যক্ষ্মারোগী শশিনাথ একটা খাটিয়ার উপর বসে আছে আর মাঝে-মাঝে বুকে হাত রেখে কাশছে।

ঘরজামাই শশিনাথ সব সময় যার আসার আশায় দুই চোখ মেলে তার ঘরের দরজার দিকে তাকিয়ে থাকে, সে হলো মহাদেব চৌধুরীর ওই মেয়ে সুমতি যার মুখে হাসি নেই চোখে কাজল নেই পায়ে আলতা নেই। সুমতি রোজই একবার ওর মন-প্রাণ আর আত্মার কঠোর অনিচ্ছাকে কোন মতে ঠেলে-সরিয়ে আর আস্তে-আস্তে হেঁটে এই ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়ায়। মহাদেব চৌধুরীর নির্দেশ, সুমতি যেন রোজই একবার শশিনাথকে শুধু একটু চোখের দেখা দিয়ে চলে আসে। লোকে যেন তাঁর মেয়ের নামে কোন নিন্দে রটাবার ছুতো না পায়, তাই এই নির্দেশ। তাই নিজের ইচ্ছা ও আগ্রহের কোন তাগিদে নয়, নিতান্ত নিরর্থক একটা নিয়মরক্ষার জন্য সুমতি রোজই একবার শশিনাথের ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে কথা বলে—কেমন আছ? যক্ষ্মারোগী শশিনাথ হেসে-হেসে ডাকে—বাইরে দাঁড়িয়ে কেন? ভেতরে এস।

সুমতি মাথা নাড়ে—না।

শশিনাথ—একটিবার, এক মিনিটের জন্য এস।

সুমতি—কেন ?

শশিনাথ—তুমি বুঝতেই পারছো কেন তোমাকে একবার কাছে এসে দাঁড়াতে লছি।

সুমতি না। একটুও বুঝতে পারছি না।

শশিনাথ—আমি তো আর বেশিদিন নেই, তাই খুব ইচ্ছে করছে…।

দেখতে কী বিশ্রী রকমের অদ্ভুত শশিনাথের এই তৃষ্ণাতুর মূর্তি। এই তৃষ্ণাটাই য শশিনাথের জীবনে আজ অবৈধ ও গর্হিত একটা অনাচার। সুমতির দুই চাখের কালো তারা যেন রাগ চাপতে গিয়ে সাদা হয়ে যায়—কী ইচ্ছে? কিসের চ্ছে ?

শশিনাথ শেষবারের মতো তোমাকে একটা চুমা খেতে ইচ্ছে করছে।

সুমতির দুই চোখের দৃষ্টি এইবার যেন দপ্ করে জ্বলে ওঠে।—বলতে লজ্জা রে না ? আয়নাটা হাতে তুলে নিয়ে একবার নিজের মুখটাকে দেখ।

শশিনাথ—অ্যাঁ ? কী হয়েছে আমার মুখে ?

সুমতি—তোমার ঠোঁটের উপর তোমার বমির রক্তের দাগ লেগে রয়েছে।

শশিনাথের গলার স্বর করুণ হয়ে যায়,—ও হ্যাঁ হ্যাঁ। মাঝ রাত্রিতে এক ঝলক ক্ত বমি করেছিলাম, সে-কথা ভুলেই গিয়েছিলাম।

সুমতি—আমি যাই।

শশিনাথ—আবার এস কিন্তু।

যক্ষারোগী ঘরজামাই শশিনাথের এই ঘর থেকে একটু দূরে বিশাল চেহারার দুই জ্ঞডুমুর গাছের কাছে, মস্ত উঁচু আর বেশ চওড়া একটি একচালা ঘর। দেখতে একটু অদ্ভুত রকমের চমৎকার বলে বোধ করতে হয়, এই একচালা ঘরের পূর্বদিকের বেড়া ঘেঁষে বসে রয়েছে একটি উট যার নাম বাহাদুর। আর পশ্চিম দিকের বেড়া ঘেঁষে বসে আছে উটের চালক ; যার নাম মোহনরাম। বাহাদুর বারবার গলা টান করে মোহনের রোগা শরীরটাকে শুঁকতে আর চাটতে চেষ্টা করছে।

মহাদেব চৌধুরীর এই বাড়ির জীবনের ছবিটা এইরকম এক-একটি বিচিত্র অবস্থা ও ঘটনার দৃশ্যপট দিয়ে সাজানো। কিন্তু মাস দুই পরে মহাদেব চৌধুরীর অনুরোধের বার্তা পেয়ে আবার যেদিন গণেশ পুজোর হলুয়া প্রসাদ নেবার জন্য এই বাড়ির বড়দুয়ারের সামনের মণ্ডপের একটা চৌকির উপর এসে বসলো রামতনু, সেদিন প্রসাদপ্রার্থীর সমাবেশের দিকে চোখ পড়তেই বুঝতে পারে, একটা দৃশ্যপটের রূপ খুবই বেশি বদলে গিয়েছে।

পুজো দেখবার আর প্রসাদ নেবার জন্য অন্তঃপুরের সব প্রৌঢ়া ও বয়স্কাদের ছোট ভিড়ের মধ্যেই দাঁড়িয়ে আছে সুমতি, কিন্তু এই সুমতি আর সেই বিষাদময়ী

সুমতি নয়। সুমতির চোখে কাজল, মাথায় চমৎকার ঢঙের খোঁপা আর পা আলতা। হাসছে সুমতি। সুমতির চাঁপা রং-এর শাড়ির আঁচলে রুপালি জরি বলাকা উড়ছে। আর ওদিকে, প্রসাদ-প্রার্থী পুরুষদের বড় ভিড়ের মধ্যে হাসিমুখ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন নতুন এক আগন্তুক। মহাদেব চৌধুরী বলেন—ওই ছেলে হলো জয়দেব রায়, আমার বাড়ির ছেলেমেয়েদের পড়াবার মাস্টার। মাস-মাইনে পনেরো টাকা আর খাওয়া ও থাকা, এই সর্তে এখানে ছেলে-মেয়েদের দুবেলা পড়াবে। বছরে আধ মাসের ছুটি। মনে হচ্ছে, ঝোঁকের মাথায় একটু বেশি দিয়ে ফেলেছি। তাই না? আপনি কী মনে করেন?

হেসে ফেলে রামতনু।—যদি মাস্টার জয়দেব মনে করেন যে, আপনি একটু বেশি দিয়ে ফেলেছেন, তবে ঠিকই, একটু বেশি দেওয়া হয়েছে।

মাস্টার জয়দেব রায় গণেশ বন্দনার স্তব গাইছে। বেশ ভালো সুরেলা গলা কিন্তু দুই চোখ অপলক করে সুমতির দিকে তাকিয়ে আছে জয়দেব। দেখে মনে হয়, জয়দেবের প্রাণটাই যেন সুরালা হয়ে সুমতির বন্দনা গাইছে।

কে জানে কেন, বেশ অস্বস্তি বোধ করে রামতনু। মনে হয়, মহাদেব চৌধুরীর এই বাড়ির জীবনে একটা নতুন অশান্তির সঞ্চার হয়েছে।

নিজের অফিস-কাছারির কুঁড়ে ঘরে ফিরে এসে আরও একটা অস্বস্তি বোধ করে। অস্বস্তিটা এই যে, মহাদেব চৌধুরীর বাড়িতে যে মানুষটাকে চোখেই দেখতে পেল না রামতনু তারই জন্য সব চেয়ে বেশি দুঃখ বোধ করতে হচ্ছে। ঘরজামাই শশিনাথের জীবনটা কী ভয়ানক দুঃখের জীবন।

নিজের কাজে, সাতটা ডিহির প্রজাদের বকেয়া খাজনা উসুল করবার কাজে ব্যস্ত থেকে পুরো দুটো মাস পার হয়ে যায় – মহাদেব চৌধুরীর বাড়ির বিচিত্র দৃশ্যপটের কোন বিচিত্র পরিবর্তনের চেহারা নিজের চোখে দেখতে না পেলেও অনেক খবর রামতনুর কানে পেঁছেই যায়।

সে-বাড়ির জীবনের সব রকমের খবর জানবার দেখবার ও শোনবার সুযোগ আছে যার, সেই মানুষটিই অর্থাৎ বিশ বছর ধরে সে-বাড়ির প্রকাণ্ড গেরস্থালীর জমা খরচের হিসাব লিখছেন যিনি, সেই গোমস্তা গোরাবাবু মাঝে-মাঝে রামবাবুর অফিস কাছারিতে এসে নানা গল্প শুনিয়ে যান। মাস্টারজী জয়দেব রায় কুঁয়োর কাছে সবুজ ঘাসের উপর বসে যখন বাঁশি বাজায়, তখন সুমতি যেন উতলা হরিণীর মতো বাড়ির ভিতর থেকে বের হয়ে আসে আর মণ্ডপের খুঁটির গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। সে দৃশ্য দেখে কারও বুঝতে অসুবিধে হবে না যে, চুপ করে দাঁড়িয়ে আর মন প্রাণ ও কান দিয়ে জয়দেবের বাঁশীর সুরেলা শব্দটাকেই শুনছে সুমতি।

সকালবেলা বাগানের জবার ভিড়ের মধ্যে ঢুকে যখন ফুল তোলে সুমতি তখন দেখতে পায়, বাগানের বেড়ার ওপাশ ধরে, যেন জঙ্গলের প্রথম বসন্তদিনের মিষ্টি

হাওয়ার লোভে হেঁটে বেড়াচ্ছে জয়দেব। এই রকমের এক-একটি ঘটনার ছবি রোজই ফুটে উঠছে ঠিকই যদিও ঘটনার মুখে কোন ভাষা নেই, বিহ্বল হয়ে খুব কাছাকাছি হয়ে যাওয়া নেই, কিংবা অপলক চোখ তুলে মুখোমুখি তাকিয়ে থাকা নেই। তবু মুন্সী মুনিব আর মালীদের সবারই ধারণা, ঘটনা বোধহয় ভয়ানক একটা সমস্যার দিকে গড়িয়ে চলেছে।

গোমস্তা গোরাবাবু বলেন: পাখি যেমন রাজসাপের ফণা আর জ্বলজ্বলে চোখের সামনে পড়লে আর নড়তে পারে না আরও কাছে এগিয়ে যেতে থাকে তেমনই দশা হয়েছে মেয়েটার। মাস্টার ছোকরার মতলবের কাছে এগিয়েই চলেছে। পরিণাম বুঝতে পারছে না।

ভুল ধারণা নয়, মাস্টার জয়দেব একদিন ফুলবাগানের বেড়ার কাছে, সুমতির একেবারে চোখের কাছে এসে থমকে দাঁড়ায়, আর কী একটা কথা বলতে চেষ্টা করে। কিন্তু সুমতি যেন জয়দেবের এই না বলা কথাটাকে খুব স্পষ্ট করে শুনতে পেয়েছে। তাই মুখ ঘুরিয়ে বোধ হয় লালচে মুখের ও ভীরু বুকের একটা লজ্জাকে লুকোতে আর সহ্য করতে গিয়ে কাঁপতে থাকে।

কে জানে সুমতি কী বুঝেছে আর জয়দেবই কী বলতে চেয়েছিল। কিন্তু দুজনেই যেন একটা বিহবল স্বস্তির সুখে সুখী হয়ে আর নিশ্চিন্ত হয়ে দুদিকে চলে গেল।

এসব তো কারও বনানো কথা কিংবা ওই দু'জনের বদনাম রটাবার জন্য চুগলি-বাজির মিথ্যে কথা নয়। ওরা দেখতে পায়নি যে, মালী কাছেই ফুলবাগানের বেড়ার ওদিকে বসে আছে। সব দেখেছে মালী। গোমস্তা গোরাবাবুও ভোর-বেলার হাওয়া গায়ে লাগাবার জন্য একটু বেড়াতে বের হয়েই একদিন দেখতে পেলেন, শিশির মাথা ঘেসো মাঠের এদিকে দাঁড়িয়ে, টুটুন পাহাড়ের মাথার দিকে তাকিয়ে সূর্যোদয় দেখছে জয়দেব মাস্টার। আর, মাঠের ওদিকে দাঁড়িয়ে সুমতিও দেখছে, টুটুন পাহাড়ের মাথায় কুয়াশা গলে গিয়ে লালচে আলোর আভা জেগে উঠেছে। সুমতির দুই অপলক চোখে কী জ্বলজ্বল ও মুগ্ধ একটা দৃষ্টি।

রায় সাহেব মহাদেব চৌধুরী কি তাঁর মেয়ের চোখে নতুন সূর্যোদয়ের আভার কোন খবর রাখেন না? তিনি তো নিজের চোখেই দেখেছেন, জয়দেব মাস্টার এখানে আসবার পরে সুমতির প্রাণের সব বিষাদ দূর হয়ে গিয়েছে। সুমতির মুখের হাসিটা যেন টাটকা—নতুন গোলাপফুলের হাসির মতো রঙীন হয়ে উঠেছে। কিন্তু কী করবেন রায়সাহেব। তিনি তাঁর এই অত্যন্ত আদুরে মেয়েকে যে অত্যন্ত রকমের ভয়ও করেন। বাপের মুখে কোনরকম শাসনের কথা শুনলে যদি অপমানিত বোধ করে মেয়ে? যদি রাগ করে বিষ-টিষ নিয়ে একটা সাংঘাতিক কাণ্ড করে ফেলে তবে? গোমস্তা গোরাবাবু বলেন—এই অবস্থায় আমরা আর কী করতে পারি, তুমিই বল না তসিলদার।

সর্বনাশ সর্বনাশ মনে মনে, তার মানে নীরবে এই কথা বলে একদম ভয়ানক উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন গোমস্তা গোরাবাবু। তিনি দেখতে পেয়েছেন, ভোরের কুয়াশার মধ্যে বাগানের কাছে দাঁড়িয়ে দুজনে একটা গাছের মাথার দিকে তাকিয়ে পাখির ডাক শুনছে, সুমতি এখানে জয়দেব সেখানে। মত্ত হয়ে একটা পাপিয়া ডাকছে পিউকাহা।

না, হাত ধরাধরি করে নয়। ওরা দুজনে দু জায়গাতে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু ওদের দু'জনের কেউ কি দেখতে পাচ্ছে না যে, কেষ্টচূড়া গাছটা এমন-কিছু বেশি দূরে নয়। সেই গাছের কাছে যক্ষারোগী শশিনাথের ঘরের জানালাটাও বন্ধ নয়। ভোরের কুয়াশাটা তো এমন কিছু ঘন আবরণ নয় যে যক্ষ্মারোগীর ঘরের খোলা জানালাটার চোখে ওদের দু'জনের পাখির ডাক শোনবার দৃশ্যটা ধরা পড়ে যাবে না ?

সেদিনই আর-একটা দৃশ্য দেখে আরও উদ্বিগ্ন হলেন গোমস্তা গোরাবাবু। বিকেল হতেই তিনি দেখতে পেলেন, জয়দেব মাস্টার তার ঘরটাকে ঝাড়া-মোছা করে নিয়ে দরজার চৌকাঠের মাথার দুদিকে দুটো বাহারে ফুলের তোড়া ঝুলিয়ে দিল। মুনিবজী জিজ্ঞেস করলেন—কী ব্যাপার মাস্টারজী ?

কথা বলতে গিয়ে জয়দেব মাস্টারের মুখের হাসিটা বিহ্বল হয়ে যায়,—আমার মনে হচ্ছে, আজ সন্ধ্যায় আমার ঘরে কোন মেহমান আসবে।

দূরে দাঁড়িয়ে থাকলেও জয়দেব মাস্টারের কথাগুলি শুনতে পেলেন গোমস্তা গোরাবাবু। তাঁর বুকের ভিতরে একটা বোবা আর্তনাদ ছুটোছুটি করতে থাকে। আজ সন্ধ্যায় মেহমান আসবে জয়দেবের ঘরে ? রায়সাহেব মহাদেব চৌধুরীর মেয়ে সুমতির ভাগ্যটা কি আজ সন্ধ্যার অন্ধকারে অভিসারিকার মতো চুপি চুপি এসে এই সর্বনেশে মতলবের ঘরে ঢুকবে ?

গোমস্তা গোরাবাবু নিজেকে সান্ত্বনা দেন, না, এটা একটা সন্দেহ মাত্র। সুমিতা ভুল করলেও এতটা ভয়ানক ভুল করবে না। কিন্তু হায় ভগবান, বুঝিয়ে-সুঝিয়ে সুমতির ভুল ভেঙ্গে দিতে পারে, এমন কেউ কি এই সংসারে নেই ?

সন্ধ্যা হতেই ঝড় উঠলো। সারা জঙ্গলের গাছপালার প্রাণ যেন হায়-হায় রব তুলে ছটফট করছে। মালী চেঁচিয়ে উঠলো হায় হায় ! মোহনরাম মরে গেল।

উটের ঘরের হাওদাতে জল দিতে আর লণ্ঠন রাখতে এসে দেখতে পেয়েছে মালী, নীরব নিথর মোহনরামের বুকটা একটুও কাঁপছে না। দুই চোখ বন্ধ, নিঃশ্বাস চলছে না। তবে তো মরেই গিয়েছে মোহনরাম। মালীর ডাক শুনে সবাই ছুটে আসে, মহাদেব চৌধুরীও আসেন। সবাই দুঃখ করেন, কী আশ্চর্য, সত্যিই যে মরে গিয়েছে মোহন।

ছুটে আসে না শুধু একজন, মাস্টারজী জয়দেব। জয়দেব তার ঘরের খোলা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আর উটের একচালা ঘরের কাছে লণ্ঠনের দৌড়াদৌড়ির

দৃশ্যটার দিকে তাকিয়ে বেশ বিরক্ত হয়। হঠাৎ ঝড় উঠলো, সন্ধ্যার শান্ত অন্ধকার যেন ভয় পেয়ে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে গেল উটওয়ালা মোহনরামের মৃত্যুর এই হল্লা যেন ক্ষেপা উটেরই মতো একটা গুঁতো দিয়ে জয়দেবের প্রিয় অপেক্ষার প্রাণটাকে থেঁতলে দিয়েছে। না, আজ আর সাহস করে এই ঘরের এখানে এসে দাঁড়াতে পারবে না সুমতি।

মোহনরামের মরা শরীরটাকে সে রাতেই তুলে নিয়ে জঙ্গলের ভিতরে ছোট স্রোতের কিনারাতে বালুর উপরে দাহ করা হলো। কিন্তু মহাদেব চৌধুরীর মনে একটা কঠিন সমস্যার প্রশ্ন প্রবল হয়ে ওঠে, মোহনরামের শিষ্য রামনাথ কি বাহাদুরের মত জবরদস্ত উটকে চালিয়ে নিয়ে কাজ করতে পারবে? রামনাথ তো বিশ বছর বয়সের একটা ছেলেমানুষ, বাহাদুরের গলা ধরে ঝুলতে জানে, কিন্তু বাহাদুরের শখের আয় খেয়ালের চোট সামলাতে পারবে কি?

॥ তিন ॥

সমস্যার সুরাহা করতে গিয়ে সবাই হয়রান হয়। সমস্যা সৃষ্টি করেছে বাহাদুর উট। রামনাথ শত চেষ্টা করে বাহাদুরের গলার দড়ি ধরে বার বার টানাটানি করে, আর বাহাদুরের গলায় হাত বুলিয়ে শতবার আদর করেও বাহাদুরকে একচালা ঘরের বাইরে নিয়ে আসতে পারলো না। নড়তেই চাই না বাহাদুর। কচি কোনার গাছের পাতায় মস্ত বড় একটা ডাল বাহাদুরের মুখের কাছে এগিয়ে দিয়েছে রামনাথ, কিন্তু মুখ সরিয়ে নিয়েছে বাহাদুর একটি পাতাও খায়নি। বাহাদুর ওর লম্বা গলাটাকে টান করে মেজের সেই জায়গার উপর এলিয়ে দিয়েছে, যেখানে পাতা ছিল মোহনরামের ছেঁড়া কম্বলের বিছানাটা। যেন ওই শূন্য মেজের ধুলো গলাতে আর মাথাতে মেখে আরাম পাচ্ছে আর শান্তি বোধ করছে বাহাদুর, কুব্জপৃষ্ঠ ও ন্যুব্জদেহ এই উট।

রামনাথ বলে—আমি আর কী করতে পারি বলুন? মোহন ওস্তাদ সামনে থাকলে আমি বাহাদুরকে যেমন ইচ্ছা তেমন করে খাটাতে আর চালাতে পারতাম।

মহাদেব চৌধুরী—কিন্তু তোমার মোহন ওস্তাদকে তো আর পাওয়া যাবে না।

রামনাথ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে আর মাথা চুলকোয়। মহাদেব চৌধুরী চেঁচিয়ে ধমক ছাড়েন।—তবে কি বুঝতে হবে যে, এইরকম জাঁদরেল ও প্রকাণ্ড একটা একটা পোষা প্রাণীকে দিয়ে কোন কাজই করানো আর সম্ভব হবে না?

রামনাথ—যদি খাওয়া বন্ধ করে দিয়ে মরেই যায় উটটা, তবে আর কেমন করে কী উপায় করবেন, হুজুর।

মহাদেব চৌধুরী—অ্যাঁ? জন্তুটা সত্যিই মরে যাবে নাকি? এতই কি শোক হয়েছে যে, নিজের প্রাণটা ধরে রাখবারও ইচ্ছে আর নেই।

রামনাথ—আমি একটা উপায় বলে দিতে পারি হুজুর।

মহাদেব চৌধুরী—বল।

রামনাথ—খড় আর ন্যাকড়া দিয়ে একটা রোগা-পাতলা মানুষের চেহারা তৈরী করে, সেই চেহারায় গায়ে লম্বা একটা কোট আর মাথায় লাল গামছার ফেটি বেঁধে দিয়ে যদি এখানে বসিয়ে কিংবা শুইয়ে রাখেন, তবে বোধহয়।···

কী আশ্চর্য, খড় দিয়ে তৈরী একটা রোগাপট্কা মানুষের নকল শরীরের গায়ে লম্বা কোট আর মাথায় লাল গামছার ফেটি এঁটে দিয়ে, আর ন্যাকড়া দিয়ে তৈরী কপালের নীচে একটা কানাচোখ আর মুখ এঁকে দিয়ে বাহাদুরের পাশে মেঝের উপর বসিয়ে দিতেই ধড়ফড় করে উঠে দাঁড়ালো উট, বাহাদুর। সঙ্গে সঙ্গে বাহাদুরের গলার দড়ি ধরে টান দিল রামনাথ। সেই মুহূর্তে একচালা আস্তানার বাইরে এসে দাঁড়ায় বাহাদুর। বাইরে যেতে একটুও আপত্তির ভাব আর নেই। গলার দড়ি খুলে দিতেই দৌড়ে জঙ্গলের ভিতরে ঢুকে পড়লো সাতদিনের উপোষী প্রাণীটা। তিন চার ঘণ্টা পরে জঙ্গল থেকে ফিরে এসেই একচালা ঘরের ভিতরে খড়ের মোহনরামের পেটের উপর গলাটাকে একেবারে অলস করে শুইয়ে দিয়ে বসে পড়ে বাহাদুর। আরামের ঘোরে বাহাদুরের চোখ বুজে যায়। আস্তে আস্তে দুই পাটি দাঁত দিয়ে ঘষে-পিষে জাবর কাটতে থাকে।

নিজের ঘরের জানলার কাছে দাঁড়িয়ে দেখতে পায় জয়দেব, উটের একচালা আস্তানার কাছে দাঁড়িয়ে কী যেন দেখছে সুমতি। কেন? রামনাথকে কী কথা বলছে আর হাসছে সুমতি?

সুমতি চলে যাবার পর জয়দেব ব্যস্ত হয়ে উটের ঘরের কাছে এসে দাঁড়ায়।
—কী রামনাথ, কী ব্যাপার, কী কথা বলে গেল তোমাদের দিদি?

রামনাথ—উটের কাণ্ড দেখে দিদি খুব হাসলেন আর বললেন, কী ভয়ানক বোকা বুদ্ধির উট!

শুনে নিশ্চিন্ত হয় জয়দেব। উটের বোকাবুদ্ধির কাণ্ডটাকে চমৎকার একটা প্রেমময় মায়ার খেলা বলে বোধ করেনি সুমতি।···কিন্তু কবে থামবে বাহাদুর নামে একটা জানোয়ারের ব্যাপার নিয়ে এত চিন্তার সোরগোল আর হল্লা?

না, থামছে না। কেনই বা থামবে? এক-একটা নতুন ঘটনা আসছে, বাহাদুর নামে এই উটের এক-একটা অদ্ভুত মায়ার খেলা সকলকে আশ্চর্য করে দিচ্ছে, খুবই করুণ রকমের আশ্চর্য।

মাঝরাতে একটা নেকড়ে এসে উট ঘরের মধ্যে ঢুকে খড়ের তৈরী মোহনরামের শরীরটাকে টেনে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেছিল। নেকড়েটাকে বাধা দিয়ে আর মরিয়া হয়ে লড়াই করেছে বাহাদুর। শেষে খড়ের মোহনরামকে ছেড়ে দিয়ে বাহাদুরের একটা পা থেকে ছোট্ট এক খাবলা মাংস ছিঁড়ে নিয়ে পালিয়ে গিয়েছে। খবর শুনে জয়দেব আবার খুশি হয়ে ছুটে আসে। বাহাদুরের পায়ের রক্তমাখা

জখমটার দিকে তাকিয়ে রামনাথকে বলে—তোমাদের এই জানোয়ার আর বাঁচবে না, এইবার মরবে, নিশ্চয় মরবে।

কে জানে কী ভেবে বাহাদুরের মরণ আসন্ন বলে মনে করলো জয়দেব? জয়দেবের আশার স্বপ্নটা কি তাড়াতাড়ি সফল হবে, যদি উটটা তাড়াতাড়ি মরে যায়?

সেই থেকেই একটা সন্দেহ জয়দেবের মনে দেখা দিয়েছে।

এই ক'দিনের মধ্যে একটি দিনও কোন ভোরবেলায় সুমতিকে কোন ফুলগাছের কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে আর দেখা গেল না।

দেখতে পায় জয়দেব সুমতি আজকাল রোজই দুই বেলা উটঘরের কাছে এসে দাঁড়ায়। অনেকক্ষণ ধরে উটঘরের সামনে দাঁড়িয়ে থাকে। কেন? বোকাবুদ্ধির একটা উটের দিকে তাকিয়ে এত আশ্চর্য হবার আর এতক্ষণ তাকিয়ে দেখবার কী আছে?

ঠিকই সন্দেহ করেছে জয়দেব। বাহাদুরের দিকে তাকিয়ে সুমতি বেশ আশ্চর্য হয়, মুগ্ধ হয়, আর চোখ দুটো কেন যেন বেশ ছলছল করে। রামনাথকে দিয়ে একদিন খড়ের মোহনরামের গায়ের সব ছেঁড়া শেলাই করিয়েছে সুমতি। উট যে সত্যিই মোহনরামের খড়ের চেহারার ছেঁড়াগুলির উপর মুখ ঘষে দিনরাতের সময় পার করে দেয়। মোহনরামের গায়ে যেন ব্যাকুল রকমের একটা যত্নের ছোঁয়া ছুইয়ে দেয়। ঘুমোয় না বাহাদুর।

এক একটি দিন যায়, জয়দেবের প্রাণের উদ্বেগ বাড়তেই থাকে। কী হলো সুমতির সকালবেলায় বাগানের ফুল তুলতে আর সুমতিকে দেখা যায় না। জয়দেবের বাঁশির সুর উথলে উঠলেও সুমতির কোন সাড়া পাওয়া যায় না। যেন জয়দেবের সঙ্গে মুখোমুখি সাক্ষাৎ হয়ে যাবার আনন্দটাকেই ভয় পেয়ে দূরে-দূরে সরে থাকছে সুমতি। কী আশ্চর্য, উট বাহাদুরের যত মায়ার খেলা দেখবার জন্য সুমতির প্রাণটাকে যেন একটা নেশায় পেয়েছে। খড়ের মোহনলালের বুকের উপর লম্বা গলাটাকে পেতে দিয়ে বসে রয়েছে বাহাদুর, অনেকক্ষণ ধরে অপলক চোখে দেখতে থাকে সুমতি। কিন্তু বুঝতে পারে না, উটের এই কাণ্ডটা কেন এত করুণ বলে মনে হয়। কেন নিজেরই নিশ্বাসের বাতাস করুণ হয়ে ছটফট করে?

প্রতিদিন অন্তত একবার বাহাদুরকে দেখতে আসে সুমতি। সেদিন, যেদিন বিকেলের আলো বেশ রঙ্গীন হয়ে যজ্ঞডুমুর গাছের মাথায় উপর ছড়িয়ে পড়ে, আর সামনের জমির উপর একজোড়া ঘুঘু ঘুরে ফিরে ঘাসের বীজ খায়, সেদিন উটের একচালা ঘরের সামনে এসে দাঁড়াতেই সুমতির পা টলতে থাকে, একচালার খুঁটি দুহাতে আঁকড়ে ধরে সুমতি যেন ওর হঠাৎ-অলস প্রাণটাকে দাঁড় করিয়ে রাখতে চেষ্টা করে। চেঁচিয়ে ডাক দেয় সুমতি—রামনাথ, তুমি কোথায়?

—এই যে আমি। বলতে বলতে ছুটে আসে রামনাথ।—আমি বাহাদুরের পায়ের ঘা সারাবার লতা খুঁজছিলাম, দিদি।

সুমতি—কিন্তু বাহাদুরের মুখে এত রক্ত কেন?

রামানথ হাসে—আজ জঙ্গলের ভিতরে কণ্টিকারীর একটা ঝোপকেই খেয়ে ফেলেছে বাহাদুর। কণ্টিকারীর কাঁটা চিবিয়ে খেয়েছে, তাই ওর মুখে রক্ত ঝরছে।

এটা তো জানা কথা। সবাই জানে উটেরা কাঁটা খেতে ভালবাসে। কিন্তু সে জন্যে নয়, খড়ের মোহনরামের মুখে রক্তের ছোপ কেন? রহস্যের প্রশ্নটার জবাব রামনাথই দিয়ে দেয়।—বাহাদুর অনেকক্ষণ ধরে মোহন ওস্তাদের খড়ের তৈরী মুখের উপর মুখ ঘষছে।

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে সুমতি। খড়ের মোহনরামের মুখের উপর বাহাদুর উটের রক্তাক্ত মুখের ছোপ লেগে রয়েছে। চোখ মুছে নিয়ে তাকালে রক্তমাখা চুমোর ছাপ বলে মনে হয়। কিন্তু...কিন্তু এ দৃশ্য তো আর সহ্য হয় না। বুকের ভিতরে দুঃসহ একটা ব্যথার ভার টলমল করে নড়ছে। একচালা ঘরের খুঁটির গায়ে মাথা ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সুমতি।

জানে না সুমতি, কখন জয়দেব এসে সুমতির মুখের দিকে তাকিয়ে আছে।—কী ব্যাপার তোমার?

জয়দেবের প্রশ্নের ডাক শুনে চমকে ওঠে সুমতি। তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে চলতে থাকে। পিছন থেকে বার বার ডাকতে থাকে জয়দেব—কী হলো? কী হলো?

যেন একটা ভয়ের চিতাবাঘ সুমতির পিছন থেকে ডাক ছাড়ছে। শিউরে ওঠে হৃৎপিণ্ডটা। ছুটে চলে যায় সুমতি।

বুকের ভিতরে দুঃসহ একটা সন্দেহের জ্বালা নিয়ে সেই মুহূর্ত থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কেষ্টচূড়ার তলার ছোট ঘরটার দিকে তাকিয়ে নিজের ঘরের দাওয়ার উপর বসে থাকে জয়দেব। সন্ধ্যা হয়। উতলা ঝিঁঝির সঙ্গে মিশে ঘন অন্ধকারটাও যেন মুখর হয়ে উঠেছে। কান পেতে আর চোখ মেলে বসে থাকে জয়দেব। আজ রাতে সুমতিকে নিশ্চয় দেখতে পাওয়া যাবে। দেখতে হবে, কার কাছে দাঁড়িয়ে আছে সুমতি। শুনতে হবে কী কথা বলছে সুমতি।

মাথাভরা সন্দেহের জ্বালা নিয়েই একটু যেন ঝিমিয়ে পড়েছিল জয়দেব। তাই দেখতে পায়নি, বুঝতেও পারেনে, অভিসারিকা যে এইমাত্র এই পথ ধরেই ওদিকে চলে গেল। বাতাসে চামেলী ফুলের গন্ধ উড়ছে। এ তো সুমিতারই খোঁপার চামেলী তেলের গন্ধ।

দেখতে পায় জয়দেব, যক্ষ্মারোগীর ঘরের ভিতরে একটা জ্বলন্ত লণ্ঠনের আলো দুলে উঠেছে। সেই মুহূর্তে দৌড়ে গিয়ে যক্ষ্মারোগী শশিনাথের ঘরের খোলা দরজার কাছে এসে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে জয়দেব।

ঠিকই যক্ষ্মারোগী ঘরজামাইয়ের ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে যেমন দেখতে পায় তেমনি শুনতে পায় জয়দেব যক্ষ্মারোগীর শশিনাথের খাটের কাছে এগিয়ে গিয়ে কথা বলছে সুমতি।—আমি ডোমবুড়ি সিধুয়ার মা'কে বলে দিয়েছি, তোমার ঘরের কোন কাজ তাকে আর করতে হবে না।

শশিনাথ—কেন? কেন?

সুমতি—এই ঘরের সব কাজ এবার থেকে আমিই করবো।

শশিনাথের দুই চোখের তারা থেকে দুরন্ত একটা বিস্ময় যেন ঠিকরে বের হয়ে পড়ে।—তুমি? কী অদ্ভুত কথা বলছো, সুমতি?

শশিনাথের খাটের আরও কাছে এগিয়ে, শশিনাথের কাঁধের শুকনো দুই কাঠের টুকরোর মতো খটখটে দুই হাড়ের উপর হাত রেখে কথা বলে সুমতি।—সেদিন আমার কাছ থেকে কী যেন চেয়েছিলে?

শশিনাথ-হ্যাঁ, ভুল করে চেয়েছিলাম। আর চাইবো না। যতদিন আছি ততদিন তুমি শুধু একবার এই ঘরে এসে আমাকে দেখে যেও, তাহলেই হবে।

শশিনাথের মুখের উপর মুখ নামিয়ে দিয়ে ফুঁপিয়ে ওঠে সুমতি।

শশিনাথের যে মুখটা কাগজের মতো সাদাটে, সেই মুখের ওপর উচ্ছল রক্তের আভা চমকে ওঠে। দুই হাতে সুমতিকে জড়িয়ে ধরে চুমো দিতে গিয়ে শশিনাথের দুই শুকনো ঠোঁট যেন দুরন্ত এক তৃপ্তির স্বাদ পেয়ে শিউরে ওঠে।

সুমতি—বল এবার আমার উপর কোন রাগ তোমার মনে আর রইল না তো?

—না, একটুও না। কথা বলতে গিয়ে ধড়ফড় করে শশিনাথের বুকটা। পাখা হাতে নিয়ে শশিনাথের মাথায় বাতাস দিতে থাকে সুমতি।

ঘরে বাইরের অন্ধকারের সব ঝিল্লি স্বর হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে যায়। দরজার কাছ থেকে ভয়ানক আশার একটা আহত শরীর যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে, আর দুড়দাড় করে পা চালিয়ে ছুটে চলে গেল।

শেষ রাতের সব তারা যখন নিবে গেল, টুটুন পাহাড়ের মাথায় কুয়াশা ভোরের প্রথম আলোর আভা লেগে রঙীন হয়ে উঠলো, ঠিক সেই সময় চেঁচিয়ে ওঠে মালী—এ কী! মাস্টারজীর ঘরের দরজা খোলা কেন? মাস্টারজী ঘরের ভিতরে নেই কেন?

মালীর চেঁচামিচির শব্দ শুনতে পেয়ে, ঘুমভাঙা চোখের উপর শক্ত দুটি ভ্রূকুটি নিয়ে সবার আগে ছুটে আসেন গোমস্তা গোরাবাবু। এসেই যেন মস্ত একটা স্বস্তির হাঁফ ছেড়ে হেসেই ফেলেন।—মাস্টার পালিয়েছে।

তেমনই হাসিমুখ নিয়ে গোরাবাবু উৎসাহের আবেগে যখনই জঙ্গলের আধ মাইল পথ হনহন করে হেঁটে পার হয়ে রামতনুর তসিল কাছারিতে এসে ডাক দেন।—ওহে তসিলদার, শুনছো।

রামতনু সাড়া দেয়—আজ্ঞে হ্যাঁ, শুনেছি।

গোরাবাবু।—সুখবর, ও বাড়ির ভাগ্যের সেই বিপদ কেটে গিয়েছে। মাস্টার সরে পড়েছে।

রামতনু—কে সরিয়ে দিল, জানেন কি?

গোরাবাবু—না, সেটা একটু খোঁজ করে জানতে হবে।

রামতনু—আমি কিন্তু জানি।

গোরাবাবু—অ্যাঁ? তুমি জান? কে সে? কে সে?

রামতনু—আপনাদের উট, যার নাম বাহাদুর।

চেঁচিয়ে ওঠেন গোরাবাবু—সে কী? তুমি কী ভয়ানক একটা আশ্চর্যের কথা বলছো হে তসিলদার।

জগমোত্তির পাহাড়ী ময়না

কপোত-কপোতী যথা উচ্চবৃক্ষচূড়ে বাঁধি নীড়; থাকে সুখে। মাইকেল মধুসূদনের কাব্য পড়াতে গিয়ে প্রফেসর চারুবাবু এই পংক্তিটাকে অদ্ভুতরকমের বিহ্বল স্বরে বার বার আবৃত্তি করেছিলেন। ক্লাসের মধ্যে সবচেয়ে রূঢ় স্বভাবের মানুষ বলে যার দুর্নাম ছিল, সেই বিষ্ণুচরণ তখন গলা-খাঁকারি দিয়ে চারুবাবুর গলার স্বরের সেই বিহ্বলতার খুব চটুল রকমের একটা অর্থের সঙ্কেত বাজিয়েছিল। ক্লাসের ছাত্রদের অনেকে সেদিন বিষ্ণুচরণের গলা-খাঁকারির অর্থ বুঝতে পেরে হেসেছিল, অনেকে না বুঝেই হেসেছিল। আজ মনে পড়তেই বেশ লজ্জা পায় রামতনু; সে'ও হেসেছিল। আরও মনে পড়ে কবিতার কথার মর্ম ব্যাখ্যা করে বোঝাতে গিয়ে চারুবাবু সেদিন অদ্ভুত একটা কথা বলেছিলেন: পাখিরা আর্ট ভালবাসে। কপোত ও কপোতী যে উচ্চবৃক্ষচূড়াতে নীড় বেঁধে থাকে, সেটা ওদের জীবনের একটা প্রিয় ও পছন্দসই আর্ট। আমি একবার একগাছা কচি ভুট্টার দানা শান-বাঁধানো আঙিনার উপর ছড়িয়ে রেখেছিলাম। আশা ছিল, ভুট্টার দানা দেখতে পেয়ে পাহাড়ী ময়নার ঝাঁক থেকে অন্তত দু-চারটে ময়না নামবেই নামবে। কিন্তু না, কেউ নামেনি। যেদিন সবুজ ঘাসের উপর হলদে-হলদে ভুট্টাদানা ছড়িয়ে দিলাম, সেদিন পাহাড়ী ময়নার একটা ঝাঁকের প্রায় সবাই নেমে এসে আর হুটোপুটি করে ভুট্টার দানা খেয়েছিল। তোমরা বুঝতেই পারছো যে, সবুজ ঘাসের উপর ছড়ানো হলদে ভুট্টাদানা কী চমৎকার একটা রূপের দৃশ্য। তোমার-আমার কাছে হয়তো খুব বেশী চমৎকার রূপের দৃশ্য নয়। কিন্তু পাখিদের কাছে খুব চমৎকার।

দু-বছর পর আবার ভেলাডিহির ঠাকুর-সাহেব চিঠি দিয়ে জানিয়েছেন, খুব সাবধান রামতনু, এ বছর আমার ভেলাডিহির জঙ্গলের যেন এক ছটাক মহুয়াও কেউ চুরি করতে না পারে। তোমার আগে ভেলাডিহিতে আমার কাছারীর কাজ দেখতো যে তসীলদার, যার নাম রামসিংহাসন, সে পরপর দু' বছর আমাকে আধ সের মহুয়ার বিক্রিও দেখায়নি। সব মহুয়া নাকি পাহাড়ী ময়নারা ঝাঁকে ঝাঁকে এসে খেয়ে গিয়েছিল। আমি জিজ্ঞেস করি, পাহাড়ী ময়না কি মহুয়া খায়? আর খেলেও কি পাঁচ-দশটা ঝাঁক এসে সাড়ে সাতশো গাছের মহুয়া খেয়ে ফেলতে পারে?

কুচকুচে কালো পালকে ছাওয়া নরম-সরম ছোট্ট দেহটি, পেটের দু-পাশে ধবধবে সাদার একরত্তি ছোপ. ঠোঁট আর দুই পায়ে সোনালী হলদের প্রলেপ। পাহাড়ী ময়নার জীবনতত্ত্বের শুধু একটি তথ্য জানা আছে রামতনুর, চোখে-দেখা একটা

তথ্য। পাহাড়ী ময়না ডুমুর খেতে ভালবাসে।

দু'বছর পরে ভেলাডিহি ফিরে আসবার পথে রামতনুর চোখে পড়েছে, সেই ডুমুর গাছটা আজও আছে, যার গা-ভরা লালচে রঙের পাকা ফল উজাড় করে খেয়ে চলে যেতো পাহাড়ী ময়নার ঝাঁক। রেল-লাইনের লেবেল-ক্রসিংয়ের কাছে সেই ডুমুর গাছ। লাতেহার যাবার সড়কটা যেন জঙ্গলের নিরালার ভিতরে চলতে চলতে এখানে এসে হঠাৎ কাটা পড়েছে। কাছেই আছে কৈরি মাহাতোদের গাঁ ধাউলিয়া, যেখানে কলকাতা থেকে পাখি কেনবার পাইকার মহাজনের দল প্রতি বছর এসে অন্তত তিন-চারটে মাস থাকে। তাই, জঙ্গলের নিরালার মধ্যে হলেও এই লেবেল-ক্রসিং খুব বেশী শূন্যতার চেহারা নয়। ধাউলিয়ার লোকজনের যাওয়া-আসার সাড়া আছে, সড়কের দু দিকের গো-গাড়ির চাকার শব্দের সাড়া আছে। তসীলদার রামতনুর টাট্টুঘোড়াও ভিন ডিহি থেকে ফিরে আসবার সময় এখানে এসে থমকে দাঁড়িয়েছে, ডুমুর-তলায় কুঁয়োর গায়ের লাগোয়া জলের হাওদাটার দিকে তাকিয়ে ঘড়ঘড় করে উল্লাসে হ্রেষা ছেড়েছে।

দু' বছর আগে এখানেই দাঁড়িয়ে অদ্ভুত উল্লাসের আর-একটা দৃশ্য দেখেছিলেন রামতনু। একটি রূপসী মেয়ের গোলাপী রংয়ের শাড়ির আঁচলটা গা থেকে খসে পড়ে মাটিতে লোটাচ্ছে। মেয়েটির চোখে-মুখে ঝিকমিক করছে একটা দুরন্ত ইচ্ছার হাসি। ইচ্ছে এই যে, ডুমুরগাছের ডাল থেকে বার বার উড়ে এসে ঘরের চালার লাল রঙের নতুন টালির উপর বসছে যে পাহাড়ী ময়নাটা, তাকে ধরতে হবে। মেয়েটি ছটফট করে ঘরের চারদিকে একবার একটা দৌড় দিয়েই থেমে গেল। ময়নাটার দিকে তাকিয়ে হাততালি দিল—আয় আয় আয়। আশ্চর্যের ব্যাপার বলতে হবে, আর প্রফেসর চারুবাবুর সেই কথাটা যেন ঝংকার দিয়ে মনের ভিতর বেজে ওঠে: পাখিরা আর্ট ভালবাসে। প্রিয় পছন্দসই কোন রং দেখতে পেলে, কিংবা পছন্দসই মধুরতার সাড়া পেলে পাহাড়ী ময়নাও ঝাঁপ দিয়ে যেন একটা মায়ার কোলের উপর লুটিয়ে পড়ে। শোনা কথা নয়, রামতনু নিজের চোখে দেখেছিল সেই চমৎকার দৃশ্য। পাহাড়ী ময়নাটা যেন সাধ করে নিজেরই প্রাণের একটা ব্যাকুলতার তাগিদে টালির চালা ছেড়ে দিয়ে একেবারে মেয়েটির আগবাড়ানো দুই হাতের চেটোর উপর এসে বসে পড়লো। পাখিটাকে দুই হাতের একটা আদুরে চাপ দিয়ে বুকের সঙ্গে যেন সাঁটিয়ে দেয় মেয়েটি। কপালের মাঝখানে সোনালী গুঁড়োর মস্ত বড় একটা টিপ সিঁথিতে ছড়ানো সিঁদুর আর ছেঁড়া শাড়ির লাল পাড়ের ফালি দিয়ে বাঁধা মস্ত বড় একটা বিনুনী খোঁপা করে জড়ানো, মেয়েটিকে রাত্রিকালের জ্যোৎস্নার মধ্যে দেখতে পেলে কেউ না কেউ, অন্তত ভাণ্ডারীজী বিশ্বাস করে ফেলবেন যে মায়াশরীর আর মায়াহাসি নিয়ে কোন পরী দাঁড়িয়ে আছে।

—কোথায় গিয়েছিলেন, তসীলদারবাবু?

হঠাৎ এরকম একটা জিজ্ঞাসার কণ্ঠস্বর কানে বেজে উঠতেই সেদিন দেখতে পেয়েছিল রামতনু নবলবাবু তাঁর ঘোড়ার রাশ টেনে ধরেছেন, থমকে দাঁড়িয়েছে ঘোড়া। নবলবাবু, বাবু নবলকিশোর সিং বয়স ত্রিশ-বত্রিশের বেশী নয়। সত্যি ইনি যেমন জাতে রাজপুত, তেমনই চেহারাতে ও মেজাজেও রাজপুত। সুঠাম সুদর্শন নবলবাবুর কথায় সাড়া দিয়ে রামতনু যে-সব কথা বলেছিল, সেগুলি নবলবাবুর কান স্পর্শ করেছিল বলে মনে হয় না। ঠাকুর সাহেবের সঙ্গে সাত বছর ধরে তিনটে ফৌজদারী মামলা লড়ছেন যিনি, সেই জমিদার ভরত সিং-এর একমাত্র ছেলে নবলবাবুর দুই চোখ তখন লেবেল-ক্রসিং-এর কাছে চৌকিদারের সেই ছোট্ট গুমটি ঘরের দিকে অপলক হয়ে তাকিয়েছিল, যে-ঘরের চালাতে তখন নতুন টালির লালচে রং হাসছে ছোট একটি উচ্ছে-লতার ফুলের উপর হলদে ফড়িং ফরফর করছে, ঘরের ভিতরে রূপসী মেয়েটির লালচে ঠোঁটও ফুল্ল হয়ে হাসছে। আর পাহাড়ী ময়নাটা সেই মেয়ের খোঁপার উপর যেন আরামে গদগদ হয়ে বসে আছে।

নবলবাবু ডাকলেন—ভাইয়া কাশীলাল। এ ভাই কাশী, একবার বাইরে এস।

গুমটিঘরের ভিতর থেকে বের হয়ে এল রেলের লেবেল-ক্রসিং-এর চৌকিদার কাশীলাল।

বেশ একটু আশ্চর্যের দৃশ্য বলতে হবে, নবলবাবু দুই হাত বাড়িয়ে চৌকিদার কাশীলালকে জড়িয়ে ধরলেন। সত্যিই বুকে বুক লাগানো বন্ধুত্বের দৃশ্য। নবলবাবু ভুলেই গিয়েছেন যে, তিনি সেই কিসুনগড়ের ডাকসাইটে জমিদার ভরত সিং-এর একমাত্র ছেলে, যে কিসুনগড়ের সবাই ঘাসের আয় প্রতি বছরে দশ হাজার টাকারও বেশী।

ভেলাডিহির বাইরে সাহেবের খয়েরের কাজ দেখবার জন্য দূরের জঙ্গলে চলে যাবার আগে তসীলের কাজে ছুটো-ছুটি করতে গিয়ে এই লেবেল ক্রসিংয়ের কাছে এসে ক্লান্ত টাট্টুকে থামিয়ে দিয়ে যে-কদিন রামতনুকে এক-আধ ঘণ্টা জিরিয়ে নিতে হয়েছিল, সেই ক'দিনই চোখে পড়েছিল, লেবেল-ক্রসিংয়ের গুমটিঘরের দরজার কাছে এই রকম অন্তরঙ্গ বন্ধুত্বের দৃশ্য। ভাণ্ডারীজী আরও অনেক রকমের কথা বলেছিলেন, যা থেকে এই দুই বিষম মানুষের সুষম বন্ধুত্বের একটা কারণ কিছুটা বুঝতে পেরেছিল রামতনু। নবলবাবু যেমন জাত-রাজপুত, চৌকিদার কাশীলালও তেমনই জাত-রাজপুত। ভাণ্ডারীজী বলেছিলেন, ওরা যেমন জাতিভাই, তেমনই দেশ-তুতো ভাইও বটে। সাসারামের কাছে সুখারপুর নামের রাজপুত গ্রামটি এই দুজনেরই পিতৃপুরুষের দেশ। কথা বলতে গিয়ে ভাণ্ডারীজীর গলার স্বরে নিবিড় শ্রদ্ধার আবেগ উথলে উঠেছিল: নবলবাবুর মতো উদার মনের মানুষ এই কলি-যুগেও যে জন্ম নিতে পারে, সেটা নবলবাবুকে দেখবার ও চেনবার আগে আমিও বিশ্বাস করতাম না। চৌকিদার কাশীলালের ভাগ্য ভাল নবলবাবুর মতো মহৎ

মানুষের সব রকম সাহায্য উপকার ও বন্ধুত্ব পেয়েছে। নইলে একুশ টাকা মাইনের চৌকিদারকে এই জংলী রেল-লাইনের লেবেল-ক্রসিংয়ের ছোট্ট একটা গুমটিঘরের ভিতরে শুধু মকাই পুড়িয়ে খেতে হতো, আর ভাল ঘরের ওরকম সুন্দর একটি মেয়েকে খাইয়ে-পরিয়ে খুশি করতে আর জংলী রাজ্যেরই ভিতরে ওরকম একটা ছোট্ট কুঠুরীর মধ্যে পুষে রাখতে হতো না। কাশীলালের শ্বশুর বার বার তিনবার এসেছিল, কাশীলালের নিদারুণ গরীবী ভাগ্যের ঘর থেকে তাঁর আদরের মেয়েকে নিয়ে যাবার জন্য তিনি অনেক পীড়াপীড়ি করেছিলেন। কাশীলাল তার ক্রুদ্ধ শ্বশুরের ইচ্ছার কথায় কোন আপত্তির টুঁ-শব্দও করেনি। কিন্তু আপত্তি করেছিল তাঁর মেয়ে চৌকিদার কাশীলালের বউ জগমতি। রাগ করে বেশ কড়া-কড়া কথাও বাপকে শুনিয়ে দিয়েছিল জগমতি: আজ তোমার জামাইকে একটা বাজে লোক বলে নিন্দে করছো কেন? আগে সাবধান হওনি কেন? মেয়েকে বিয়ে দেবার আগে কেন খোঁজ নিয়ে দেখনি যে, পাত্র হলো রেললাইনের গুমটিঘরের একজন চৌকিদার?

বুঝতে অসুবিধে নেই, বুঝতে দেরিও হয়নি রামতনুর, জমিদার-কুমার নবলবাবুর কাছে রেল-লাইনের লেবেল-ক্রসিংয়ের এই ছোট্ট গুমটিঘরটা যেন সুন্দর একটা মনোরম ও প্রাণারাম ঠাঁই। খুব সম্ভব রোজই একবার না একবার এখানে আসেন নবলবাবু। লাতেহার যাবার সড়কের ধুলো উড়িয়ে জংলী নীরবতার মধ্যে চমৎকার শব্দ তুলে নবলবাবুর ব্যস্ত-ব্যাকুল আবির্ভাব যেন তাঁর তেজী ঘোড়ার দুলকি চালের সঙ্গে নেচে-নেচে প্রায়ই এখানে এসে একটা স্বস্তির ও পরিতৃপ্তির ডাক ছাড়ে —এ ভাই কাশী, একবার বাইরে এস।

দু' বছর পরে ভেলাডিহিতে ফিরে আসবার পথে আজ যখন এই পুরনো বিরামের জায়গাটিতে এসে ঘোড়া থামায় তসীলদার রামতনু, তখন চকিতে একবার গুমটিঘরের দিকে তাকিয়ে নিয়েই মুখ ফিরিয়ে নেয়। সেই গুমটিঘর বটে, কিন্তু সেই মানুষটা আর নেই, সেই চৌকিদার কাশীলাল। সেই সব দৃশ্য চিরকালের মতো ফুরিয়ে গিয়েছে। নবলবাবু আরে কখনও তাঁর তেজী ঘোড়ার রাশ টেনে নিয়ে এখানে থামবেন না। গোলাপী শাড়ির আঁচল লুটিয়ে দিয়ে ঘরের চারদিকে হুটোপুটি ও ছুটোছুটি করে, আর হাততালি বাজিয়ে ময়না ধরেছিল যে সুন্দরী মেয়েটি, তাকেও আর এখানে কোনদিন দেখতে পাওয়া যাবে না। সেদিন এই গুমটিঘরের চালাতে যে নতুন টালির লাল রং জ্বলজ্বল করছিল, আজ আর নতুন টালির সেই নিবিড় লালচে আবেদন নেই। শেওলার ছোপ-লাগা ময়লা চেহারার টালি। জগমোতির খোঁপার উপর বসে থাকতো যে পাহাড়ী ময়নাটা, সেটাও নেই।

রামতনু মুখ ফিরিয়ে অন্য দিকে তাকিয়ে থাকলেও নতুন চৌকিদার রামটহল একটা সেলাম ঠুকে রামতনুর চোখের কাছে এসে দাঁড়ায়। দেখে বুঝতে পারে, কী যেন বলতে চায় লোকটা। রামতনু কোন কথা না বললেও চৌকিদার রামটহল

নিজেই যেন ভয়াতুর একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে চেপে কথা বলতে থাকে।—আমাকে বদলি করিয়ে দিন বাবু, এখানে থাকলে আমি একদিন ভয়ের মারে মরেই যাব হুজুর।

—কিসের ভয়?

—রাত হলে আর ঘরের ভিতরে থাকতে পারি না, ঘুমোতে পারিনা। উঁ উঁ উঁ...কে যেন কেঁদে কেঁদে ঘরের মেজের উপর বেড়ায় আর হেঁচকি তোলে। আমি দৌড়ে ঘরের দরজা খুলে আর বাইরে গিয়ে দাঁড়াই। শীতের চোটে ঠক-ঠক করে কাঁপি, তবু ঘরের ভিতরে ঢুকতে সাহস পাই না।

মতুন চৌকিদারের ছিঁচকাঁদুনে ফুসফুসটা যেন ঢিপ ঢিপ করছে, নিঃশ্বাসের বাতাস হাঁসফাঁস করছে। কী আশ্চর্য, লোকটা সত্যিই যে ভয় পেয়ে এরই মধ্যে আধমরা হয়ে গিয়েছে। কিন্তু চৌকিদার কাশীলাল চলে গেল কেন! বদলির অর্ডার হয়েছিল? না, ইচ্ছে করে কাজটাজ ছেড়ে দিয়ে দেশে ফিরে গেল?

চৌকিদার কাশীলাল সব সময় হাসতো। ওর চেহারা দেখে কখনও কারও মনে হতো না যে, ওর জীবনে কোন দুঃখ আছে। সারা দিনের মধ্যে মাত্র দুবার ট্রেন চলবার সাড়া জাগে। লেবেল-ক্রসিংয়ের দু' দিকের দুই গেট দিনে দুবার কাঁপে। বাস্, তারপর এই গুমটিঘর যেন নীরব নিরেট এক জংলী জেলখানার একটা কুঠুরী। চৌকিদার কাশীলালের বউ জগমোতিকে শুধু ওই একটি দিনই পাখি ধরবার জন্য ঘরের বাইরে হুটোপুটি করতে দেখেছিল রামতনু। চৌকিদারের বউ হলেও জগমোতি যেন পর্দার আড়ালে থাকতে ভালবাসে। সত্যিই আগে একটা চটের পর্দা দরজার উপর ঝুলতো। তারপর রঙীন ছিট কাপড়ের একটা পর্দা। যা-ই হোক, ওদের দুজনের কেউই যখন এখানে নেই, তখন রঙীন ছিট কাপড়ের পর্দা কিংবা চটের পর্দাই বা থাকবে কেন? আজ ওই গুমটিঘরের খোলা দরজা দিয়ে ভিতরের চেহারা বেশ স্পষ্ট করে দেখতে পাওয়া যায়, একটা ভাঙ্গা উনুনের উপর চৌকিদার রামটহলের ভাতের-হাঁড়িটাকে দেখতে পাওয়া যায়।

কোথায় গেল কাশীলাল? বেশ তো ছিল কাশীলাল! পোষা ময়নাটাকে কাঁধের উপর বসিয়ে রেখে নবলবাবুর সঙ্গে কথা বলছে কাশীলাল, এই দৃশ্যটা একদিন রামতনুকে হাসিয়ে দিয়েছিল। ময়নাটা বলছেঃ বন্দেগী বাবু নবলকিশোর, বহুত দয়া তোর। বুঝতে অসুবিধে নেই, এটা একটা শেখানো বুলি। হয় কাশীলাল, নয় কাশীলালের বউ জগমোতি ময়নাটাকে এই বুলি শিখিয়েছে। যা-ই হোক, শেখানো বুলিটা যে কাশীলাল আর জগমোতির কৃতজ্ঞতার প্রকাশ, তাতে তো কোন সন্দেহ নেই। ময়নাটার গলার স্বর খুবই মিষ্টি। কোন সন্দেহ নেই, এতটা মিষ্টি না হলে ওই বুলিটা নিছক একটা তোষামোদের চিৎকারের মতো শোনাতো।

ছোট্ট কালো পাহাড়ী ময়না, কিন্তু ক' মাসের মধ্যে কত রকমের বুলি বলতে ও

গাইতে শিখে ফেললো। কাশীলালের ঘরের পোষমানা এই ময়না বুলবুলের মতো শিস দেয়, চিলের ডাকের কাঁপা-কাঁপা স্বরের নকল করে, কোকিলকে ভেংচায়, বুড়ো মানুষকে ডুমুরতলার ছায়ায় শুয়ে পড়ে থাকতে দেখলে করুণ-গম্ভীর স্বরের বুলি ছাড়ে—রাম নাম সৎ হ্যায়! তসীলদার রামতনুকে একদিন তড়বড় করে টাট্টু ছুটিয়ে চলে যেতে দেখে চমৎকার ফুর্তির বুলি ছেড়েছিল ময়নাটা—হিপ হিপ হুররে!

এই ভাল। চৌকিদার কাশীলাল আর ওর বউ জগমোতির রুচিটা ভাল। পোষমানা ময়নাটা সব সময় ছাড়া থাকে। ওর জন্যে কোন দাঁড় নেই, খাঁচাও নেই। ওর পায়ে ছোট্ট এক টুকরো শিকলও নেই। খাঁচায় পুরে আর বন্ধ করেই যদি রাখা হলো, তবে আর পোষ-মানানো হলো কোথায়? সেকেলে নবাবদের ছবিতে দেখা যায়, একটা বুলবুলকে নিয়ে ভারিক্কি রকমের ঢং করে বসে আছেন নবাব, কিন্তু বুলবুলটার পায়ে শিকলি। বেচারা কাশীলাল, সামান্য একজন চৌকিদার, সে নিশ্চয় নবাবী রীতির কোন খবর রাখে না। তাই পোষমানা ময়নাটাকে সব সময় ছাড়া রাখতো। দেখেছে রামতনু, ময়নাটা একদিন জগমোতির খোঁপা থেকে উড়ে গিয়ে কাছাকাছি একটা গাছের মাথার ডালের উপর বসে পড়ে আর গো-গাড়ির বলদ হাঁকাবার গাড়োয়ানী স্বরের বুলি বাজাতে থাকে। হো হো হো, হেই হেই, ধীরি ধীরি! সত্যি দেখা যায়, তেঁতুলের বস্তায় বোঝাই হয়ে একটা গো-গাড়ি আসছে, কিন্তু দুই রোগা বলদ গাড়িটাকে আর টানতে না পেরে হাঁপাচ্ছে বলে গাড়োয়ান ওই রকম ভাষায় হাঁকের বুলি ছাড়ছে।

আবার সেই সেই প্রশ্ন। কোথায় গেল সেই চমৎকার বুলিবাজ চালাক ও রসিক ময়নাটা? তার মানে, কোথায় গেল কাশীলাল ও তার বউ জগমোতি?

চোখের সামনে দাঁড়িয়ে আছে ভীরু চেহারা ও ছিচকাঁদুনে ফুসফুসের যে মানুষটা, চৌকিদার রামটহল, তাকে সাহস দেবার জন্য দু-চারটে কথা মুখে মুখে বলতেই হয়। না বললে ভাল দেখায় না। লোকটাকে বদলি করে দেবার মতো কোন উপায় তসীলদার রামতনুর নেই। কিন্তু লোকটার ভয় ভেঙ্গে দিতে পারা যাবে না কেন? লোকটাকে বুঝিয়ে বললেই তো হয় যে, ভয় করলেই ভয়, ভয় না করলে ভয় থাকে না। মিথ্যে ভয়ের চাপে পড়ে দুর্বল মনের লোক নিজের চেনা ঘরের ভিতরেই নানারকম বিদঘুটে কান্না-টান্নার শব্দ শুনতে পায়। সামনেই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে বাঁশঝাড়, তার মধ্যে ফাটা-ফাটা গিঁটভাঙ্গা বাঁশগুলো নিশ্চয় রাতের বাতাসে দুলে দুলে উঁ উঁ উঁ কান্নাস্বরের আওয়াজ ছাড়ে।

না, চৌকিদার রামটহলকে নির্ভয় হবার একটা প্রেরণা দেবার জন্য রামতনু তৈরী হতেই বাধা পেল। চমকে ওঠে রামতনু। ঠিকই তো, আর কেউ নয়, ভাণ্ডারীজী আসছেন, এসে পড়েছেন। ভাণ্ডারীজীর টাট্টুর চার পা ধুলোয় ছেয়ে গিয়েছে।

চেঁচিয়ে কথা বলেন ভাণ্ডারীজী।—আপনি আজ আসবেন জেনে আপনাকে পথের কোথাও ধরবার জন্য আমি ইচ্ছে করেই এগেয়ে এসিছি। এঃ রামতনুবাবু, আপনি চলে যাবার পর থেকে আমার সন্ধ্যাবেলার প্রাণটা আপনাকে ধরবার জন্য বড়ই ছটফট করেছে, উপোসী শিয়াল যেমন মুর্গীর বাচ্চা ধরবার জন্য ছটফট করে।

এই চৌকিদার রামটহল আর সেই চৌকিদার কাশীলাল, দুজনের প্রাণের স্বভাবের মধ্যে কত তফাত। ভূতের ভয়ে চিঁচিঁ করছে রোগা হাড়সার চেহারার রামটহল। আর মজবুত চেহারার সেই চৌকিদার কাশীলালের প্রাণ যেন কৃতার্থতায় ধন্য হয়ে সব সময় হাসতো। কিন্তু ওটা যে একটা বিশ্বাসের হাসি, একটা গর্বের হাসি, সেটা ধারণা করতে পারেনি রামতনু। ধারণা করবার কোন দরকারও ছিল না। একদিন, যেদিন সন্ধ্যা হবার আগেই বাঘের ডাক শুনে ধাউলিয়ার জঙ্গলের সব হরিণ এলো-মেলো হয়ে এদিকে-ওদিকে ছুটে পালাতে থাকে সেদিন রামতনুকে রেল-লাইনের এই লেবেল-ক্রসিংয়ের গেটের কাছে থমকে দাঁড়াতে হয়েছিল। ছটফট করছে, দৌড়ে পালিয়ে যেতে চাইছে রামতনুর টাট্টু ঘোড়া। শব্দ করে রাশ টেনে ধরেও ঘোড়াটাকে শান্ত করতে পারা যাচ্ছে না। সেদিন সেই উদ্বিগ্ন অবস্থার মধ্যেই রামতনুকে হেসে ফেলতে হয়েছিল। জগমোতির খোঁপা থেকে উড়ে এসে চৌকিদার কাশীলালের কাঁধের উপর বসে পড়ে ময়না পাখিটা। বুলি ছাড়ে পাখিটা—ডরো মত্! ডরো মত্!

কাশীলাল হাসে।—রাম রাম তসীলদারজী।

রামতনু—রাম রাম!

কাশীলাল—ডরিয়ে মত্, তসীলদারজী। বাঘ ডাকছে ধাউলিয়ার পশ্চিমের জঙ্গলে। এই বাঘটার নিয়ম হলো ডাকতে ডাকতে ধাউলিয়ার পশ্চিমের জঙ্গল থেকে আরও পশ্চিমে চলে গিয়ে, ছুটোছুটি করে দু-একটা রাত-কানা গরুকে মেরে আর দামোদরের জল খেয়ে আবার ধাউলিয়ার জঙ্গলেই ফিরে যাবে। এদিকে আসবে না ওই বাঘ। তিন দিন হলো সেন সাহেব শিকার করতে বের হয়েছেন, তিনি বললেন যে, ধাউলিয়ার পূব দিকেব জঙ্গলে কোথাও বাঘের পায়ের ছাপ তিনি দেখতে পাননি।

রামতনু হাসে—পাখিটাকে ডরো মত্ বুলি কে শিখিয়েছে?

—শিখিয়েছেন ওই সেন সাহেব। উনি আমাকে অভয় নিয়ে বললেন, বাঘ এদিকে আসবে না, ডরো মত্, ডরো মত্। বাস্, পাখিটা সঙ্গে সঙ্গে বুলি ধরে ফেলেছে, ডরো মত্, ডরো মত্।

সেদিন ঘোড়ার লাগাম একটু দুলিয়ে দিয়ে রওনা হবার ইশারা দিতেই সেই কাশীলাল যেন গায়ে পড়ে রামতনুকে একটা বিশ্বাসের কথা শুনিয়ে দিয়েছিল, যেটা একটা গর্বের কথাও বটে।

কাশীলাল বলেছিল—একুশ টাকা মাইনের চৌকিদার হলেও আমার কোন অভাব নেই তসীলদারজী। নবলের মতো বন্ধু পেলে কারও জীবনে অভাবের দুঃখ থাকতে পারে না। নবলের মতো বন্ধু পেতে হলে অনেক সৌভাগ্যের জোর, অনেক পুণ্যের জোর থাকা চাই।

রামতনুর বুকের ভিতরে যেন একটা ঘুমন্ত দুঃখ হঠাৎ খোঁচা লেগে চমকে ওঠে। রামতনুর জীবনটা তার চিরপ্রিয় যে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলছে, সেই বিশ্বাস পেয়ে এই চৌকিদার কাশীলালের বুকটা ভরাট হয়ে রয়েছে। যে ভয়ানক শিক্ষা পেয়ে গিয়েছে রামতনুর এই বাইশ বছর বয়সের জীবনটা, সেটা এই যে, মানুষ বন্ধুকে বিশ্বাস নেই! বরং জঙ্গল বন্ধুকে, জঙ্গলের পাখি জানোয়ার সাপ আর পোকামাকড়কেও বিশ্বাস করা যায়, কিন্তু শহর-মার্কা কলেজমার্কা ও ভদ্রলোক-মার্কা কোন মানুষের বন্ধুত্বকে বিশ্বাস করতে নেই।

কাশীলাল হঠাৎ বলে ওঠে।—আমি বাঘের ডাকের ভয়ে এই চাকরি ছেড়ে কবেই পালিয়ে যেতাম, যদি নবেলের মতো মানুষের বন্ধুত্ব না পেতাম। ভেবে দেখুন তসীলদারজী, কোথায় আমি একুশ টাকা মাইনের একজন চৌকিদার; আর কোথায় নবলকিশোর সিং কিসুনগড়ের জমিদারীর একমাত্র মালিকের একমাত্র ছেলে। আপনি কি জানেন যে নবলের বিয়েতে হাতির মিছিল বের হয়েছিল?

রামতনু—না।

চৌকিদার রামটহলের ভীরু প্রাণের চিঁচিঁ বিলাপ, আর ভাণ্ডারীজীর গলা-ফাটানো শব্দের ডাক, দুই শব্দের ধাক্কা খেয়ে রামতনুর মনের চিন্তাটা যেন পুরনো স্মৃতির বেড়া ভেঙ্গে বর্তমানের আলো-ছায়ার মধ্যে ফিরে আসে। না সেই খাঁটি বন্ধু পাওয়া সৌভাগ্যের মানুষটা, সর্বদা হাসি-হাসি মুখ সেই চৌকিদার কাশীলাল এখানে আর নেই।

রামতনুর আরও কাছে এগিয়ে এসে ভাণ্ডারীজী তাঁর ঘোড়ার রাশ টানলেন। চৌকিদার রামটহলের দিকে তাকিয়ে বেশ বিরক্ত স্বরে চেঁচিয়ে উঠলেন—অ্যাঁ মানুষকে মিছিমিছি বিরক্ত করবার অভ্যাস এখনও ছাড়তে পারলে না? যাও, সরে যাও, তসীলদারজীকে তোমার নাকি সুরের যত আবোল তাবোল মিথ্যে গল্প শোনাতে হবে না।

রামতনু—সেই চৌকিদার কাশীলাল কবে চলে গেল?

প্রশ্ন শুনে চমকে উঠলেন ভাণ্ডারীজী। দুই চোখের ভুরু যেন হঠাৎ নিঝুম হয়ে ঝুলে পড়লো। ভাণ্ডারীজী বিড়বিড় স্বরে কথা বলেন—হ্যাঁ আপনি তো প্রায় দু' বছর হলো এই তল্লাট ছেড়ে একেবারে ওই তল্লাটে চলে গিয়ে দিন কাটিয়েছেন, তাই খবরটা জানেন না। চৌকিদার কাশীলাল কাজ ছেড়ে চলে যায়নি, কাশীলাল খুন হয়েছে।

রামতনু—অ্যাঁ! কেন?

ভাণ্ডারীজী করুণ ভঙ্গীতে হাসেন—কেন সে প্রশ্নের জবাব ভগবান জানেন। এখানে আমরা কেউ শত সন্দেহ করেও বুঝতে পারিনি কাশীলালকে খুন করতে পারে কে বা কারা ?

তসীলদার রামতনু ও ভাণ্ডারীজী, দুই সওয়ারের দুই টাট্টু পাশাপাশি চলতে থাকে। ধাউলিয়ার লেবেল-ক্রসিং থেকে ভেলাডিহি পেঁছিতে বেলা শেষ হয়ে যায়। শেষ রোদের আভার চেহারাটাকে তালবনের মাথার উপর যেন আকাশ থেকে ঝড়ে পড়া একটা রক্ত-ধারার আভার মতো দেখায়। হাত দিয়ে খুব জোরে রগড়ে রগড়ে চোখ মোছে রামতনু। ভেলাডিহিতে পেঁছিবার আগের সারাটা পথ শুধু কাশীলালের কথাই মনে পড়ে।

॥ দুই ॥

ভেলাডিহির তসীলদারী কাছারীর বারান্দায় একটা চৌকির উপর বসে আকাশে ও বনের গাছপালার মাথায় পাখির আনা-গোনার দৃশ্য দেখতে খুব ভাল লাগে। টিয়ে পাখির ঝাঁক এসে কাছারিবাড়ির আঙিনার জামগাছের পাতার উপর ঠোকর দিয়ে খেলা করে। কাকের আর্তনাদ শুনেই বুঝতে পারে রামতনু, দেখতেও পায় যে, তাল গাছের মাথার উপর বসে আছে একটা শিকরে বাজ। পাহাড়ী ময়নার একটা ঝাঁক উড়তে উড়তে কাছারীবাড়ীর কাছেই এসে পড়েছিল, কিন্তু হঠাৎ আতঙ্কিত হয়ে আর গতির মুখ ঘুরিয়ে দিয়ে লুটুয়া পাহাড়ের জঙ্গলের দিকে চলে গেল। বোধ হয় তালগাছের মাথায় শিকরে বাজটাকে দেখতে পেয়েছে পাহাড়ী ময়নার এই ঝাঁকটা। কিন্তু আবার পাহাড়ী ময়নারই একটা ঝাঁক আসছে। উড়ে এসে কাছারীবাড়ির আঙিনার জামগাছের উপর বসেছে। না, তালগাছের মাথার উপর সেই বাজটা আর নেই। তবু কে জানে কেন, পাহাড়ী ময়নার ঝাঁক যেন এক পলকের কোন ইশারায় উড়ে চলে গেল। প্রফেসর চারুবাবুর পক্ষিতত্ত্বের কথাগুলিতে আর নিতান্ত অতিভাবুকের কল্পনার কথা বলে মনে হয় না। কাছারী-বাড়ির ঘরগুলির পুরনো টিনের চালা, নতুন লাল টালির চালা নয়। তার উপর কোন রং নেই। লতা নেই ফুল নেই, ফাড়িং-প্রজাপতি নেই। রূপ নেই; তবে পাহাড়ী ময়নার চোখ আর প্রাণ কিসের টানে নেমে আসবে আর চালার উপর বসবে ?

একদিন ভোরবেলাতেই ভাণ্ডারীজী হঠাৎ এসে আর চেঁচিয়ে হেসে উঠলেন—নেমন্তন্ন রামতনুবাবু। নবল-কিশোরবাবু আপনাকে ও আমাকে নেমন্তন্ন করেছেন। এই যে, এঁরা এসেছেন নেমন্তন্নর চিঠি নিয়ে।

হ্যাঁ দেখে চিনতেও পারে রামতনু, এই দুজন হলো কিসুনগড় জমিদারীর দুই পেয়েদা। ওরা পেয়দার চাকরী করে, সেই সঙ্গে আবার পাখির চালানী কারবারও করে। নেমন্তন্নের চিঠিটা রামতনুর হাতের কাছে এগিয়ে দিয়েই পেয়াদা মঙ্গল

রায় বলে ঃ আঃ, নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস হতো না আপনাদের ভেলাডিহিতে পাহাড়ী ময়নার এত আনাগোনা আছে। এক একটা ঝাঁকে কম করেও ত্রিশ-চল্লিশটা পাখি। আঃ, দয়া করে হুকুম দিন তসীলদারজী, এই মরসুমের ভেলাডিহির জঙ্গলের সব ময়নার ঝাঁক ধরবার একটা অনুমতি দিয়ে দিন, হুজুর।

রামতনু—না। তা হয় না।

পেয়াদা মঙ্গল রায় বলে—কিন্তু আমাদের নবলবাবু নিজেই ইচ্ছে করে অর্ডার দিয়েছেন পাহাড়ী ময়নার সব ঝাঁক জালবন্দী করে বাজারে ব্যাপারীদের কাছে বেচে দাও।

বেহায়া পেয়াদা মঙ্গল রায় আবার হাত জোড় করে—আর একবার ভেবে দেখুন, তসীলদারজী। আমরা আবার এসে খোঁজ নেব।

নেমন্তন্নের চিঠিওয়ালা দুই পেয়াদার অন্তর্ধানের পর ভাণ্ডারীজী বললেন—সত্যি রামতনুবাবু নবলকিশোরবাবুর মতো সৎ মানুষ, ভদ্র মানুষ আর দয়ার মানুষ হয় না। হলেও খুব কমই হয়। চৌকিদার কাশীলাল খুন হবার পর শোক-দুঃখ সহ্য করতে না পেরে নবলবাবু প্রায় পাগল হয়ে গিয়েছিলেন। পুরো একটা মাস দিন-রাত সমানে কেঁদেছিলেন। থানার বড় দারোগা ওংকারবাবুকে বলেছিলেন ঃ আমি আপনাকে পাঁচ হাজার টাকা ইনাম দেব বড়বাবু, যদি আপনি খুনীকে ধরে ফেলতে পারেন। আমার বন্ধু কাশীলাল, সে একটা চৌকিদার হোক বা যা-ই হোক, তাকে খুন করছে যে, তার ফাঁসি না হওয়া পর্যন্ত আমার চোখে ঘুম আসবে না।

নবলবাবুর পিতাজী বাবু ভরত সিং রায়সাহেব হয়েছেন। ডেপুটি কমিশনার মস্টার কলিন্সকে পাঁচ বছর ধরে প্রতি শীতের মরসুমে বড় বড় বাঘ শিকার করিয়ে দিতে সবচেয়ে বেশী সাহায্য করেছেন যিনি, তিনি হলেন এই ভরত সিং। ডেপুটি কমিশনারের বাঘ শিকারের আমোদ পূর্ণ করে তোলবার জন্য যা করা দরকার, জঙ্গলে তাঁবু পাতবার, মাচান করবার, আর হুইস্কি-ব্র্যাণ্ডি যোগান দেবার সব দায়িত্ব ও কর্তব্য একা বহন করেছেন বাবু ভরত সিং। কাজেই…।

তাই কিসুনগড়ের জমিদার বাড়িতে উৎসবের ব্যবস্থা হয়েছে। নিমন্ত্রিত সাহেবদের জন্য শিকারের ও খানাপিনার সুব্যবস্থা হয়েছে। নিমন্ত্রিত দেশী বাবুদের পরিতৃপ্তির জন্য গয়া থেকে রাবড়ি আর বালুসাহি আনা হয়েছে। গাজিপুরী বাঈজীর নাচ-গানও হবে। তা ছাড়া, নবলবাবুর মনের আসল পরিচয় এটাতেই পাওয়া যায়. প্রায় হাজারখানেক গরীব আদিবাসীকে ভাত খাওয়াবার ও হাঁড়িয়া পান করাবার ব্যবস্থা করেছেন নবলবাবু। এর উপর ধাউলিয়া বাজারের যত কানা-খোঁড়া ভিখারীকে পেটভরে খিচুড়ি খাওয়াবার ব্যবস্থাও হয়েছে।

কিন্তু কী দুঃখের কথা, রামতনু, কিছুর মধ্যে কিছু না, কাশীলাল কেন যেন কদিন কাউকে কোন খবর না দিয়ে, কাউকে কিছু জানতে না দিয়ে, একেবারে

ওর বউ জগমোতিকে নিয়ে লাতেহারে ওর এক খুড়শ্বশুরের বাড়িতে পেঁছে দি এল।

—কেন ?

—কেন, কে জানে ? কী রামতনুবাবু, আপনি ওরকম আনমনা হয়ে কী ভাবছেন বলুন তো। আমার কথাগুলো শুনছেন কি শুনছেন না, বুঝতে পারছি না।

রামতনু—শুনেছি, ভাণ্ডারীজী। শুনে খুব অস্বস্তি বোধ করছি।

ভাণ্ডারীজী—আমারও একটু আশ্চর্য বোধ করতে হয়েছে। নবলবাবুর মতো বন্ধু মানুষ কত চেষ্টা করলো, টাকা খরচ করলো, তবু খুনের কুলকিনারা হলো না।

রামতনু—যা-ই হোক, এসব কথা ছাড়ুন ভাণ্ডারীজী। আমার মোটকথা এই যে, আমি নবলবাবুর বাবার ওই রায় সাহেবী আনন্দের নেমন্তন্নে যাব না।

ভাণ্ডারীজী—অ্যাঁ ; হ্যাঁ, বুঝেছি রামতনুবাবু। আমি আগেও দেখেছি ছোকরা বাঙালীবাবুরা বড়ই স্বদেশী মেজাজের মানুষ, ওরা রায়সাহেবী নেমন্তন্ন একটুও পছন্দ করে না।

কথা বন্ধ করতে গিয়েও কথা বন্ধ করেন না ভাণ্ডারীজী। চেঁচিয়ে কেঁদে ওঠেন আর কথা বলেন। ওঃ, হায় ভগবান, সে কী নিষ্ঠুর দৃশ্য !

যেন ভাণ্ডারীজীর মনের ভিতরে ভয়ানক একটা স্মৃতির ছবি শিউরে উঠেছে লাতেহারে খুড়শ্বশুরের বাড়িতে জগমোতিকে রেখে দিয়ে সেই রাতেই ফিরে এসেছিল কাশীলাল। কেউ জানে না, কেউ বলতে পারে না, সে রাতে ঠিক কখন ফিরে এসে এই গুমটি ঘরের ভিতরে ঢুকেছিল। সকালবেলা একটা ভাট-ভিক্ষুক দৌড়ে এসে ধাউলিয়া বাজারের পুলিশ চৌকিতে খবর দিয়েছিল ঃ কাশীলাল খুন হয়েছে গুমটি ঘরের দরজা খোলা, বাইরে থেকেই দেখতে পাওয়া যায় ; কাশীলালের রক্তমাখা লাস পড়ে রয়েছে।

কী আশ্চর্য ; ভোজালির এক কোপে গলাটা কেটে না ফেলে খুনী কেন যে কাশীলালের বুকের উপর ভোজালির দশটা কোপ বসিয়েছে, সেটা বুঝতে না পেরে আশ্চর্য হয়েছেন থানার বড় দারোগা শুক্কারবাবু। খুনীর সব আক্রোশ যেন কাশীলালের বুকটারই উপর। খুনী লোকটার আশার স্বপ্নটাকে ছোবল দিয়ে মেরে ফেলে দশটা সাপ কাশীলালের বুকের ভিতরে লুকিয়েছিল। কাশীলালের ঘরে পেতল-কাঁসার কিছু বাসন ছিল, আধসের ঘি ছিল, রবারের একটা বর্ষাতি জামা ছিল, আর, একটা পিতলের ঝাঁপির মধ্যে একটা সোনার হার ; খোঁপায় পরবার সোনারদুটো ফুল আর একটা রুপো বাঁধানো চিরুণীও ছিল। কিন্তু কই কী আশ্চর্য, খুনী তো এসব জিনিসের কিছুই স্পর্শ করেনি। সবই ঘরের দেয়ালের তাক আর মেজের উপর পড়েছিল খুনীর কোন লোভ সে সব জিনিসের সামান্য

নড়চড়ও করেনি। সত্যিই তো এটা একটা অদ্ভুত নির্লোভ খুনের কাণ্ড বলে মনে হয়।

রামতনু—কাশীলাল হঠাৎ ওর বউকে লাতেহারে খুড়শ্বশুরের বাড়িতে কেন রেখে এসেছিল, সেটা কি কারও কাছ থেকে কখনও জানতে পেরেছেন?

ভাণ্ডারীজী দুই চোখ বড় করে হাই তোলেন।—হ্যাঁ, মনে পড়ছে, কথাটা বলতে ভুলে গিয়েছি, রামতনুবাবু। আমাদের এই ভেলাডিহির জঙ্গলের হাড়কুড়ুনী বুড়িকে আপনি তো দেখেছেন?

—হ্যাঁ।

—ওই বুড়ি হলো এই নতুন চৌকিদার রামটহলের মা। বুড়ির সঙ্গে কাশীলালের বউ জগমোতির খুব ভাব-সাব ছিল। বুড়ির মুখ থেকে আমরা শুধু এইটুকুই শুনতে পেয়েছিলাম যে জগমোতিই হঠাৎ সেদিন খুব উতলা হয়ে বায়না ধরেছিল: আমাকে এখনই লাতেহারে চাচাজীর বাড়িতে রেখে এসো, আমি আর একটা দিনও এখানে থাকবো না। এখানে থাকলে বাঘ আমাকে ছিঁড়েছুঁড়ে খেয়ে ফেলবে।

ভোরের ট্রেন পাস করিয়ে দিয়েই নুন কেনবার জন্য ধাউলিয়া বাজারে চলে গিয়েছিল চৌকিদার কাশীলাল। ফিরে এসে দেখে, ঘরের ভিতরে ছটফট করছে জগমোতি। ভয়ে উতলা হয়ে, যেন একটা দুঃস্বপ্নের দিকে তাকিয়ে কথা বলছে, নহি কভি নেহি, হঠ যাও, জলদি যাও। হাড়কুড়ুনী বুড়ীও ঠিক সেই মুহূর্তে ঘরের দরজার কাছে এসে হাঁউমাউ করে কাঁদতে শুরু করে, হায়রে হায়, বউটাকে ডাইন ছুঁয়েছে, কী হবে উপায়?

জগমোতির মাথায় জল ছিটিয়ে সান্ত্বনা দেয় কাশীলাল। খুব গম্ভীর কাশীলাল। তারপরেই বলে ওঠে—চলো মোতি, এখনই চলো।

হাড়কুড়ুনী বুড়িকে দুটো রুটি খেতে দিয়ে তখনি চলে গেল বউটা। কাশীলালের সঙ্গে রেললাইনের কিনারা ধরে ওরা হেঁটেছিল। বুঝতে পারা যায়, প্রথমে ধাউলিয়া বাজার, তারপর সেখান থেকে মোটরবাসে চড়ে ওরা লাতেহার পৌঁছে গিয়েছিল সেদিনের সন্ধ্যা হবার অনেক আগে। পরদিন দুপুরবেলা আমি যখন গাড়ী থামিয়ে এখানে গুমটিঘরের চৌকিদার কাশীলালকে ডাক দিয়ে কোন সাড়া পেলাম না, তখন দেখলাম বন্ধ দরজার কড়াতে তালা ঝুলছে।

রামতনু—আপনি এসব কথা থানার বড় দারোগাকে বলেননি?

হেসে ফেলেন ভাণ্ডারীজী—বলেছি, যা জানি, যতটুকু জানি, সবই বলেছি।

ভাণ্ডারীজীর মুখের ধারাবিবরণীর মাঝখানে বাধা দিয়ে প্রশ্ন করে রামতনু।—কাশীলালের খুনের কোন কূলকিনারা কি এখনও হয়নি?

ভাণ্ডারীজী—না, রামতনু। এখনও চেষ্টা চলছে। থানার বড় দারোগা ওংকারবাবু কথা দিয়েছেন: আমি সহজে ছাড়ছি না, আমার জিউ-জান ভিড়িয়ে দিয়ে খুনীকে ধরবার চেষ্টা চালিয়ে যাব। কিন্তু বড় দারোগা ওংকারবাবুও খুব

একচোট হেসেছিলেন আর বলেছিলেন—ও সব খবরে আমার তদন্তের কোন লাভ নেই, ভাণ্ডারীজী। খুনীর নাম বলুন, তবে বুঝবো খবরের মতো একটা খবর দিয়েছেন।

রামতনু কিছুক্ষণ কী যেন ভাবে, তারপর হঠাৎ ব্যস্ততায় ছটফট করে ওঠে। —চলুন, ভাণ্ডারীজী।

—কোথায় ?

রামতনু—চলুন কিসুনগড়ের রায়সাহেবী উৎসব দেখে আসি।

ভাণ্ডারীজী খুশি হয়ে হাঁকডাক করেন ;—এ ভুলন, এ লছমন, জলদি দুই ঘোড়ার পিঠে গদি চড়াও।

—আপনি আজ নিজের চোখে দেখতে পাবেন রামতনুবাবু। বন্ধু কাশীলালের জন্য কী দরদ আর কত মায়া যে ছিল নবলবাবুর প্রাণে, তার প্রমাণ আজও তুমি দেখতে পাবে ? না রামতনু, তুমি বিশ্বাস কর বা না কর, নবলবাবুর মতো দিলদার বন্ধু-মানুষ হয় না।

॥ তিন ॥

হ্যাঁ, প্রমাণ দেখতে পেয়েছে রামতনু। দেখতে পেয়ে বেশ একটু আশ্চর্যও হয়েছে। রায়সাহেব ভরত সিং-এর প্রকাণ্ড গড়বাড়ির ফটক দিয়ে ভিতরে ঢুকে একটা বারান্দায় উঠতেই চোখে পড়েছে রামতনুর, সত্যিই তো দেয়ালের গায়ে নবলবাবুর গরীব বন্ধু কাশীলালের ফটো ঝুলছে। ফটোটা বড় বড় টাটকা ফুলের মালা দিয়ে জড়ানো। সবাই দেখছে, নেমন্তন্নের সাহেব আর দেশী ভদ্রলোক যাঁরা আসছেন, তাঁদের সবারই চোখে ফুলমালায় জড়ানো কাশীলালের ফটোটা চোখে পড়ছে।,

জোরে ঘোড়া ছুটিয়ে এলেও কিসুনগড়ের এই জমিদারবাড়িতে পেঁছিতে প্রায় দুপুর হয়ে গিয়েছে। গড়-বাড়ির প্রকাণ্ড আঙিনার উপর মখমলের ছোট একটি সামিয়ানার নীচে শিকারী সাহেবদের খানা-পিনার আসর। এখন পর্যন্ত শুধু দুজন সাহেব এসে পেঁছেছেন আর হুইস্কি খেতে শুরু করেছেন, দুজন কোলিয়ারী সাহেব। সন্ধ্যে হবার আগেই সব সাহেবের পেঁছে যাবার কথা। জঙ্গলে তাঁদের বাঘ-শিকারের ছ'টা মাচান করা হয়েছে। তিনটে মাচানের নীচে তিনটে সাদা ছাগল আর তিনটে মাচানের নীচে রোগা লিকলিকে তিনটে মোষের বাচ্চা বেঁধে রাখা হয়েছে, রাতের বাঘকে ছলিয়ে আর লুভিয়ে আনবার ছ'টা টোপ।

বারান্দার উপরে ঢালাও ফরাসের উপর বসে আছেন অভ্যাগত অনেক মানুষ তাঁর মধ্যে যেন ধাউলিয়ার ডাকবাবু আছেন, তেমনই সুরজপুরের গাঁও পঞ্চায়েতের বড় মাহাতোও আছেন। আছেন গিরিডির নতুন ডি এস পি, গোয়ানিজ সাহেব

নিস্টার প্যারেরা। আর, গো-গাড়ি থেকে নামছে গয়ার বালুসাহির যে সব ঝুড়ি, সেগুলিকে তুলে নিয়ে আঙিনার এদিকের একটা নতুন ঘরের ভিতর রাখা হচ্ছে। চমকে ওঠে রামতনুর দুই চোখের দৃষ্টি। আশ্চর্য, এই ঘরটার চেহারা যে রেল লাইনের লেবেল-ক্রসিংয়ের কাছে চৌকিদার কাশীলালের সেই গুমটি ঘরটারই মতো, উপরে নতুন লালচে টালির চালা, তার উপর একটি উচ্ছেলতা গাড়িয়ে শুয়ে রয়েছে। উচ্ছে ফুলের উপর ফরফর করে হলদে ফড়িং উড়ছে। সত্যি আশ্চর্য হতে হয়, কেউ কি ভুল করে কিংবা ইচ্ছে করেই এই কাণ্ড করেছে?

নবলবাবুর সহাস্য মূর্তিটা হাতজোড় করে নমস্তে জানিয়ে অভ্যাগত জনতার সামনে এসে দাঁড়ালেন। ভাণ্ডারীজীকে দেখতে পেয়েই এগিয়ে এলেন নবলবাবু। ছোট ঘরটার দিকে তাকিয়ে কথা বলেন নবলবাবু, আমাদের নায়েববাবুর বুদ্ধি-সুদ্ধির অবস্থা খুবই খারাপ হয়েছে।

ভাণ্ডারীজী—কী ব্যাপার, নবলবাবু?

নবলবাবু—নতুন একটা লম্বা চওড়া আলু গুদামের ঘর তৈরি করতে বলেছিলাম নায়েববাবুকে; একবারও সন্দেহ হয়নি যে উনি ওঁর মাথার ভুলে ওরকম ছোট্ট একটা নতুন টালির চালাওয়ালা ঘর তৈরি করে ফেলবেন। আবার শখ করে একটা উচ্ছেলতাকে চালার উপর চাড়িয়ে দেবেন।

সেই মুহূর্তে চমকে ওঠেন নবলবাবু; চমকে ওঠে ভেলাডিহির তসীলদার রামতনুও।

ঠিক ঠিক ঠিক, প্রফেসর চারুবাবুর সেই ধারণার কথাগুলি একটুও বেঠিক কল্পনার কথা নয়। একেবারে বাস্তব সত্যের কথা। পাখিরা আর্ট বোঝে, ওরা ওদের পছন্দসই রূপের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আর খুশি হয়। ঠিক ঠিক ঠিক, ওই তো কে জানে কোথাকার কোন্ ঝাঁক থেকে ছাড়া পেয়ে একটা পাহাড়ী ময়না ওই নতুন লালচে টালির চালার উপর উচ্ছেলতার কাছে ফড়িং ধরবার জন্যে লাফালাফি করছে। যেমন সেই চৌকিদার কাশীলালের ছোট্ট গুমটি ঘরের নতুন লালচে টালির চালার উপর তেমনই এখানে এই ··।

আরও আশ্চর্য হয়ে চমকে ওঠে রামতনু, চমকে ওঠেন ভাণ্ডারীজী, চমকে ওঠেন রায়সাহেবী নেমন্তন্নের দেড়শো অভ্যাগত জনের সবাই। এ কী, এ কথার মানে কী, টালির চালার উপর বসে একটা পাহাড়ী ময়না এ কিসের বুলি বলছে?—এ নবল-ভাই, মত্ মারো, মত্ মারো। পাখির বুলি আর গলাবাজির স্বরটা যেন একটা ভয়ানক যন্ত্রণার আর্তস্বর।

ভাণ্ডারীজীকে আস্তে একটা ঠেলা দিয়ে সরিয়ে রামতনু এইবার নিজে এগিয়ে যায় আর নবলবাবুর চোখের সামনে শক্ত হয়ে দাঁড়ায়।

দুই চোখ বন্ধ করে আর থরথর করে কাঁপতে থাকেন সুঠাম সুদর্শন রাজপুত, বাবু নবলকিশোর সিং। চুপসে গিয়েছে নবলবাবুর চওড়া বুকটা। হাত দুটো

যেন বাতাসটাকে আঁকড়ে ধরতে চেষ্টা করছে। টলছে নবলবাবু। চোখ মেলে চারদিকে তাকায়। কটকটে লাল দুই চোখ থেকে যেন এইবার রক্ত ঝরে পড়বে। আশ্চর্য, কট্টর রাজপুত নবলবাবুর এই লাল চোখ দুটো আতঙ্কে ভরে গিয়ে নতুন টালির চালার দিকে তাকিয়ে থাকে। তখনো বুলি ছাড়ছে সেই অদ্ভুত পাহাড়ী ময়না, জগমোতির আদরের পোষা ময়না—এ নবল ভাই মত্ মারো, মত্ মারো।

সবার আগে উঠে দাঁড়ালেন নতুন ডি এস পি, কালো গোয়ানিজ সাহেব, মিস্টার প্যারেরা। পকেটের ভিতর থেকে পিস্তল বের করে নিয়ে আর নবলবাবুর দিকে তাকিয়ে হাঁক দিলেন—খবরদার। চুপসে খাড়া রহো।

নেমন্তন্নের দেড়শো অভ্যাগত মানুষের মধ্যে আর একটি মানুষ একেবারে উন্মত্ত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর ছুটে এসে নবলবাবুর চুলের ঝুঁটি দুই হাতে শক্ত করে চেপে ধরলেন।—খুনী ধরা পড়েছে। ভাই সব, দেখুন দেখুন, চৌকিদার কাশীলালকে খুন করেছে যে, তাকে একবার দেখুন।

উন্মত্ত হয়ে খুনী নবলবাবুর চুলের ঝুঁটি চেপে ধরেছেন যিনি, তিনি হলেন জগমোতির চাচাজী, লাতেহারের বাবু বৃন্দাবন সিং।

ঘটনার বিস্ময় সহ্য করতে না পেরে শুধু ফ্যালফ্যাল করে রামতনুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন ভাণ্ডারীজী। তারপর বিড়বিড় করে কথা বলেন—এ কী ব্যাপার রামতনু। আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।

রামতনু—ব্যাপার এই যে, পাহাড়ী ময়নাটা ওংকারবাবুর মতো মানুষ-প্রাণী নয়। পাহাড়ী ময়নারা ঘুষ খায় না, আর খুনীকে রেহাইও দেয় না।

নবলবাবু গ্রেপ্তার হয়ে সদরের জেল হাজতে চালান হবার ক'দিন পরে ধাউলিয়ার রেল-লাইনের লেবেল-ক্রসিংয়ের চৌকিদার রামটহলকে নিশান দোলাতে দেখে ঘোড়া থামিয়েছিল তসীলদার রামতনু। জিজ্ঞেস করেছিল—কী রামটহল, মাঝ রাতে তোমার ঘরে কি আর বোবার কান্নার মতো কোন গোঙানির শব্দ শুনতে পাও?

হেসে ফেলে রামটহল—না বাবু না। ও সব খারাপ শব্দ-টব্দ আর শুনতে পাই না। আমিই আজকাল মাঝ রাতে গলা ছেড়ে গান করি।

—কিসের গান? রামনামের গান?

—না বাবু, এই মামুলি একটা গান। চুপকি চুপকি বোল ময়না, চুপকি চুপকি বোল।

জগনপুরের দীপালি রায়

ছোটনাগপুরের সাদা কাঁকরের একটা ডাঙ্গা আর সাঁওতাল পরগণার লালচে মাটির একটা ডাঙ্গা যেখানে এসে মিলে-মিশে একাকার হয়ে গিয়েছে, সেখানে দাঁড়ালে মহেশমুণ্ডা পাহাড়ের চেহারাটা স্পষ্ট দেখা যায়। মধুপুর-গিরিডি লাইনের ট্রেন যখন যায় কিংবা আসে, শুধু তখন পাহাড়ের চেহারাটা ট্রেনের ইঞ্জিনের কালো ধোঁয়ার আড়ালে পড়ে অদৃশ্য হয়ে যায়। জায়গাটার নাম জগনপুর। এই জগনপুর থেকে মোটরবাসে রওনা হয়ে ও শহর গিরিডিকে ছাড়িয়ে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের উপর ডুমরি বস্তিতে পৌঁছতে সময় লাগে আড়াই ঘণ্টা। এরপর দক্ষিণের শালমহুয়ার যে জঙ্গলটা পুরো ত্রিশ মাইল পর্যন্ত এগিয়ে যেখানে গিয়ে ফুরিয়েছে, সেখান থেকে শুরু হয়েছে ভেলাডিহির সেই সেগুন খেজুর আর বাঁশের বিরাট জঙ্গল।

বাঙালীরা যাঁরা প্রথম জগনপুরে এসে বাস করতে শুরু করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে শুধু দুজনের জীবনে ভাগ্যলক্ষ্মী প্রসন্ন হয়েছেন। মুরলীবাবু এখন গিরিডির কাছের জঙ্গলের দুটি বড় অভ্রখনির মালিক। ভুবনবাবু একটি বড় অভ্রখনির মালিক। সনাতনবাবু কিন্তু কোন কিছুরই মালিক হতে পারেননি, যদিও তিনি এখানে ভুবনবাবু ও মুরলীবাবুর আগমনের অনেক আগেই এসে রোজগারের রাস্তা খুঁজেছিলেন। মোক্তারী করেন সনাতনবাবু। সপ্তাহে দুটি কিংবা তিনটি দিনে গিরিডিতে গিয়ে ছোট আদালতের বারান্দায় ঘোরাঘুরি করে মক্কেল ধরতে চেষ্টা করেন। মাঝে-মাঝে দুটি-একটি মক্কেল পেয়েও যান। সম্পত্তি বলতে তাঁর শুধু একটা নার্সারি আছে। অনেক দিনের অবহেলায় ও অযত্নে সেই নার্সারির সব গোলাপের গাছ এখন মর-মর অবস্থায় এসে পৌঁছেছে। আর দুই-এক বছরের মধ্যে শুকিয়ে মরেই যাবে বলে সন্দেহ হয়।

তবু এই মুমূর্ষু নার্সারির চমৎকার সৌগন্ধের আমোদ এক-একদিন সন্ধ্যায় বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে জগনপুরের অনেক বেরসিক বাড়ির প্রাণেও আবেশ ধরিয়ে দেয়। মুরলীবাবু বলে ওঠেন—বাঃ, সনাতনের নার্সারিটার এখনও প্রাণ আছে বলে মনে হচ্ছে। ভুবনবাবু বলেন—মোক্তারী ফোক্তারী ছেড়ে দিয়ে সনাতন এখন যদি নার্সারিটাকেই একটু ভাল করে তুলতে পারে, তবে অন্তত মাসে পঞ্চাশটা টাকা রোজগার সহজেই সম্ভব হবে।

যাঁর নার্সারি, যাঁর বাড়িটা নার্সারির বেড়ার কাছে দাঁড়িয়ে প্রায় সব সময়ই বাসি গোলাপের ঝরা পাপড়ির সুবাস উপভোগ করে, সেই বাড়ির প্রাণে অহরহ একটা উদ্বেগ ছটফট করে। মেয়ের বিয়ে হবে কী করে? নার্সারির ঝরা ফুল কুড়িয়ে-

কুড়িয়েই কি মেয়েটার জীবন ফুরিয়ে যাবে? সন্ধ্যার চাঁদের আলোতে নার্সারির এদিকে-ওদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে মেয়েটা, বাড়ির বারান্দার উপর দাঁড়িয়ে অনেকবার এই দৃশ্য দেখেছেন বাড়ির বাপ ও মা, অর্থাৎ সনাতনবাবু ও তাঁর স্ত্রী শুভময়ী।

মেয়ে দীপালিকে সুন্দরই বলা চলে। কিন্তু বয়সটা আর-একটু বেড়ে গেলে মেয়ের এই সুন্দর চেহারায় কোন সুন্দরতা কি আর থাকবে? মেয়ের বয়সের সত্যি হিসেব কারও কাছে বলতে পারেন না শুভময়ী। বলেন, এই তো কুড়িতে পড়েছে। কিন্তু মেয়ের চেহারা তো শেষ পর্যন্ত এরকম একটা বানানো হিসাবের কোন ধার ধারবে না। বয়সের বাড় আর বেশী বেড়ে গেলে মেয়ের চেহারাতে এখনও যেটুকু লাবণ্য আছে সেটুকুও ক্রমেই ফিকে হয়ে যেতে থাকবে, শরীরে স্বাস্থ্যের আঁটুনি থাকুক বা না-থাকুক।

মুরলীবাবুর ছেলে কলকাতাতে আইন পড়ছে। ছেলে সোমনাথের বয়স ত্রিশ-বত্রিশ হবে। এইরকম বয়সের ছেলের সঙ্গে ত্রিশ-বত্রিশ বয়সের দীপালির বিয়ে হতে পারে, হলে ভালই হবে। কিন্তু এরকম আশা করবার কোন মানেই হয় না। জগনপুরের সবচেয়ে মান্যবর বড়লোক মুরলীবাবু তাঁর ছেলের সঙ্গে মোক্তার সনাতনের মেয়ের বিয়ে কল্পনাই করতে পারবেন না। তিনটে তালি দেওয়া একটা ময়লা চেহারার কোট গায়ে দিয়ে আদালতে যায় যে মোক্তারটা, তার সঙ্গে কি মুরলীবাবুর কুটুম্বিতা হতে পারে?

আর কে আছে ভাল পাত্র? জগনপুরের দ্বিতীয় মান্যবর বড়লোক ভুবন-বাবুরও একটি ছেলে আছে, কিন্তু...।

শুভময়ীর কাছে কথাটা বলতে গিয়ে হেসে ফেলেন সনাতনবাবু।—ভুবনবাবুর ছেলের বয়সটা তো জান, উনিশ-কুড়ির বেশী হবে না।

শুভময়ী—কিন্তু ছেলেটা দেখতে কী চমৎকার। বয়সের কথা না থাকলে বলতে হবে, আমাদের দীপালিকে ভুবনবাবুর ছেলে অনিমেষেরই সঙ্গে মানাবে।

সনাতনবাবু—হতে পারে। কিন্তু সেটা তো কোন কাজের কথা নয়। ভুবনবাবু তাঁর উনিশ-কুড়ি বছর বয়সের ছেলেকে তোমার মেয়ের সঙ্গে বিয়ে কখনই দিতে চাইবেন না।

শুভময়ী—তোমার এসব কথারও কোন মানে হয় না। আসল কথা হলো, তোমার মতো গরীবের মেয়ের সঙ্গে খাদওয়ালা বড়লোক দুই বাবুর কোন বাবুই তাঁর ছেলের বিয়ে দিতে রাজি হবেন না।

সনাতনবাবু।—কিন্তু আমার পক্ষে তো হঠাৎ একটা বড়লোক হয়ে যাওয়া সম্ভব নয়।

শুভময়ী—চেষ্টা করলে হওয়া যায় বৈকি।

ভুবনবাবুর উনিশ-কুড়ি বছর বয়সের ছেলে অনিমেষ রূপে যতটা সুন্দর, গুণে ততটা সুন্দর নয়। মধুপুরের স্কুলে পড়ে এই বছরে ম্যাট্রিক ক্লাসে উঠেছে।

কিন্তু পাস করতে পারবে কি-না সন্দেহ। সকালের ট্রেনে মধুপুরে যায় ছাত্র অনিমেষ, ফিরে আসে সন্ধ্যার ট্রেনে। কিন্তু লেখাপড়ার কোন দরকারের কিংবা কর্তব্যের বোধ ওর প্রাণে আছে কি-না, সন্দেহ। ভুবনবাবু জানেন, স্কুলে যাবার নাম করে মধুপুরে গিয়েই রেলওয়ের অফিসারদের ক্লাবে টেনিস খেলতে চলে যায় অনিমেষ। জগনপুরে ফিরে এসে বাড়ির ঘোড়াটার পিঠে চেপে সড়কের অন্ধকারের মধ্যে প্রচন্ড বেগে ছুটোছুটি করে। অনিমেষকে সেজন্যে বকাবকি করবার কোন উৎসাহ বোধ করেন না ভুবনবাবু। ছেলেটার পাঁচ বছর বয়সে ওর মা মারা গিয়েছে। ঝিয়ের যত্নে ও আদরে বড় হয়ে উঠেছে। এখন আর ওকে সামলে রাখবার সাধ্যি কোন দুর্দান্ত ঝিয়েরও নেই। হার্টের অসুখে কষ্ট পাচ্ছেন, তার উপর কারবারের দেখা-শোনা করবার ঝঞ্ঝাট লেগেই আছে, সময় নেই ভুবন-বাবুর, ছেলেকে সামলে রাখবার জন্য একটুও ব্যস্ত হয়ে ওঠবার মতো সময় তাঁর নেই।

মাঝে মাঝে খুব বুঝতে পারেন ভুবনবাবু, তাঁর নিজেরও সময় ফুরিয়ে এসেছে। যাক্, সেজন্যে খুব বেশী দুশ্চিন্তা করবার কারণ নেই। একটা মাত্র ছেলে, তার তার পক্ষে একটা অভ্রখনির আয় সুখে-স্বাচ্ছন্দে খেয়ে-পবে থাকবার যথেষ্ট একটা সম্বল।

একদিন উকীলবাবুর কাছে ভালমন্দ এই চিন্তার কথাগুলি বলতে গিয়ে চেয়ারেরই উপর ঢলে পড়লেন, দুই চোখ বন্ধ করলেন ভুবনবাবু। হার্ট স্ট্রোক, নিতান্ত আকস্মিক রকমের একটা ভাগ্যের আঘাতে মরেই গেলেন ভুবনবাবু।

তখন সবেমাত্র সন্ধ্যা। মৃত্যুর সার্টিফিকেট লিখে দিয়ে ডাক্তার মজুমদার যে-মুহূর্তে চলে গেলেন, ঠিক সেই মুহূর্তে জগনপুর তরুণ ক্লাবের একটা মিছিল ভুবনবাবুর বাড়ির ফটকের কাছে এসে থামে আর জয়ধ্বনি ছাড়তে থাকে। একজনের হাতে জ্বলন্ত মশাল, একজন তার মাথার উপর ছোট একটা রুপোর শিল্ড ধরে রেখেছে। আর, অনিমেষের গায়ের স্যাণ্ডো গেঞ্জির বুকে ঝকঝকে একটা মেডাল দুলছে। ডুমরি বস্তি থেকে ভেলাডিহি, জঙ্গলের ত্রিশ মাইল সরু রাস্তায় সাইকেল ছুটিয়ে যাওয়া-আসা করবার বাহাদুরী প্রতিযোগিতায় ফার্স্ট হয়েছে অনিমেষ।

॥ দুই ॥

অনেক দিন পরে অনেক ঘুরে-ফিরে আর বদলি হয়ে, রামতনু আবার সেই ভেলাডিহিতে এসেছে। ভেলাডিহির জঙ্গলের চেহারাতে খুব নতুন রকমের কোন পরিবর্তন দেখতে পায় না রামতনু। পরিবর্তন বলতে শুধু দেখা গেল যে, ফুলি সাহেবের সেই ছাড়াভিটার যত ইঁটের স্তূপের উপর একটা নতুন গাছের চেহারা লম্বা হয়ে দাঁড়িয়েছে। একটা উইপিং উইলো। আরও একটা সাধারণ পরিবর্তন,

সেই ভাণ্ডারীজী নেই; নতুন এক ভাণ্ডারী এখন ভেলাডিহির ওই তসীল কাছারিতে কাজ করছেন।

বনবাসী জীবনের অভিজ্ঞতায় রামতনু এই প্রথম দেখতে পেল, ভাণ্ডারী হলেন একজন বাঙালী, প্রৌঢ় বয়সের পুষ্করবাবু। ভাণ্ডারী পুষ্করবাবু বলেন—শুনেছেন তো দুঃখের খবর?

রামতনু—কিসের দুঃখের খবর?

পুষ্করবাবু—জগনপুরের ভুবনবাবু মারা গিয়েছেন।

রামতনু—জগনপুরের কোন্ ভুবনবাবু? ভেলাডিহির ওদিকে বাঁশের জঙ্গলের মধ্যে হাজার বিঘা একটা বিবাদী ডাঙ্গাজমির দখল নেবার জন্য প্রতি বছর লাঠিয়াল নিয়ে যিনি লড়তেন?

পুষ্করবাবু—হ্যাঁ। তিনি আমার এক জ্ঞাতিভাই। জগনপুরের মুরলীবাবু আর সনাতনবাবু আমার জ্ঞাতি না হলেও আমার জাতভাই। আমরা সবাই এখন বাঙালী হয়ে গিয়েছি বটে, কিন্তু জাত হিসেবে আমরা হলাম রাজপুত বাঙালী, কিংবা বাঙালী রাজপুতও বলতে পারেন। আমাদের কুলপঞ্জীতে লেখা আছে; তিনশো বছর আগে রাজপুতনা থেকে চৌহানেরা যারা চলে এসে বাংলার বর্ধমানের মানকরে ঠাঁই নিয়েছিল, তারাই হলো আমাদের পূর্বপুরুষ। এটা শুধু একটা পুরনো স্মৃতির কথা। আমরা এখন চালে-চলনে ও হাবে-ভাবে একেবারে বাঙালী। আপনার চেয়ে কিছু কম বাঙালী নই।

রামতনু হাসে—তা তো নিশ্চয়। আমার পূর্বপুরুষ আপনার পূর্বপুরুষদের বাংলাতে আসবার অনেক আগে কনৌজ থেকে বাংলাতে এসেছিল। কিন্তু আপনি কি আমাকে একজন কনৌজিয়া কায়স্থ বলে মনে করতে পারবেন?

হেসে ফেলেন ভাণ্ডারী পুষ্করবাবু।—অসম্ভব। খাঁটি সত্যি কথাটা কি জানেন? জাত-পাতের কোন অর্থ হয় না।

রামতনু—জাতপাত হলো আপনাদের জগনপুরের মতো যত কুচুটে শহরের জীবনের সমস্যা। আমাদের এই জঙ্গলের জীবনের কোন সমস্যা নয়।

পুষ্করবাবু—জাতের মিল থাকলেও কিছু হয় না রামতনু···তোমাকে তুমি করে বললাম বলে কিছু মনে করো না, তুমি বয়সে আমার চেয়ে অনেক ছোট। যা-ই হোক, জগনপুরের মোক্তার সনাতনবাবু তাঁর সুন্দরী মেয়েটিকে মুরলীবাবুর ছেলে সোমনাথের সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে অন্তত পঞ্চাশ বার মুরলীবাবুর কাছে গিয়েছেন, কত সাধাসাধি করেছেন। কিন্তু আপত্তি করে মুরলীবাবু বারবার ওই একই কথা বলেছেন—না, মানবে না! এটা তো ঠিক জাতের দাবির কথা হলো না, রামতনু। এটা মস্ত একটা বড়লোকী অহংকারের দাবির কথা। নয় কি?

রামতনু—তাই তো মনে হয়। কিন্তু এটাও শহুরে জীবনের সমস্যা। আমাদের এই জঙ্গলের জীবনের কোন সমস্যা নয়।

পুষ্করবাবু সত্যি কথা বলতে গেলে বলতে হয়, মুরলীবাবুর ছেলে সোমনাথের সঙ্গে সনাতনবাবুর মেয়ে দীপালিকে একটুও মানাবে না। ছেলেটা আইন পড়ছে, লেখাপড়াতে ভাল বটে। কিন্তু কী বিদ্ঘুটে একটা চেহারা। রাজপুত চেহারার ছিটে-ফোঁটাও ওর মধ্যে নেই। কালো ঢ্যাঙ্গা ও রোগা একটা জীবন্ত খড়কে। সোমনাথকে ছেলেটা না বলে লোকটা বলাই ভাল। বয়সটা খুব বেশী পেকেছে। ত্রিশ-বত্রিশের বরং কিছু বেশীই হবে। কিন্তু সংসারের নিয়মে রূপের আর গুণেরই বা কী মূল্য আছে বল। সবাই টাকার জোরকেই সবচেয়ে বেশী মর্যাদা দেয়। সবাই বিষয়- সম্পত্তি আর আয়-উপার্জনের অবস্থা বিচার করে সমান অবস্থার কুটুম্ব পেতে চায়। কাজেই, সনাতনের মেয়ের বিয়ে যে কবে আর কী করে সম্ভব হবে, বুঝতেই পারি না।

কোন্ এক জগনপুরের ছেলে-মেয়ের বিয়ের সমস্যার কথা এই ভেলাডিহির জঙ্গলের ভিতরে বসে আলোচনা করা একটুও মানায় না। ভাণ্ডারী পুষ্করবাবুর আক্ষেপের এইসব কথার মধ্যে যুক্তি আছে বটে, কিন্তু ভেলাডিহির জঙ্গলের জীবনে ওরকম আক্ষেপের কোন দরকারই হয় না। শুনতে আর ভাল লাগে না রামতনুর, কান দুটো যেন বাজে কথা শুনে-শুনে এরই মধ্যে ক্লান্ত হয়ে গিয়েছে।

সাইকেলের ঘণ্টি বাজিয়ে বাইরে থেকে কে যেন ডাক দিল—কাকা।

চমকে উঠলেন ভাণ্ডারী পুষ্করবাবু। হ্যাঁ, ভুবনবাবুর সেই ছেলেটা, সেই অনিমেষই এসেছে। বাইরের রাস্তার দিকে তাকিয়ে ডাক দিলেন পুষ্করবাবু—কে, অনিমেষ নাকি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, কাকা।

—ভিতরে চলে এসে।

আগন্তুক অনিমেষকে দেখে রামতনুর চোখে সত্যিই একটা বিস্ময় চমকে ওঠে। বাঃ, কী সুন্দর চেহারা। কী সুঠাম স্বাস্থ্যে বাঁধানো একটা শরীর। কিন্তু বেশ কচি রকমের একটা মুখ, মিষ্টি হাসিতে যেন ভরাট হয়ে রয়েছে। ওর বয়স যদি উনিশ-কুড়ি হয়, তবে চেহারাটার বয়স সতেরো-আঠারোর একটুও বেশী নয়। কপালের উপর ছোট্ট একটা ত্রিশূলের মতো আকারের কাটাদাগ। নিশ্চয় ছেলেবেলার ভয়ানক এক দুরন্তপনার স্মৃতিচিহ্ন। কী আশ্চর্য, কপালের কাটা দাগটাকেও বেশ সুন্দর বলে মনে হয়!

ভুবনবাবুর শ্রাদ্ধের নেমন্তন্ন করতে এসেছে অনিমেষ। যাবেন—কাকা। নিশ্চয় যাবেন। এখন তো আমার আপনজন বলতে শুধু এক আপনিই আছেন।

সত্যিই কি জগনপুর থেকে বের হয়ে আর এই জঙ্গলের ত্রিশ মাইল পথে একটানা সাইকেল চালিয়ে ভেলাডিহিতে এসে পৌঁছেছে অনিমেষ?

অনিমেষ হাসে—হ্যাঁ কাকা। জগনপুর থেকে মোটরবাসে ডুমরিতে এসেছি, তারপর সাইকেলে ভেলাডিহি। সাইকেলে জঙ্গলের একটানা ত্রিশ মাইল পথ পার

হওয়া আপনার কাছে ভয়ানক বলে মনে হতে পারে, কিন্তু আমার কাছে কিছুই নয়, কাকা। আমার কাছে এ তো একটা তামাশা। কিন্তু হ্যাঁ, আপনার ঠিকানা খুঁজে পেতে আমাকে খুবই হয়রান হতে হয়েছে। আমি তো ভাবতেই পারিনি যে, আপনি এরকম একটা জংলী জায়গায় পড়ে থাকতে পারেন? বুঝতে পারি না, কেমন করে এখানে দিন কাটাচ্ছেন। মধুপুরে আপনার সেই প্রকাণ্ড বাড়ি, আর এখানে মাটির তৈরি এই কুঠুরি, ভাগ্যের এতটা পতন আপনি কী করে সহ্য করলেন কাকা?

পুষ্করবাবু—দেনার দায়ে যার সর্বস্ব বিকিয়ে যায়, তাকে এইরকমই একটা গরীব দশা মেনে নিতে হয়, বাবা।

রামতনুর দিকে তাকিয়ে কথা বলে অনিমেষ।—আপনিও কি দেনার দায়ে সব বিকিয়ে দিয়ে তারপর এই জঙ্গলে এসে ঠাঁই নিয়েছেন?

রামতনু একটু বিরক্ত স্বরে জবাব দেয়।—না, আমি জঙ্গলকে শহরের চেয়ে অনেক বেশী ভাল মনে করি বলেই এখানে এসে ঠাঁই নিয়েছি।

অনিমেষ—কিন্তু কাজটা কি ভাল হয়েছে?

রামতনু—তর্ক করবার শখ আমার নেই। তাই আমি আপনার কথার জবাব দেব না।

অনিমেষ নামে এই ছেলেটির চেহারা বিশেষ করে ডাগর চোখের আর মুখের চেহারাটা যেমন নরম, স্বভাবটা তেমন নরম বলে মনে হয় না। বরং বেশ উদ্ধত রকমের বলে মনে হয়। তর্কের রকমটাও বেশ উদ্ধত। যাবার আগে বেশ উদ্ধত ভঙ্গীতে অনেক হাসি হেসে নিল অনিমেষ। জঙ্গলের নামে যত নিন্দার কথা আউড়ে নিল।—যা-ই বলুন দাদা, জঙ্গলের ভিতরে জীবন কাটিয়ে দেওয়া কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়।

অনিমেষ চলে যাবার পর পুষ্করবাবুকে জিজ্ঞাসা করে রামতনু।—আপনার এই জ্ঞাতিপুত্রটি কি আবার এখানে আসবে।

পুষ্করবাবু—সেটা আমি কী করে বলি? কিন্তু ওর আর এখানে আসবার কোন দরকার হবে বলে মনে হয় না।

॥ তিন ॥

মাঝরাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে যেতেই শুনতে পায় রামতনু, কাছারি-বাড়ির গা-ঘেঁষা জঙ্গলের ভিতরে অদ্ভুত রকমের অনেক শব্দ যেন হুল্লোড় করে চলে যাচ্ছে। এরকম শব্দের হুল্লোড় এই ভেলাডিহির জংগলে কিংবা অন্য কোন জংগলে কোন-দিনও শুনতে পেয়েছে বলে রামতনুর মনে পড়ে না। খোলা জানালার কাছে এগিয়ে যেয়ে ডাক দেয় রামতনু।—পুষ্করবাবু জেগে আছেন নাকি?

—হ্যাঁ।

—জঙ্গলের ভিতরে অদ্ভুত রকমের অনেক শব্দের হুল্লোড় চলে যাচ্ছে শুনছেন তো?

—হ্যাঁ।

—কিসের শব্দ?

—বাইসনের একটা দল চলে যাচ্ছে।

—বাইসন? বাইসন কোথা থেকে আসবে? আমাদের দেশে বাইসন নেই।

—ওই হলো। যাদের ইণ্ডিয়ান বাইসন বলা হয়, যাদের দেশী নাম গাউর, তাদেরই একটা দল চলে যাচ্ছে।

—আগে তো ওরা ভেলাডিহির এই জঙ্গলে ছিল না।

—না, বছর দুই হলো পালামউ-এর জঙ্গল থেকে চারটে গাউর দল চলে এসে এই জঙ্গলে ঢুকেছে। এক-একটা দলে বিশ-ত্রিশটা গাউর। পুরুষ গাউর বলতে শুধু দলের কর্তাটি আর কয়েকজন বাচ্চা পুরুষ, বাকি সবাই হলো মেয়ে-গাউর অর্থাৎ গাউর গাই।

শুনতে থাকে রামতনু, ছোট-ছোট গাছকে গুঁতিয়ে মটমট করে ভেঙ্গে দিচ্ছে আর মাড়িয়ে দিয়ে চলে যাচ্ছে গাউরদের নিশাচর একটা দল। কী উদ্দেশ্যে কোন্ দিকের কোথায় ওরা চলে যাচ্ছে, সেটা ওরাই জানে মাঝে-মাঝে গাঁ-গাঁ করে ডাক ছাড়ছে গাউরদের দলটা, কতকটা মোষের ডাকের মতো শব্দ।

পুষ্করবাবু—শুনেছিলাম, শীত পড়লেই ওরা আবার ওদের পুরনো জঙ্গলে ফিরে যাবে। শীত তো পড়ছে। কিন্তু কই ওরা তো চলে যাচ্ছে না।

হেসে ফেলে রামতনু।—মনে হয়, ওরা ভেলাডিহির জঙ্গলকে ভালবেসে ফেলেছে।

পুষ্করবাবু—তা না হয় বিশ্বাস করলাম। কিন্তু ভেলাডিহির জঙ্গলও কি, ওদের ভালবেসে ফেলেছে?

রামতনু—সেটা একটু খোঁজ খবর নিয়ে বুঝতে হবে, কাকা।

পুষ্করবাবু—তা হলে খোঁজ-খবর কর।

পরদিন সকালেই খোঁজ-খবর করে ঘটনার যেটুকু জানতে পারে রামতনু সেটুকুই যে মস্ত বড় একটা বিস্ময়ের তথ্য। ওই যে, ভেলাডিহির পাশের জঙ্গলের ভিতরে হাজার বিঘা বিবাদী ডাঙ্গাজমি পড়ে আছে, সে ডাঙ্গাজমি এখন একটা যুদ্ধক্ষেত্র। জঙ্গলের একচেটে দখল পেতে চায়, এরকম দুটো প্রতিদ্বন্দ্বী গাউর-দলের লড়াই চলছে, তিন দিন ধরে। ডাঙ্গাজমির উপর দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দলের প্রচণ্ড মারামারির শব্দ রোজই কয়েক ঘণ্টার মতো ভয়াল হয়ে বাজতে থাকে। তারপর সাময়িক বিরতি। দুই দলই আবার দুই দিকে সরে গিয়ে বাঁশের জঙ্গলগুলোকে চিবিয়ে চিবিয়ে তছনছ করতে থাকে। পরের দিন আবার যুদ্ধ।

মনে পড়তেই আবার হেসে ফেলে রামতনু। পুরনো কথা। জঙ্গলের ভিতরে ওই হাজার বিঘা ডাঙ্গাজমির দখল নেবার জন্য লাঠালাঠি আর মারমারি করা জগনপুরের ওই দুই বড়লোকের ; মুরলীবাবুর আর ভুবনবাবুর জীবনের যেন হার্ডি অ্যানুয়াল ছিল। প্রতি বছর ডাঙ্গাজমির উপর দখল কায়েম করবার জন্য দুজনেই লাঠিয়ালের দল পাঠাতেন। কোন পক্ষই কিন্তু দখল নিতে পারতো না মারামারির পর দুই লাঠিয়াল দল আবার ভালমানুষের দলের মতো শান্ত হয়ে জঙ্গলের বাইরে চলে যেত। সেই বিবাদী ডাঙ্গাজমিটাকে কোন পক্ষই বাগিয়ে নিতে পারেনি।

রামতনু বলে—জঙ্গলের দখল নিয়ে দুই গাউর দলের মারামারি। ব্যাপার দেখে আপনি কত আর নিন্দে করতে পারবেন কাকা? হাজার বিঘা একটা বিবাদী ডাঙ্গাজমির দখল নেবার জন্য আপনার জ্ঞাতি ভাই ভুবনবাবুর সঙ্গে মুরলীবাবুর বাৎসরিক মারামারির কাণ্ডটা জানোয়ার গাউরদের মারামারির কাণ্ডের তুলনায় অনেক কদর্য। জঙ্গলবাসী দেশী বাইসন ওই গাউরদের স্বভাবের চেয়ে ওঁদের দু-জনের স্বভাব বরং বেশি খারাপ বলে মনে হয়। যাক্ গে, একজন তো হার্ট স্ট্রোক হয়ে মরেই গিয়েছেন, জীবনের সব ল্যাঠা চুকিয়ে দিয়েছেন। ভুবনবাবুর নিন্দে আর করতে চাই না। কিন্তু এটাও ভাবতে খারাপ লাগছে যে. এইবার একেবারে বিনা বাধায় বিবাদী ডাঙ্গাজমিটার দখল নিয়ে ফেলবেন মুরলীবাবু।

পুষ্করবাবু— আমারও তাই মনে হয়। অনিমেষকে একটা কাঁচা বুদ্ধির বাচ্চা ছেলে বলে মনে করা চলে। সে কী আর মুরলীবাবুর মতো পাকা সম্পত্তিবাজ মানুষের সঙ্গে লড়তে পারবে?

॥ চার ॥

জগনপুরের জীবনে মস্ত রকমের একটা নাটকীয় কাণ্ড শুরু হয়েছে। ঘটনার সব কথা যদিও শুনতে পান না পুষ্করবাবু তবু মাঝে-মাঝে জগনপুর থেকে দু-চারটে বেনামী চিঠি তাঁর কাছে আসে তা থেকেই আশ্চর্য হবার মতো একটা ঘটনার আঁচ তিনি করে ফেলেছেন। চিঠি পড়ে বেশ গম্ভীর হয়ে যান পুষ্করবাবু। তাঁর জ্ঞাতিভাইয়ের পুত্র ওই অনিমেষ কি সত্যিই ডাইনের মায়ার ফাঁদে পড়েছে? সত্যি সত্যি কী হয়েছে, সেটা ঠিকমতো জানবার জন্য একদিন জগনপুর ঘুরে এলেন পুষ্করবাবু।

অনিমেষের সঙ্গে মোক্তার সনাতনবাবুর সুন্দরী মেয়েটার ভালবাসাবাসির ব্যাপারটা বড়ই প্রবল হয়ে উঠেছে। নিকুঞ্জ মোক্তার আদ্যোপান্ত ঘটনার সব কথা পুষ্করবাবুকে শুনিয়ে দিয়েছেন। সনাতনবাবু একদিন অনিমেষকে সত্যনারায়ণের পুজো দেখতে আর প্রসাদ খেয়ে যেতে নেমন্তন্ন করেছিলেন। সেই যে সেই প্রথম দিনেই দীপালির কাছে বসে আর অনেক গল্প করে চলে গেল অনিমেষ, নিকুঞ্জবাবু

বললেন, সেদিনই বোকা ছেলেটার প্রাণের উপর ডাইনের মায়া ছড়িয়ে পড়েছিল। কলকাতা থেকে খুব দামী একটা ক্যামেরা কিনে আনিয়ে দীপালির প্রায় তিনশো ফটো তুলে ফেলেছে অনিমেষ। ডাইনের মায়া যে কী ভয়ানক ব্যস্ত হয়ে কাজ করছে সেটা আরও কটা দিনের মধ্যে সবারই চোখে ধরা পড়ে গেল। সনাতনবাবুর নোংরা চেহারার বাড়িটা নতুন রঙে রঙীন হয়ে উঠেছে। শিশু কাঠের নানারকমের আসবাবে সনাতনবাবুর ঘর ভরে গিয়েছে। দীপালিকে দেখা যায় বেনারসী শাড়ি গায়ে জড়িয়ে নার্সারীর ভিতরে ঘুরে-ফিরে ফুল তুলছে।

দীপালিকে একদিন একটা কথা বেশ স্পষ্ট করে বলে দিয়েছে অনিমেষ। —তোমাকে আমি যখন সত্যিই ভালবেসেছি, দীপালি তখন তোমাকে আমার সর্বস্ব দিয়ে দিতে পারি। সেজন্য আমার মনে এতটুকুও আপত্তি দেখা দেবে না।

নিতান্ত গোপনের এই ভাষাটাকে কে কেমন করে শুনতে কিংবা জানতে পেল?

নিকুঞ্জবাবু হেসে ফেলেন।—বাতাসেরও কান আছে, সবচেয়ে গোপন কথাও শুনে ফেলে বাতাস। তা ছাড়া, সনাতনবাবুর বাড়ির ঝি রামদুলারী আছে, যে তার নিজের কানে শোনা এই ভালবাসার কথাগুলিকে জগনপুরের প্রায় সব বাঙালী-বাড়ির গিন্নী আর মাসি-পিসির কানে পৌঁছে দিয়েছে। কাজেই কারও কিছু জানতে বাকি নেই।

দীপালির চোখ দুটো এত কালো যে, চোখে কাজল বোলানো হয়েছে বলে মনে হয়। অনিমেষের মুখের ওই কথা শুনে দীপালির কালো চোখ বড়-বড় জলের ফোঁটা টলমল করেছে আর ঝরে পড়েছে। সেই মুহূর্তে দীপালিকে দুই হাতে বুকে জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞাসা করেছে অনিমেষ—বল তোমার মনে কিসের দুঃখ।

হেসে ফেলে দীপালি।—আমার মনে কোন দুঃখ নেই, অনিমেষ। বরং আনন্দে ভরে আছে মনটা, কারণ তুমি আমাকে ভালবেসেছো। দুঃখে নয়, আনন্দে আমার চোখ জলে ভরে গিয়েছে।

ঝি রামদুলারীর চোখে এই দৃশ্যটাও ধরা না পড়ে পারেনি। রটিয়ে দিয়েছে রাম-দুলারী, তারপর কী হলো শুনবেন? দিদিমণি একহাতে অনিমেষের একটা হাত চেপে ধরে অন্য হাতে ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিল। ছি ছি ভদ্রলোকের মেয়ের এ কী রকমের চরিত্র?

নিকুঞ্জবাবু বললেন—শুনতে পাচ্ছি, সনাতনবাবু এবার অনিমেষের অভ্রখনিটাকে কিনে নেবার জন্য তৈরী হয়েছেন।

ভ্রূকুটি করেন পুষ্করবাবু—কিনে নেবেন সনাতনবাবু? সনাতনের এত টাকার জোর কবে হলো?

নিকুঞ্জবাবু আরে মশাই, সত্যি কি টাকা দিয়ে অনিমেষের অভ্রখনিটাকে কিনবেন সনাতন, আমার চেয়ে অনেক বেশী পোড়াকপালে একটা মোক্তার পঞ্চাশ হাজার টাকা পেয়ে সনাতনবাবুকে খানিকটা বিক্রী করা হলো বলে দলিল তৈরী হবে। সে দলিল

যথারীতি রেজিস্টারী করা হবে। অথচ একটি পয়সাও পাবে না অনিমেষ। অনিমেষ একটি পয়সা চাইবেও না। খুশি হয়ে দলিলে সই করে দেবে। ডাইনের মায়ার কাছে বাঁধা পড়েছে যার প্রাণ, সে কী করে বুঝবে যে, সনাতন মোক্তার তার সর্বস্ব লুটে নিচ্ছে।

কবে দীপালির সঙ্গে অনিমেষের বিয়ের উৎসব জেগে উঠবে? অনিমেষকে কথা দিয়েছেন সনাতন, বিয়ে তো হবেই, একটু দেরি হলে ক্ষতি কি?

হ্যাঁ অনিমেষের বাপ ভুবনবাবুর নামে যে টাকা ব্যাংকের ঘরে জমা ছিল সে টাকার সবই তুলে নিয়েছে অনিমেষ। সব টাকা মোক্তার সনাতনের ঘরে চলে গিয়েছে।

—কত টাকা

—চল্লিশ হাজার টাকা।

—বাড়িটাও কি বেচে দিয়েছে অনিমেষ?

—না, এখনও বেচে দেয়নি। কিন্তু বেচে দেবে।

পুষ্করবাবু—কিন্তু আপনারা এতজন বিচক্ষণ মানুষ এখানে থাকতে, ছেলেটাকে সনাতন মোক্তারের খপ্পর থেকে রক্ষা করতে পারলেন না।

নিকুঞ্জবাবু—আরে, মশাই ছেলেটাকে সনাতনের খপ্পর থেকে রক্ষা করতে গেলে আমার কী দশা হবে, জানেন?

পুষ্করবাবু।—না।

নিকুঞ্জবাবু।—আমাকে তবে ওই দুর্দান্ত ছেলের ছুরির মার খেয়ে মরে যেতে হবে।

পুষ্করবাবু—তাহলে বলুন কারও কিছু চিন্তা করবার কিংবা চেষ্টা করবার কর্তব্য নেই।....আমি চলি।

ভেলাডিহিতে ফিরে এসে পুরো একটা দিন একেবারে স্তব্ধ হয়ে খাটের উপর পড়ে রইলেন পুষ্করবাবু, অনিমেষের জ্ঞাতি-কাকা। অনিমেষের ভাগ্যটার এত শিগগির এত বেশি অধঃপতন হয়ে গেল, ভাবতে গিয়ে পুষ্করবাবু বার বার শিউরে ওঠেন। শয়তান সনাতন মোক্তার অনিমেষের নিরেট একটা বোকা বিশ্বাসের আত্মাকে ঠকিয়ে ঠকিয়ে সব বিষয়-সম্পত্তি একে-একে বাগিয়ে ফেলছে। কিন্তু সব শেষে সনাতনের মেয়েটাও কি অনিমেষের সব চেয়ে বড় আশার স্বপ্নটাকে ঠকাবে? না সেটা হবে না বলে মনে হয়। অনিমেষের মতো চমৎকার ফুটফুটে চেহারার একটা ছেলেকে ভাল না বেসে পারবে কেন দীপালি? নিকুঞ্জবাবুও বলেছেন, ডাইনের মায়াটা দীপালির কোন শয়তানী মতলবের মায়া নয়। ডাইনের মায়া হলো সনাতন ও তার স্ত্রী শুভময়ীর যুগ্ম মতলবের যত ছলনাময় লীলা-কলা। শোনা যায় অনিমেষ যতক্ষণ না সনাতনের বাড়িতে এসে ভাত খায়, ততক্ষণ শুভময়ী তাঁর মুখের কাছে ছোট্ট একটা বাতাসাকেও তুলতে পারেন না। এবং ভাত

খাওয়ার ব্যাপারটা কি শুধু ডাল-ভাত-তরকারী খাওয়ার একটা সাধারণ ব্যাপার? মোটেই তা নয়। দু রকমের রান্না মাংস, তিন রকমের রান্না মাছ, আর থালার চারদিকে সাতরকম স্বাদের ডালনা ঘণ্ট চাটনি ও পায়েসের সাতটি বাটি সাজিয়ে দিয়ে অনিমেষকে না খাওয়াতে পারলে শুভময়ীর প্রাণের তৃপ্তি পুরো হয় না। ডাইনের মায়াটা বড়ই স্নেহময়। নিকুঞ্জবাবুর ধারণা, যতদিন না অনিমেষের বাড়িটাকে বাগিয়ে নিতে পারছেন সনাতনবাবু, ততদিন ডাইনের মায়া এইরকম স্নেহময় হয়েই থাকবে।

দশদিন পরে নিকুঞ্জবাবুর লেখা চিঠি পেয়ে বুঝতে পারলেন পুষ্করবাবু বাড়িটাকে বাগিয়ে নিতে খুব বেশি দেরি করেননি সনাতন মোক্তার। অনিমেষের বাড়িটাকে বাইশ হাজার টাকায় কিনে নেবার দলিল চটপট তৈরি করে চটপট রেজিস্ট্রি করিয়ে নিয়েছেন সনাতনবাবু।

তাই আবার একটি বৈশাখী সন্ধ্যার চাঁদের আলোতে নার্সারির গোলাপ কুঞ্জের যত ফোটা ফুলের হাসি-হাসি চেহারার দিকে তাকিয়ে গল্প করেন সনাতন ও শুভময়ী। নার্সারির ভিতরে ঘুরে বেড়াচ্ছে দীপালি। আর বারান্দার ওদিকে থামের গায়ে হেলান দিয়ে বসে আছে উৎকর্ণা। দু চোখ বন্ধ করে হাই তুলছে।

সনাতন বলেন—এদিকে এতদিন ধরে যা করবার ছিল তার তো সবই করা হয়ে গেল। এখন ভাবতে হবে…।

শুভময়ী—হ্যাঁ, যা করা হয়েছে তা ভালই হয়েছে। লোকে নিন্দে রটাচ্ছে যে, ঠক সনাতন মোক্তার অনিমেষকে তুক করে সব বিষয়-আশায় বাগিয়ে ফেলেছে। করুক নিন্দে। কিন্তু এখন একটা কথা খুব ভাল করে ভেবে দেখা দরকার।

সনাতনবাবু হাসেন—আমার নামে ওই নিন্দেটা রটাবার কি কোন মানে হয়? অনিমেষের সম্পত্তি আমার হাতে না এসে মুরলীবাবুর হাতে চলে গেলে বুঝি খুব ভাল হতো?

শুভময়ী—নিকুঞ্জবাবুর স্ত্রী আমার মুখের উপর একটা কথা শুনিয়ে দিয়ে গিয়েছেন। বলেছেন—অনিমেষকে এরকম করে একটা বেহাল গরীব করে দেওয়া তোমাদের একটুও উচিত হয়নি গো, মোক্তার গিন্নি। তোমরা ভয়ানক পাপ কাজ করেছো।

সনাতন আবার হাসেন—এসব তো হিংসের কথা। যাক্ গে—আমাকে এখন একটা কথা ভেবে দেখতে হবে। অনিমেষের সঙ্গে দীপালির বিয়ে কি না হলেই নয়?

শুভময়ী—আমি তো মনে করি, না হলেই ভাল। কিন্তু মেয়ে কি সেটা মানবে? অনিমেষের সঙ্গে এতদিনের মেলামেশা, আমার তো মনে হয়, অনিমেষের উপর দীপালির মনের টান আরও বেড়েছে।

সনাতন—একটা উনিশ-কুড়ি বছর বয়সের ছেলের উপর বত্রিশ বছর বয়সের

একটা মেয়ের মনে টান-ফান না থাকাই ভাল।

শুভময়ী—কিন্তু কথাটা বলতে বেশ লজ্জা বোধ করছি। তোমার মেয়ে তো অনিমেষের বয়সটাকেই ভালবাসে। তার উপর এই সেদিন নিজেরই মুখে অনিমেষকে বিয়ের জন্য তৈরী হতে বলে দিয়েছে দীপালি। আমি নিজের কানেই সব শুনেছি।

সনাতন—কিন্তু অনিমেষ কী বলেছে?

শুভময়ী—অনিমেষ বলেছে যে, ওর পুষ্করকাকাকে ডেকে নিয়ে এসে তারই উপর বিয়ের সব ব্যবস্থা করবার ভার ছেড়ে দেবে। দীপালি বলেছে—ব্যস্, আর দেরি করবে না অনিমেষ।

সনাতন জোরে একটা হাঁপ ছেড়ে দিয়ে কথা বলেন—তবে আর ভেবে দেখবার কিছু নেই। আপত্তি করে লাভ নেই। আমার কিন্তু খুব বিশ্বাস ছিল যে, শেষটা এরকম হবে না।

॥ পাঁচ ॥

—কাকা!

আবার এসেছে অনিমেষ। ভেলাডিহির তসীল কাছারিরর সামনে পথের উপর দাঁড়িয়ে ডাক দিয়েছে।

পুষ্করবাবু ঘরের বাইরে এসে সাড়া দিলেন—কী ব্যাপার অনিমেষ?

অনিমেষ—আপনাকে একবার জগনপুর যেতেই হবে কাকা। না গেলেই নয়।

—কেন?

—আমার বিয়ে।

—কার সঙ্গে?

—সনাতনবাবুর মেয়ের সঙ্গে

—তাই নাকি। কিন্তু সেজন্যে আমাকে একবার জগনপুর যেতেই হবে কেন?

—আপনি না গেলে কে যাবে? আমার আপনজন বলতে আপনি ছাড়া আর কে আছেন? আপনি আমার গার্জেন হয়ে আর সামনে থেকে বিয়ের সব কাজ চুকিয়ে দেবেন। টাকা খরচ করবার সব দায় আমার। আপনাকে সেজন্য একটুও ভাবতে হবে না।

পুষ্করবাবু হাসেন।—তা তো তোমার এই গরীব কাকার জানাই আছে, বাবা তোমার বিয়ের কাজের সব খাটুনি খেটে দিতে পারবো আমি, সেজন্যে চিন্তা করো না। কিন্তু বিয়েটা কবে?

অনিমেষ—দিন ঠিক হয়নি।

পুষ্করবাবু—দিন ঠিক হোক, তারপর আমি যাব।

অনিমেষ—আচ্ছা, তবে তাই হোক, কাকা। দিন ঠিক হবার পর আমি আপনাকে চিঠি দিয়ে জানাবো।

রামতনুর দিকে তাকিয়ে আর হেসে-হেসে কথা বলে অনিমেষ।—আপনাকে এখনই নেমন্তন্ন করে যাচ্ছি, রামতনুদা। আমার বিয়েতে আপনি যাবেন, অবশ্যই যাবেন।

অনিমেষের উপর একটুও প্রসন্ন নয় রামতনু। তবু বুঝতে পারে, অনিমেষের উজ্জ্বল মুখের হাসিটা যেন চমৎকার একটা মায়ার হাসি। দেখলে কঠিন রকমের অপ্রসন্নতাও গলে যায়। হেসে হেসে কথা বলে রামতনু—বেশ তো, কোন অসুবিধে না থাকলে নিশ্চয় যাব।

সেই মুহূর্তে মুখর হয়ে যে-সব আক্ষেপের কথা শোনাতে থাকে অনিমেষ, সেটা সহ্য করতে গিয়ে একেবারে নীরব হয়ে যায় রামতনু। শক্ত রকমের একটা ভ্রুকুটি তুলে অনিমেষের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

অনিমেষ বলে—আমি ভেবে পাই না, আপনারা এই বিশ্রী একটা জঙ্গলের মধ্যে পড়ে আছেন কেন? যেমন আমার এই কাকা, তেমনই আপনি, দুজনে কেন যে জানোয়ারের জগতে বাস করছেন, বুঝতে পারছি না। না না না, আমার অনুরোধ, আপনারা আর এখানে থাকবেন না জগনপুরে চলে আসুন। আমাদের অভ্রখনিতে আপনাদের ভাল চাকরির ব্যবস্থা করে দেব।

রামতনু—তুমি এত বেশি কথা বলছো কেন? অনেক বলেছো, এবার থাম।

পুষ্করবাবু—তোমাদের কোন্ অভ্রখনির কথা বলছো, অনিমেষ? যে খনিটা কিনে নিয়েছেন সনাতনবাবু?

আবার সেই মায়াময় মিষ্টি হাসি অনিমেষের সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ে।—কিনে নিয়েছেন বটে, কিন্তু সেটা তো সত্যি করে কিনে নেবার কোন ব্যাপারই নয়।

পুষ্করবাবু—কেন নয়?

অনিমেষ—একটি পয়সা না দিয়েও কি একটা অভ্রখনিকে কেউ সত্যি করে কিনে নিতে পারেন?

পুষ্করবাবু—তবে তুমিই বল না, তোমাদের অভ্রখনিটাকে সনাতন যদি না কিনে থাকেন, তবে পঞ্চাশ হাজার টাকায় কিসের বিক্রী কোবালা তুমি লিখে দিলে?

অনিমেষ আবার হাসে। শুনুন কাকা, আমার সম্পত্তি সেই খনিটাকে সনাতনবাবু নিজের দখলে এই জন্যে নিয়ে রাখলেন যে, আমি যেন টাকার দরকারে পড়ে কিংবা ভুলটুল করে খনিটাকে কখনও মুরলীবাবুর মতো লোভী মানুষের কাছে বিক্রী না করে দিতে পারি। এই সম্পত্তি তো আবার একদিন আমার হাতে চলে আসবে। আমার সব সম্পত্তি রক্ষা করবার জন্যেই তো তিনি এইরকমের একটা মিথ্যে কেনাকেনির ব্যাপার করিয়েছেন।

পুষ্করবাবু—তোমার নামে কি কোন সম্পত্তিই আর নেই?

অনিমেষ—আছে বৈকি।

পুষ্করবাবু—কী আছে? কোথায় আছে?

অনিমেষ—ওই যে, আপনাদের এই জঙ্গলের পাশের জঙ্গলের ভিতরে হাজার বিঘে ডাংগাজমি।

পুষ্করবাবু—ওটা তো বিবাদী জমি। মুরলীবাবু দাবি করেন যে, ওটা তাঁরই জমি।

অনিমেষ—আমিও তো দাবি করি যে, ওটা আমার জমি।

পুষ্করবাবু—তবে তুমিও কি ঠিক করছো যে, ওই জমির দখল নেবার জন্য প্রতি বছর লাঠালাঠি করবে।

অনিমেষ—নিশ্চয় করবো? কেন করবো না?

পুষ্করবাবু সনাতন মোক্তার কি তোমাকে এই পরামর্শ দিয়েছেন।

অনিমেষ—হ্যাঁ, তিনি বলেছেন যে, মুরলীবাবুকে জংগলের ভিতরে ওই হাজার বিঘে ডাংগাজমির দখল নিতে কিছুতেই তুমি দেবে না। ও জমিতে মকাই বুনলে বছরে কত টাকা লাভ হতে পারে, ভেবে দেখ।

পুষ্করবাবু—বাঃ, সনাতনকে সত্যিই তোমার একজন দয়াময় উপকারী বলে মনে হচ্ছে।

অনিমেষ—আমাকে আজই কথা দিন কাকা, আপনিও কথা দিন রামতনুদা, গিরিডিতে আমাদের অভ্র কোম্পানীর অফিসে চাকরি করবেন।

পুষ্করবাবু ওদিকে মুখ ঘুরিয়ে আর চুপ করে বসে থাকেন। অনিমেষের কথার কোন জবাব দেন না। বয়েসের হিসাবে অনিমেষ এখন সাবালক হয়েছে বটে, কিন্তু না বুঝে-সুঝে যে-সব কথা বলছে, সে সব তো একটা নাবালকের মুখরতা! কিন্তু স্বীকার করতে হয়, ওসব কী অদ্ভুত একটা সরল বিশ্বাসের কথা। ভগবান কবে যে এই ছেলের মাথায় কিছু খাঁটি বুদ্ধিসুদ্ধি দেবেন, কে জানে?

রামতনু বলে—আমি তোমাকে একটা উপদেশ দিতে পারি, অনিমেষ।

অনিমেষ—বলুন।

রামতনু—তুমি জগনপুর নামে ওই বদখত একটা নোংরামির খপ্পর থেকে পালিয়ে এই ভেলাডিহির জংগলের ছায়াতে চলে এস।

অনিমেষ—তারপর?

রামতনু—তারপর ঠাকুর সাহেবদের এই তসীল কাছারিতে আমাদেরই মত একটা ছোটখাটো চাকরি নিয়ে ফেলবে?

অনিমেষ—তারপর?

রামতনু—তারপর আর কি? নিশ্চিন্ত হয়ে নিরাপদে বেঁচে থাকবে।

অনিমেষ—জানোয়ারের মতো?

রামতনু—তা যদি বলো তবে তাই।

অনিমেষ হেসে ফেলে—নাঃ, আপনি খুব রেগেছেন বলেই এত বাজে কথা বলেছেন, রামতনুদা। তবে আমি আপনাদের দুজনের কাউকেই ছাড়বো না। জোর করে ধরে নিয়ে গিয়ে গিরিডিতে আমাদের অভ্র কোম্পানীর কাজের দুটো চেয়ারে বসিয়ে দেব। মাইনে পাবেন, মাসিক পঞ্চাশ টাকা। এখানে জংলী চাকরি করে যে মাইনে পাচ্ছেন, তার প্রায় তিন গুণ বেশি।

চলে গেল অনিমেষ। এখান থেকে সাইকেলে একটানা ত্রিশ মাইলের বেশি এবড়ো-খেবড়ো জংলী পথে। ছুটে চলে যাবে অনিমেষ। পুষ্করবাবু বলেন—ছেলেটার তো এরকম গুণ অনেক আছে, কিন্তু দুঃখের কথা, নিজেকে রক্ষা করবার কোন গুণ নেই। সনাতনের মেয়ের কালো চোখের ইশারার কাছে এই ছেলের মনপ্রাণ যেন পাগল হয়ে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছে। বয়সটা আর একটু বেশি হলে প্রেম-ট্রেমের জন্যে এতটা বাড়াবাড়ি করতো না অনিমেষ, নিজেকে একেবারে বিকিয়ে দিয়ে ফতুর হয়ে যেত না। যা-ই হোক, রক্ষে এই যে, বিয়েটা এইবার হয়ে যাবে।

পুষ্করবাবু যেন একটা কল্পনার সঙ্গে বিড়-বিড় করে কথা বলে চলেছেন। শুনতে পেয়ে লজ্জা পায় রামতনু, শুনতে ভাল লাগে না।

পুষ্করবাবু বলে চলেছেন, নিদারুণ এক শারীরিক সত্যের বিবরণ। সনাতনের মেয়ে দীপালি বয়সের হিসাবে অনিমেষের চেয়ে অন্তত আট-দশ বছর বেশি, কিংবা আরও বেশি। একথা নিকুঞ্জবাবু বলেছেন। নিকুঞ্জবাবুর মেয়ে সুনীতা এখন তিনটি ছেলে-মেয়ের মা, বয়স ছাব্বিশ বছর। সনাতনের মেয়ে দীপালির জন্মের ছ'বছর পরে সুনীতার জন্ম হয়েছিল। কাজেই বুঝতে পারছো রামতনু। আমি তো বেশ বুঝতে পারছি, সনাতনের ওই ধাড়ি খেলোয়াড় মেয়ে দীপালি মতলব করে অনিমেষের মতো প্রায় নাবালক একটা ছেলেকে বুকের উপর শক্ত করে জড়িয়ে ধরেছে আর ছেলেটার রক্তে পাগলামি ধরিয়ে দিয়েছে।

রামতনু হাসে—আপনি এসব অ্যানাটমির আলোচনা ছেড়ে দিয়ে এবার শেষ খাজনা আদায়ের হিসাবটা লিখে ফেলুন।

কী ব্যাপার? কী হলো? দশটা দিন পার হয়ে গেল, তবু এখনও চিঠি দিয়ে জানিয়ে দিচ্ছে না কেন অনিমেষ, কবে বিয়ের দিন ঠিক হয়েছে?

দশটা দিনের পর আরও দশটা দিন পার হয়ে গেল। তারপর পুরো দুটো মাস। কী আশ্চর্য, নিকুঞ্জবাবুর কোন চিঠি আর এল না কেন? দু-চারটে বেনামী চিঠিই বা আসে না কেন?

দুশ্চিন্তা সহ্য করতে না পেরে একদিন জগনপুরে চলে গেলেন পুষ্করবাবু। মা নেই, বাপ নেই ওই দুর্দান্ত ছেলেটার জন্য তিনি কিছুদিন ধরে বড় বেশি মায়া বোধ

করছেন। ছেলেটার যেন আরও ভয়ানক রকমের কোন ক্ষতি না হয়ে যায়।

দুদিন পরে জগনপুর থেকে ফিরে এসেই পুষ্করবাবু বলেন—শুনেছো রামতনু অনিমেষের এখন কী দশা হয়েছে?

রামতনু—না, শুনিনি।

পুষ্করবাবু—অনিমেষ পুরো দেড় মাস হাসপাতালে থেকে তারপর এই ক'দিন আগে বাড়িতে ফিরেছে।

কেশে কেশে গলাটাকে যেন একটু পরিষ্কার করে নিলেন পুষ্করবাবু। তবু কথা বলতে গিয়ে তাঁর গলার স্বরটা বারবার ফুঁপিয়ে উঠছে। থিয়েটারের সীন এখন পাল্টে গিয়েছে, রামতনু। তবে একটা আশ্চর্যের কথা শোন। নিকুঞ্জবাবু বললেন, যে মুরলীবাবু কখনও সনাতনবাবুর দিকে একবার চোখ তুলে তাকাতেনও না, সনাতন মোক্তারকে একটা মানুষই বলে মনে করতেন না, তিনি গিরিডিতে ব্যাঙ্কের বারান্দাতে একদিন সনাতনবাবুকে দেখতে পেয়েই সহাস্যে একটা কথা বলেই ফেললেন—কেমন আছেন? আপনি তো এখন জগনপুরের একজন বেশ ভালরকমের বড়লোক। ধন্যবাদ, অজস্র ধন্যবাদ। আপনি কত তাড়াতাড়ি আপনার অবস্থার এত বড় একটা উন্নতি করে ফেললেন।

থিয়েটারের এই নতুন সীনের চেয়ে আরও বড় আশ্চর্যের সীন হলো, সনাতনের মেয়ে দীপালির নতুন ভালবাসার যত নতুন চিঠির লেখালেখির সীন। মুরলীবাবুর আইন-পড়া ছেলে সোমনাথকে চিঠি লিখে ফেলেছে দীপালি, তুমি কি জান, তুমি কি বিশ্বাস করবে যে, আমি তোমার আশায় বসে আছি, দিন গুণছি?

সোমাথের কাছে দীপালির চিঠি পেঁছে দেবার আগে ঝি রামদুলারী সনাতন আর শুভময়ীকে চিঠিগুলি দেখিয়ে দিয়েছে। মেয়ের মনের কথা জানতে পেরে বাবা-মা দু'জনেরই দু'জোড়া চোখে নতুন আশা হেঁসে উঠেছে।

সনাতনবাবু আর শুভময়ী, সুখী দম্পতির দুজনেই একদিন দেখতে পেয়েছেন, সন্ধ্যার ফিকে জ্যোৎস্নার মধ্যে নার্সারির গোলাপকুঞ্জের কাছে দাঁড়িয়ে গল্প করছে দীপালি আর সোমনাথ, একটা গোলাপফুল তুলে নিয়ে দীপালির খোঁপাতে গুঁজে দিল সোমনাথ।

সোমনাথকে সঙ্গে নিয়ে, আর সেই ফুল খোঁপার শোভাকেও সঙ্গে নিয়ে ফিরে এল দীপালি। দুজনে টেবিলের একদিকে পাশাপাশি দুটি চেয়ারে বসে চা খেল। শুভময়ী নিজের হাতে চা পরিবেষণ করলেন। চা খেয়ে চলে গেল সোমনাথ। দীপালি ভিতরের ঘরে ঢুকে আয়নার সামনে এসে দাঁড়িয়ে দুই চোখ বড় করে যেন নিজেরই দুই কালো চোখের রূপ দেখতে থাকে। বোধ হয় বুঝতে চেষ্টা করেছে দীপালি, এই কালো চোখের চাউনি আগে কোনদিনও কি এত বিহ্বল হয়ে যেতে পেরেছিল?

রামদুলারী কাছে এসে দাঁড়ায়।—দিদিমণি, তোমার বড়-বড় কালো চোখ দুটো

আগে এত চমৎকার কালো ছিল না।

বাইরের বান্দায় দুই চেয়ারে বসে যে-কথা বলাবলি করেন সনাতন আর শুভময়ী সে-কথা শুনে ফেলেছে দাই রামদুলারী! নিকুঞ্জবাবু চিঠি দিয়ে পুষ্করবাবুকে জানিয়েছেন সনাতন খুব খুশি হয়ে বলেছে, দীপালির বুদ্ধি আছে।

তারপর আর বেশি সীন নয়। থিয়েটারের ড্রপ সীন পড়ে গেল। খুব ঘটা করে মেয়ের বিয়ে দিলেন সনাতনবাবু। বিয়েতে জগনপুরের সব বাঙালী বাড়ির ছেলে-মেয়ে-পুরুষ সবাই এসেছিলেন। শুধু এক নিকুঞ্জবাবু আসেননি। সবাই বলেছেন—বাঃ, যেমন কনে তেমনই বর। সুন্দর মানিয়েছে।

পুষ্করবাবু—শুনলে তো রামতনু, মুরলীবাবুর ছেলে সোমনাথের সেই সিড়িঙ্গে কেলে চেহারাটা কত সহজে ও কত তাড়াতাড়ি সবার চোখের কাছে সুন্দর হয়ে গেল।

রামতনু—ওরকম হয়েই থাকে।

পুষ্করবাবু—এখন আমি বুঝতে পারছি রামতনু, যেটা আগে ঠিক বুঝতে পারিনি। সনাতনের ওই মেয়েটাই হলো ডাইনের মায়া খেলাবার সব চেয়ে বড় খেলোয়াড় মায়াবিনী।

রামতনু—থাক্‌গে, যেতে দিন।

পুষ্করবাবু—ওদিকে অনিমেষের কী দশা হয়েছে শুনবে?

রামতনু—বলুন।

পুষ্কবাবু। সনাতন মোক্তার অনিমেষকে চিঠি লিখে জানিয়ে দিয়েছে, আপাতত দু-চারটে মাস তুমি এই বাড়িতে থাকতে পারবে, তারপর কিন্তু আর নয়। তুমি অন্য কোথাও থাকবার ব্যবস্থা করে নেবে। হ্যাঁ, বাড়ির সব ঘরের সব তালার চাবি দারোয়ানের কাছে থাকবে, তোমার কাছে নয়।

ওদিকে থিয়েটারের ড্রপ সীন পড়ে গেলেও এদিকে, তার মনে অনিমেষের ভাগ্যের থিয়েটারে একটা নতুন সীন দেখতে পেয়েছেন পুষ্করবাবু। তাঁকে দেখতে পেয়েই কেঁদে ফেলেছে দুর্দান্ত স্বভাবের সেই অনিমেষ।—বিয়ে হলো না বলে আমার মনে কোন দুঃখ নেই, কাকা। শুধু দুঃখ এই যে, দীপালি একদিনের জন্যেও আমাকে টাইফয়েডের জ্বর-জালা আর দুরবস্থার মধ্যে একটিবারও দেখতে এল না। এখনও যদি একবার আসতো, তবে···।

—সেটা এখন আর হয় না, অনিমেষ। দীপালি এখন অন্য একজনের বউ। তার পক্ষে তোমাকে দেখতে আসা সম্ভব নয়। সেটা মানুষের সংসারের নিয়ম নয়।

অনিমেষ—অন্তত একটিবার লুকিয়ে আসতে তো পারে। আমি সনাতনবাবুকে দশটা চিঠি লিখেছি, দীপালি যেন অন্তত একটিবার লুকিয়ে এসে আমাকে দেখে যায়। কিন্তু কই, অপেক্ষা করে করে হাঁপিয়ে উঠেছি, দীপালি তবু এল না।

জগনপুরের নিদারুণ থিয়েটারী ঘটনার কথা হঠাৎ থামিয়ে দিয়ে চমকে ওঠেন পুষ্করবাবু—সর্বনাশ।

রামতনু—কিসের সর্বনাশ ?

পুষ্করবাবু—শব্দ শুনতে পাচ্ছেন না, বাইসনের দলটা যে আমাদের ক্ষেতের সব মকাই খেয়ে সাবাড় করছে।

হেসে ফেলে রামতনু।—না, আমি খোঁজ নিয়ে জেনেছি, দুর্দান্ত স্বভাবের যত গাউর-দল রোজই ক্ষিপ্ত হয়ে সেই বিবাদী ডাঙ্গা জমিটার দিকে ছুটে যায়। রোজই লড়াই হচ্ছে। জমি জরীপের সার্কেল অফিসার এরই মধ্যে ডাঙ্গা জমিটার কাছে মস্ত বড় আর শক্ত একটা তেঁতুল গাছের উপর চমৎকার মাচান বেঁধে ফেলেছেন। আমাদের দুজনকেই নেমন্তন্ন করেছেন সার্কেল অফিসার—মাচানে বসে চা খাবেন আর বাইসনের জঙ্গল দখলের যুদ্ধ দেখবেন তো চলে আসুন।

কিন্তু বাইরের রাস্তার উপর ঝপাং করে যে শব্দটা আছড়ে পড়লো, সেটা তো একটা সাইকেলের আছাড় খাওয়া আওয়াজ। হ্যাঁ, অনিমেষই এসেছে। টাইফয়েডে ভুগে বেশ দুর্বল ও রোগা হয়ে গিয়েছে শরীর, তবু তাই নিয়েই জঙ্গলের এই দীর্ঘ পথ সাইকেল চালিয়ে ছুটে এসেছে অনিমেষ। কিন্তু এ কী!

অনিমেষের চেহারাটা যেন আগুনে জ্বালা লেগে জ্বলছে। হাতে একটা চকচকে খোলা তরবারি, সেটাও যেন আগুনের জ্বালা সহ্য করতে গিয়ে থরথর করে কাঁপছে।

চেঁচিয়ে ওঠে অনিমেষ।—আমার এখনই একটা ঘোড়া চাই রামতনুদা। শিগগির দিন। একটুও দেরি করবেন না।

পুষ্করবাবু এগিয়ে যেয়ে অনিমেষের তরবারি-ধরা হাতের মুঠোটাকে দুই হাতে শক্ত করে চেপে ধরেন।—এ কী, অনিমেষ এ-সব আবার কী ব্যাপার ?

চেঁচিয়ে ওঠে অনিমেষ।—আজ আমার এই তরবারির এক কোপে শত্রুর মাথাটাকে ঘাড় থেকে নামিয়ে দেব। তারপর সেই মাথাটাকে লাথি মেরে চলে যাব। তারপর যা হবার তাই হবে, ফাঁসি কিংবা কালাপানি।

পুষ্করবাবু—কে তোমার শত্রু ?

অনিমেষ—জগনপুরের মুরলী রায়ের ছেলে সোমনাথ রায়।

পুষ্করবাবু—কোথায় সোমনাথ ?

অনিমেষ—খবর পেয়েছি, লাঠিয়াল দলের সঙ্গে সোমনাথও আজ ওদিকের জঙ্গলে ঢুকছে। আজ হাল্লা করে ডাঙ্গা জমিটাকে দখল করবে সোমনাথ। কাজেই·· না, আপনার পায়ে পাড়ি কাকা, আমাকে ছেড়ে দিন, আমাকে আটকাবেন না। আপনারও পায়ে পড়ি রামতনুদা, আমাকে একটা ঘোড়া দিন। আমি কথা দিচ্ছি, আমি এক ঘণ্টার মধ্যেই আমার কাজ সেরে নিয়ে ফিরে আসবো আপনাদেরই পায়ের কাছে এই তরবারিটাকে জমা কর দেব।

রামতনু—তুমি শান্ত হয়ে এখানেই বসে থাক, অনিমেষ। সেখানে গেলে তোমার শত্রুকে আজ আর দেখতে পাবে না। লাঠিয়াল নিয়ে সোমনাথ যদি এসেও থাকে, তবে এতক্ষণে ফিরে চলে গিয়েছে। না ফিরে গিয়ে উপায় নেই। সেখানে এখন বাইসনের দুটো দলের মধ্যে মারামারি চলছে।

এইবার অনিমেষের পিঠে হাত বুলিয়ে কথা বলে রামতনু,—সোমনাথ তোমার ঠিক শত্রু নয়, অনিমেষ। তোমার আসল শত্রু হলো তুমি।

জোরে একটা নিঃশ্বাস ছাড়ে অনিমেষ। আপনি এ আবার কী রকমের অদ্ভুত কথা বলেছেন, রামতনুদা।

তসীল কাছারির তিন চাকর তিন টাট্টু ঘোড়াকে হাঁকিয়ে নিয়ে এসে কাছারির বড় দরজার কাছে দাঁড় করিয়ে দেয়। পুষ্করবাবু বলেন, ওরে, তিনটে ঘোড়া নিয়ে এলে কেন ? ভুল করেছিস।

বেশ খুশি হয়ে হাসতে থাকে রামতনু।—ভুল করে ওরা ভালই করেছে। অনিমেষও চলুক আমাদের সঙ্গে। মাচানে বসে বাইসনদের মারামারির দৃশ্যটা দেখুক।

অনিমেষ এইবার খুব শান্তস্বরে, যেন একটা দমকা নিঃশ্বাসকে চেপে দিয়ে কথা বলে—আমাকেও যেতে বলছেন ?

পুষ্করবাবু—হ্যাঁ, যেতে বলছি বৈকি।

তিন ঘোড়াতে তিন সওয়ার, পুষ্করবাবু, রামতনু আর অনিমেষ দুপুরের রোদ বেশ তেতে উঠেছে। আর বেশি সময় নেই, বিকেলের রোদ একটু লালচে হয়ে উঠলেই ঝগড়াটে দুই গাউর বাইসনের দল মারামারি থামিয়ে দেবে। তারপর, সন্ধ্যা হবার আগেই জঙ্গলের ভিতরে দুই দিকে চলে যাবে। অবশ্য কাল সকালে ওরা আবার এসে···।

বাঃ, খুব চমৎকার পজিশনে মাচান বাঁধিয়েছেন সার্কেল অফিসার। তেঁতুল গাছের অনেক উঁচুতে, কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রের একেবারে প্রান্তিক স্থানে গাউরদের মারামারির দৃশ্যটা খুব স্পষ্ট দেখা যায়। সব কিছুই স্পষ্ট করে দেখা যায় আর শোনা যায়। সার্কেল অফিসারের নিমন্ত্রিত আরও পাঁচজন দর্শক অতিথি মাচানের উপর বসে আছেন। সার্কেল অফিসার রামতনুকে দেখে খুশি হন।—আপনাদের দুজনকে তো চিনি, কিন্তু ইনি কে ? সুন্দর এই ছেলেটি ?

রামতনু—এ হলো আমাদের অতিথি। ভাণ্ডারী পুষ্করবাবুর এক জ্ঞাতি ভাইয়ের ছেলে।

দুই গাউর দলের দুই মত্ত আক্রোশের সংঘর্ষ, কী ভয়নক একটা উদ্দাম দৃশ্য। গুঁতোগুঁতির শব্দ পাথর ফাটাবার শব্দের মত ফটফট করে বেজে উঠছে। এর শিং-এর উন্মত্ত আঘাতে ওর শিং ভেঙে পড়েছে। ঘায়েল গাউরের কপালের পাশে

ঝুলছে ভাঙা শিং। ডাংগাজমির শুকনো ধুলো রাগী গাউরের ক্ষুরের ঘষা খেয়ে ছোট-ছোট ঘূর্ণির মতো উড়ছে আর ঘুরছে। গাঁ গাঁ গাঁ, রাগী গাউরের ডাক কী ভয়ানক আক্রোশের শব্দ ছাড়ছে। কাদামাখা শরীর, একটা গাউর মাটির উপর লুটিয়ে পড়েছে, উঠে আর দাঁড়াতেই পারছে না। বিপক্ষ দলের একটা গাউর ছুটে এসে পতিত গাউরের বুকটাকে এক প্রচণ্ড গুঁতো মেরে যেন ফাটিয়ে দিয়ে সরে গেল। পতিত গাউরের মুখ থেকে রক্তের ধারা উথলে ওঠে, গলগল করে গড়িয়ে পড়ে। ধুলোতে আর রক্তেতে মিশে গিয়ে কাদা হয়ে যায়।

সার্কেল অফিসার হঠাৎ বলে ওঠেন—এইবার এদিকের একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখুন।

কোন্ দিকে ?

সার্কেকল অফিসার—এই যে আমাদের মাচানের ছায়ার কাছে, আমলকীর ঝোপের পাশে যে দাঁড়িয়ে আছে তাকে একবার দেখে নিন।

একটা পা খোঁড়া, বোধ হয় পায়ের ক্ষুর পচে গিয়েছে, তাই সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না মস্ত বড় এক মদ্দা গাউর। একটা চোখও গলে গিয়েছে। নড়বড় করছে মাথার দুটো শিং, পিঠের উপর একটা দগদগে ঘা, তার উপর বসে মাছির দল ঘেয়ো মাংস খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে। যন্ত্রণায় এক-একবার কেঁপে উঠছে মদ্দা গাউরের দুর্বল দেহটা।

সার্কেল অফিসার।—ইনি হলেন বিতাড়িত দলপতি। নতুন দলপতি এনাকে মেরে গুঁতিয়ে দলছাড়া করে দিয়েছেন। পুরনো দলপতির আজ কী অবস্থা হয়েছে দেখুন। দলের সঙ্গে আর নয়, ইনি লুকিয়ে-লুকিয়ে দলের পিছনে থেকে জঙ্গলের ভিতরে চরে বেড়ান।…হ্যাঁ এইবার দেখুন, দলের ভিতর থেকে লুকিয়ে বের হয়ে গোপন অভিসারিকার মতো একটি মাদি গাউর আস্তে-আস্তে হেঁটে দলছাড়া এই মদ্দাটারই দিকে চলে আসছে।

রামতনু—কে উনি ?

সার্কেল অফিসার—অনুমান করছি, উনি হলেন এই মদ্দা গাউরের একজন পুরনো সঙ্গিনী।

মাদি গাউর, তার মানে বিতাড়িত দলপতির পুরনো সঙ্গিনী, তার মানে পূর্বতন প্রেমিকা, তার মানে যে ছিল এই মদ্দা গাউরের জীবন-যৌবনের প্রধান সহচরী, যে আজ অন্য এক দলপতি মদ্দা গাউরের সঙ্গিনী, সে আজ কেমন চুপি-চুপি একটা অনিয়মের টানে এখানে হাজির হয়েছে।

আগন্তুক মাদি গাউরটা খুব মায়া করে মদ্দা গাউরের গলা থেকে কাদার দাগগুলিকে চেটে-চেটে মুছে দিল! বিশ্বাস করলে বোধ হয় ভুল হবে না, পুরনো সাংগনী যেন পুরনো সংগীর অসহায় একলা ও দুঃখী জীবনটাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে।

সার্কেস অফিসার—সবাই ভাল করে দেখে নিন! জুলজির কোন বইয়ের ছবিতে এই দৃশ্য দেখতে পাবেন না। আমি তো জু'লজির ছাত্র। কিন্তু চোখে না

দেখলে বিশ্বাসই করতে পারতাম না যে দেশী বাইসনের মত কড়া মেজাজের প্রাণীর জীবনেও পুরনো ভালবাসার স্মৃতি আর মায়ার এরকম একটা ক্রিয়া আছে।

গাঁ গাঁ গাঁ, ডাক ছাড়ছে নতুন দলপতি। চমকে উঠলো গোপনচারী মাদি গাউর, তারপর দুরন্ত বেগে দৌড় দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ফিরে আসবার পথে চোখে পড়ে রামতনুর, অনিমেষ ঘোড়ার পিঠের উপর যেন ধ্যানীর মত নীরব হয়ে বসে রয়েছে। অনিমেষকে কয়েকবার নাম ধরে ডাকও দেয় রামতনু। কিন্তু সাড়া দেয় না অনিমেষ। কী এত ভাবছে ছেলেটা? এত আস্তে চালালে ঘোড়া যে কাছারিতে পেঁছিতে রাত করে ফেলবে।

বাঃ, অনিমেষের ধ্যান ভাঙল কখন? চমৎকার এক খুশির মূর্তি ধরে, ঘোড়াটার চলবার চালে দুরন্ত একটা বেগ ধরিয়ে দিয়েছে অনিমেষ। রামতনু আর পুষ্করবাবুর দুই ঘোড়াকে অনেক পিছনে রেখে এগিয়ে ছুটে গেল অনিমেষের ঘোড়া।

কাছারিবাড়িতে ফিরে এসে আর ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে পড়তেই দেখতে পায় রামতনু, বারান্দার উপর একটা চারপায়ার উপর বসে গান গাইছে অনিমেষ।

চেঁচিয়ে ওঠে অনিমেষ—আজ আমি খুব শিক্ষা পেয়ে গেলাম, রামতনুদা।

রামতনু—কিসের শিক্ষা?

অনিমেষ হাসে—আমার অসুখের খবর শুনে, আমার অনুরোধের দশটা চিঠি পেয়েও তো আমাকে একটি বারও দেখতে আসেনি, দীপালি নামে আমার সেই…।

রামতনু—তোমার সেই অনুরাগিণী মেয়েটি।

অনিমেষ—হ্যাঁ, কিন্তু এখানে দেখছি, একলা অসহায় একটা বাইসনের পুরনো সঙ্গিনী একটা বাইসনী তার পুরনো সঙ্গীকে কী চমৎকার সান্ত্বনা দিয়ে চলে গেল।

রামতনু—তাই তো।

অনিমেষ—তবে বলুন না রামতনুদা, মানুষ-প্রাণীর চেয়ে বনের প্রাণীর প্রাণ অনেক মহৎ কি না?

রামতনু—তাই তো বলছি।

অনিমেষ—তবে আমি আর জগনপুরে ফিরে যাব না, রামতনুদা। আমাকে এখানেই থাকতে দিন, আমাকে এখানেই একটা চাকরি জুটিয়ে দিন।

পুষ্করবাবু ব্যস্তভাবে এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করেন—অ্যাঁ, কী বলছে অনিমেষ?

রামতনু—অনিমেষ আর জগনপুরে ফিরে যেতে চাইছে না, এই জঙ্গলের জগতে থাকতে চাইছে।

পুষ্করবাবু—থাকুক, থাকুক।

ডায়েনা ও মালতী

কে এলে নূপুর পায় ?

রতনপুর রাজ এস্টেটের কুড়ি টাকা মাইনের তশীলদার রামতনু কোনদিন কল্পনাও করতে পারেনি যে, জঙ্গলের জীবনে এরকম কোন প্রশ্ন থাকতে পারে। প্রফেসর চারুবাবু, যিনি কবিতার তাজমহলের প্রশান্ত পাষাণের রূপ আর মর্মকথার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বন আর বনমায়ার কথা এনে ফেলতেন, তিনিও কোনদিন বলেননি যে পৃথিবীর কোথাও কোন জঙ্গলের ভিতরে নূপুরের শব্দ ছুটোছুটি করে। রামতনু নিজেও তার তসীলদারী চাকরীর এই তিন মাসের মধ্যে এই ভেলাডিহির জঙ্গলের ভিতরে অনেক অদ্ভুত শব্দের সাড়া শুনেছে বটে, কিন্তু নূপুরের শব্দের মতো কোন শব্দ কোনদিনও শোনেনি। মাঝরাতের ঝড় একটু বেশী উতলা হয়ে উঠতেই শুনতে পাওয়া গিয়েছে, যেন কারও বাঁশীর করুণ সুর উতলা হয়ে বাতাসে ছুটে বেড়াচ্ছে। ওটা জঙ্গলের একটা বাঁশঝাড়ের কাণ্ড। ফাটা বাঁশগাছের গায়ে ঝড়ের বাতাস লেগেছে। ফট্-ফট্-ফটাস্, বনের ভিতরে কোথাও যেন মুঙ্গেরী পিস্তলের ধড়কানো শব্দের মতো একটা কট্টর শব্দ বেজে উঠেছে, ডুমুর গাছের সব ঘুঘু ভয় পেয়ে উড়ছে। ওটা গিলে গাছের পাকা ফলের হঠাৎ ফেটে যাওয়ার শব্দ। কিন্তু মাঝরাতের জ্যোৎস্না যখন শাল সীসু আর সেগুনের কালোছায়ার ফাঁকে ফাঁকে গড়িয়ে-ছড়িয়ে খেলা করে, তখন ভেলাডিহির জঙ্গলকে আধঘুমের স্বপ্ন দিয়ে তৈরী-করা একটা মায়ার রাজা বলে মনে হলেও কোন নূপুরের ছুটোছুটির শব্দ কখনও শুনতে পায়নি রামতনু। ভেলাডিহি থেকে সামান্য দূরে, জঙ্গলেরই ভিতরে মিঠুয়া বস্তির ওরাওঁদের মাদলের শব্দ প্রায়ই শুনতে পাওয়া যায়, নাচুনী মেয়েদের গানের স্বরও একটু-একটু শোনা যায়। কিন্তু নূপুরের শব্দ নয় ওরাওঁ মেয়েদের পায়ে ঘুঙুর থাকে না।

ভেলাডিহির জঙ্গলে অপূর্ব-অদ্ভুত নূপুরের ছুটোছুটির বিস্ময় একটা চমৎকার গল্প হয়ে আর রটতে রটতে এই ভেলাডিহিতেও এসে পৌঁছেছে, সেটা হলো হাজারিবাগ জেলারই চাতরা মহকুমার একটা জংগল। পালামউ জেলার গা-ঘেঁষে চাতরা মহকুমার যে নিবিড় শালজংগলের ভিতরে ছোট-বড় অনেক খয়ের গাছের উপনিবেশ ছড়িয়ে রয়েছে, সেই জংগলের খবর এই যে মাসের মধ্যে অন্তত পাঁচ-সাতটা চাঁদনী রাতে শুনতে পাওয়া যাবেই, ঘুঙুরের শব্দ উদ্দাম হয়ে ছুটোছুটি করছে। এ তো কোন মানুষ-নারী ঘুঙুরের শব্দ হতে পারে না। তবে কার ঘুঙুরের শব্দ ? সকলেরই বিশ্বাস, বনদেবীর পায়ের ঘুঙুরের শব্দ। খুশী বনদেবী চাঁদনী রাতের আলোতে উৎফুল্ল হয়ে সারা বনে এদিকে-ওদিকে ছুটে বেড়ায়।

একথা ঠিক, বনদেবীকে কেউ কখনও চোখে দেখতে পায়নি। কিন্তু তার ঘুঙুরের শব্দ অনেকেই শুনেছে। নুরগঞ্জের সার্কেল অফিসার জগদীশবাবু শুনেছে, ছোট হাটিয়ার দিগোয়ারী ঘাটির চৌকিদার বুধন সিং শুনেছে। আর, নুরগঞ্জ সার্কেলেরই মধ্যে ঝুমরাটি নামে পরিচিত জঙ্গলের ভিতরে রতনপুরা রাজ এস্টেটের যে তসীল কাছারি আছে সেই কাছারির সবাই শুনেছে।

কয়েকদিন ধরে প্রশ্নটা এই ভেলাডিহির রামতনুর মনেও বেশ উতলা হয়ে উঠেছে—কে এলে নূপুর পায় ? জানতে ইচ্ছা করে, জানবার জন্য মনটা ছটফট করে, খবরটা কি সত্যিই একটা ঘটনার খবর, কিংবা নিতান্ত কাল্পনিক কুহকের চমৎকার প্রলাপ। বনদেবী চাঁদনী রাতের আলোতে উৎফুল্ল হয়ে আর নূপুর পায়ে দিয়ে জঙ্গলের ভিতরে ছুটোছুটি করে, এও কি সম্ভব ? প্রফেসর চারুবাবু থাকলে তিনি অবশ্য এক মুহূর্তে না ভেবে বলে দিতেন, হতে পারে অসম্ভব নয়। সাতদিন ধরে খবরটা শুনতে শুনতে রামতনুর মনটাও যেন বলতে শুরু করেছে, হতে পারে, অসম্ভব নয়।

রতনপুরা রাজ এস্টেটের ঠাকুর সাহেবকে একটা চিঠি লিখে তো অনুরোধ করা চলে : আমাকে অন্তত একটা মাসের জন্য ঝুমরাটি তসীল কাছারিতে বদলি করে দিন। শুনেছি, এই মাসেই সেখানে এস্টেটের জঙ্গলে খয়ের ভাঙবার কাজ শুরু হবে। ভাণ্ডারীজী বলছেন, এই কাজটা ভাল করে দেখাশোনা করবার জন্যে আপনি নতুন লোক খুঁজছেন। নতুন লোক কেন। আমিই যাব। আমাকে একবার সুযোগ দিয়ে দেখুন, খয়েরের কাজের ক্ষতি ও চুরি বন্ধ করে আমি এস্টেটের লাভ কিছু বাড়িতে দিতে পারি কি না।

কী আশ্চর্য, ভাণ্ডারীজী একটা চিঠি হাতে নিয়ে এসে হেসে ফেললেন আর বললেন—যান রামতনুবাবু, বনদেবীর ঘুঙুরের শব্দ শুনে আসুন।

চমকে ওঠে রামতনু—কী বললেন ?

—ঠাকুর সাহেব চিঠি দিয়েছেন, অন্তত দু'মাসের জন্য আপনাকে ঝুমরাটি কাছারিতে থাকতে হবে। খয়েরের কাজটার দেখাশোনা করতে হবে।

॥ দুই ॥

ঝুমরাটির তসীল-কাছারির কোন ঘরের দরজা ও জানালা সন্ধ্যার পর আর খোলা থাকে না। মাটির দেয়াল আর খাপরার চালা, ঘরগুলি তখন এক-একটা নিরেট খাঁচার মতো দেখায়। দেয়ালের মাথার কাছে দু'চারটে ফোকর আছে বলে ঘরগুলি নিশ্বাস টানতে পারে। সাত বছর আগে ঝুমরাটির এই তসীল-কাছারির একটি ঘুমন্ত ঘরের আধ-খোলা জানালা দিয়ে একটা তেন্দুয়া বাঘ ভিতরে ঢুকেছিল। আর, মুহুরী মানিকরামের বোবা চাকরটাকে তুলে নিয়ে গিয়ে বেচারার রোগা

শরীরের প্রায় অর্ধেকটা খেয়ে ফেলেছিল। সকালবেলা মোষের স্নানে কাদাটে ডোবাটার কিনারাতে জংলী কুলের ঝোপের উপর একটা শকুনকে ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখে বোবার লাসের বাকি অর্ধেকটার খোঁজ পাওয়া গিয়েছিল। এই ভয়ানক অভিজ্ঞতার শিক্ষায় সাবধান হয়েছে ঝুমুরাটি তসীল-কাছারির ঘরগুলি।

শুধু একটি ঘর, যার চার দেয়ালে রঙীন আলপনা, আর বারান্দাতে পাতা-বাহারের টবের সারি, তার চেহারাতে কোন সাবধানতা নেই। সন্ধ্যা হলেও ঘরের বড়-বড় জানালা অনেকক্ষণ, কোন-কোন দিন মাঝরাত পর্যন্ত খোলা থাকে, ঘরের ভিতরে টেবিলের উপর ল্যাম্প জ্বলে। আর, একটা চেয়ারের উপর যাকে বসে থাকতে দেখা যায়, তার প্রাণটার ভিতরেও কোন সাবধানতা আছে বলে মনে হয় না। সন্ধ্যা হবার পর গাছের মাথা বাতাস লেগে দুলে উঠতেই অন্য সব ঘরের বন্ধ জানালার গায়ের উপর যখন এক-একটা ঘুটঘুটে অন্ধকারের পিণ্ড রাতের বাঘের ছায়া-চেহারার মতো নড়চড় করে, তখন এই সুশ্রী কেবিন-ঘরের খোলা জানালাতে জাগা আলোর হাসি থমথম করে। সুশ্রী মানুষটি, যিনি চেয়ারের উপর বসে বই পড়েন আর লেখালেখি করেন, তিনি এই তসীল-কাছারির কেউ নন। তিনি ঠাকুর সাহেবের বেয়াই-এর, মোক্তার নন্দলালবাবুর ভাইপো, জীবনলাল।

বদলি হয়ে ঝুমরাটির তসীল-কাছারিতে এসে প্রথম দিনেই কুড়ি বছর বয়স আর কুড়ি টাকা মাইনের তসীলদার রামতনুর সঙ্গে যে-মানুষটির বেশ একটু কথা কাটাকাটির ব্যাপার হয়েছে সে হলো এই জীবনলাল। রামতনুর সঙ্গে দেখা হতেই প্রশ্ন করেছে জীবনলাল—কী মশাই, আপনি এখানে কেন?

রামতনু—আপনি কি আমাকে চেনেন?

—না। দেখে মনে হচ্ছে আপনি একজন এডুকেটেড মানুষ।

—তা, মনে করতে পারেন।

—তাই জিজ্ঞেস করছি পৃথিবীতে এত জায়গা থাকতে এই জঙ্গলে মরতে এলেন কেন?

—আপনিই বা এই জঙ্গলে আছেন কেন?

—আমি এখানে আছি, খুড়োর সম্পত্তি পাব বলে। আমার দেহটা শুধু এখানে পড়ে আছে, আমার প্রাণটা পড়ে আছে সেখানে, শোনপুরের মালতীর কাছে।

দশ মিনিটের মধ্যে অনেক কথা বলে ফেলে জীবনলাল। তার মুখের ভাষাটা খুবই বেহায়া বটে, কিন্তু বুঝতে দেরি হয় না রামতনুর, ভদ্রলোক মিথ্যে কিছু বলছেন না। ঠিকই, জঙ্গলে থাকেন বটে জীবনলাল কিন্তু জঙ্গলকে মনে-প্রাণে ঘৃণা করেন।

মোক্তার নন্দলালবাবুর এই ভাইপো জীবনলালই তাঁর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে, কারণ নন্দলালবাবুর কোন ছেলে বা মেয়ে নেই। খুড়ো বলেছেন: চাকরি-বাকরি যদি না করতে চাও, করো না। কিন্তু কুঁড়ে হয়ে ঘরে বসে থাকতে পারবে

না। বিষয়সম্পত্তির অন্তত একটু তদারকী কাজ কর করতে শেখ., নইলে বিশ্বাস করবো কেন যে. তুমি আমার বিষয়-সম্পত্তি ভোগদখল করবার যোগ্য লোক? যদি কাজ করতে আর যোগ্যতার প্রমাণ দিতে না পার, তবে জেনে রাখ, আমার সব বিষয়-সম্পত্তি আর্যসমাজ মিশনকে দান করে দেব।

ঝুমরাটির জঙ্গলের ভিতরে সোপস্টোনের দশটা বড় বড় খাদ নন্দলালবাবুরই সম্পত্তি। সম্পত্তির তদারক করবার জন্যে জঙ্গলের ভিতরে একটা ঠাঁই নিয়েছে জীবনলাল। এই হলো ব্যাপার। জীবনলাল বলে—কারবারের তদারকী ফদারকীর কোন ধার আমি ধারি না। যা করবার সবই করে মুন্সী ত্রিলোচন। আমি শুধু খুড়োর একটা মরজি রক্ষা করবার জন্যে এখানে পড়ে আছি, রামতনুবাবু। শুধু খুড়োর সম্পত্তি পাওয়ার ভাগ্যটাকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে। আপনার মতো তসীলদারী চাকরি করবার জন্য জঙ্গলে আসতে হলে তাই বা কেন, আসবার আগেই আমি সুইসাইড করতাম। আমার জীবনে শুধু দুটি ইচ্ছা। এক খুড়োর সম্পত্তি চাই। দুই, মালতীকে চাই।

জীবনলালের মুখের ভাষা হঠাৎ আরও বেহায়া হয়ে রামতনুকে বুঝিয়ে দেয়: যেমন আমার স্বপ্ন হলো মালতী তেমনই মালতীর স্বপ্ন হলো এই জীবনলাল। শোনপুরে আমার মামাবাড়ি, মামাবাড়ির বাগানের একটি চমৎকার নিরালাতে. সেখানে চামেলীর লতাঝাড়ের উপর জোড়া-প্রজাপতি উড়ে বেড়ায় সেখানে আমি মালতীকে প্রথম চুমো খেয়েছিলাম। মালতী আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়েছিল।

··এ তো প্রায় পাঁচ বছর আগের কথা। আমি তখন গ্র্যাজুয়েট মালতী তখন ম্যাট্রিক। আজ মালতী অবশ্য শোনপুরের মেয়ে-স্কুলের টিচার হয়েছে, আর আমি সোপস্টোনের একজন বনবাসী কারবারী হয়েছি. কিন্তু মালতীর কাছে আমি আজও সেই জীবন, আমার কাছে মালতী আজও সেই মালতী। চলুন রামতনুবাবু, আমার ঘরের ভিতরে এসে একবার মালতীর চিঠিগুলি পড়ুন। তারপর বলবেন এরকম ভালবাসার ব্যাপার আপনি আগে কোথাও দেখেছেন কি দেখেননি। কিন্তু ··।

কথা থামিয়ে বুকের উপর হাত বোলায় জীবনলাল, নিঃশ্বাসটাও হঠাৎ যেন হাঁসফাঁস করতে থাকে। জীবনলাল বলে—কিন্তু এখানে আসবার পর আমার বুকের ভিতরে একটা অদ্ভুত ব্যথার রোগ দেখা দিয়েছে। এই বনবাস আর সহ্য করতে পারছি না। কবে যে খুড়োর সম্পত্তি পাব, বুঝতে পারছি না। কবে যে মালতীর সঙ্গে বিয়ে হবে, তাও বুঝতে পারছি না। একটা সান্ত্বনা এই যে, মালতীর চিঠি পেলে অন্তত দশটা দিন আমার বুকে কোন ব্যথা থাকে না।

রামতনুর মুখের দিকে কিছুক্ষণ অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে থেকে তারপর হেসে ফেলে জীবনলাল—আপনার বুকেও বোধ হয় এক-আধটুকু ব্যথা-ট্যাথা আছে।

রামতনু—না মশাই, না।

—তবে এই জঙ্গলের ভিতরে টিকে থাকবেন কী করে?

—চাকরিটা টি঳্কে থাকলে আমিও টি঳্কে থাকতে পারবো।

—এঃ আপনি মশাই একেবারে একটি মাথা-খারাপ মানুষ। ভাল চান তে জঙ্গল ছেড়ে চলে যান, কলকাতায় কিংবা পাটনাতে গিয়ে একটি মেয়ের সঙ্গে ভা সাব করুন, ভালবাসুন।

—আপাতত যাচ্ছি না।

—তবে থাকুন। দিনের বেলাতে কাঁকড়া বিছার সঙ্গে গল্প করুন, আর রাত্রি ফেউরের ডাক শুনুন।

—লোকে বলছে, এই জঙ্গলে রাত্রিবেলা ঘুঙুরের শব্দ শোনা যায়।

—এঃ আপনি শিক্ষিত মানুষ হয়েও বড়ই বাজে বিশ্বাসের মানুষ। ভাং-খেবে চৌকিদার বুধনসিং যা বিশ্বাস করে, আপনিও তাই বিশ্বাস করছেন। আমি তে মাঝরাত পর্যন্ত জেগে থেকেও কোনদিন এরকম রোমাণ্টিক কোন শব্দ শুনতে পাইনি।

—লোকে বলছে, বনদেবীর পায়ের ঘুঙুরের শব্দ।

চেঁচিয়ে হেসে ওঠে জীবনলাল।—বাঃ মূর্খদের কী চমৎকার বিশ্বাস। বনদেব কেন কোন বনবাইজীও রাত্রিবেলা এই জঙ্গলে ঘুঙুর বাজিয়ে ঘুরে বেড়াতে আসবে না। এই জঙ্গল হলো ন্যাংটো জানোয়ারের রাজ্য।

—কিন্তু ··

—না কোন কিন্তু-টিন্তু নেই। আমি বলবো নরক নামে কোন জায়গা যদি থেকে থাকে তবে সেটা নিশ্চয়ই একটা জঙ্গল।

রামতনুর শান্ত চোখের কোনে বেশ দুঃসহ একটা অস্বস্তির ছায়া কাঁপতে থাকে। গলার স্বরও বেশ একটু রুক্ষ হয়ে জীবনলালকে পাল্টা একটা প্রশ্ন করে ফেলে—স্বর্গ নামে যদি কোন জায়গা থেকে থাকে তবে সেটা বোধহয় একটা সহর?

জীবনলাল বলে—হ্যাঁ, সেটা শোনপুরের মতো একটা সহর।

বুঝতে পারে রামতনু জীবনলালের সঙ্গে আর তর্ক করে কোন লাভ নেই। বনদেবী কথাটাকেও ঠাট্টা করে বন-বাইজী, বলে যে ব্যক্তি, তার কাছ থেকে বনের জীবনের কোন বিস্ময়ের খবর পাওয়া যেতে পারে না।

কিন্তু ঘুঙুরের শব্দটা কি সত্যিই ভাং-খাওয়া যত গেঁয়ো চৌকিদারের কল্পনার শব্দ? মিথ্যুক গুজবের শব্দ? জীবনলালের কথাগুলি রামতনুর কৌতূহলের আবেগটাকে দমিয়ে দিতে চাইলেও দমিয়ে দিতে পারেনি। একটু অবশ করে দিয়েছে এই মাত্র। কিন্তু সন্ধ্যে হতেই ঝুমরাটির জঙ্গলের উপর পূর্ণ চাঁদের কিংবা টুকরো চাঁদের জ্যোৎস্নাময় মায়া যখন ছড়িয়ে পড়ে, তখন রামতনুর প্রাণের ভিতরেও যেন অদ্ভুত এক মায়াময় বিশ্বাসের জ্যোৎস্না ছড়িয়ে পড়ে। একটু চেষ্টা করে দেখাই যাক না রাত জেগে খোলা জানালার কাছে বসে থাকলেই তো হয়। হোরাশিয়োর

ফিলসফি যা স্বপ্নেও ভাবতে পারে না, তেমন ঘটনার সত্য স্বর্গে-মর্ত্যে থাকতেও তো পারে।

কী চমৎকার ঢলঢলে জ্যোৎস্না? ঘুমন্ত শিশু যেমন নীরব নিথর ও শান্ত হয়েও মায়ের বুকের দুধ পান করে, এই ঝুমরাটি জঙ্গলের শাল সেগুন আর দেওদার যেন তেমনি নিথর নীরব ও শান্ত হয়ে চাঁদের ঢলঢলে আলো পান করছে। ফেউ ডাকে না, একটা ঝিঁঝির শব্দও নেই, গাছের মাথায় কোন পাখীর ডানাঝাড়ার শব্দ উসখুস করে না। এরকম একটা শব্দহীন আবেশের মধ্যে বনদেবীর নূপুরেরও তো শব্দহীন হয়ে যাবার কথা।

রাত বাড়ে, তবু রামতনুর চোখে ঘুম নেই, একটা শব্দ না শোনা পর্যন্ত আজ জেগেই থাকবে রামতনু। অন্তত একটা দুরন্ত শজারুর গায়ের কাঁটা ঝুমঝুম করে বেজে উঠুক। তা হলেই বুঝতে পারবে রামতনু, এই শব্দটাই লোকের মুখে ঘুঙুরের শব্দের গল্প হয়ে রটেছে।

চমকে ওঠে রামতনু। শিউরে ওঠে বুকটা। সত্যিই যে একটা ঘুঙুরের শব্দ ছুটে চলে যাচ্ছে! ছুটে-চলা দুরন্ত শজারুর কাঁটার শব্দ নয়। খাঁটি ঘুঙুরের শব্দ। ঘুঙুরের শব্দটা ছুটে এসে, কাছারি-বাড়ির খুব কাছে মোষের স্নানের কাদাটে ডোবাটার ওপারে আলো-ছায়ার মধ্যে পুরো একটা মিনিট ধরে, যেন মত্ত নাচের তালের একটা বোল বাজিয়ে দিয়ে আবার এক মুহূর্তের মধ্যে উধাও হয়ে গেল। শুনতে পায় রামতনু বনের শান্ত বাতাসের গা শিউরে দিয়ে ঘুঙুরের মিষ্টি শব্দটা দূর থেকে আরও দূরে ছুটে যেতে যেতে শেষে একবারে মিলিয়ে গেল। অনেকক্ষণ পরে, প্রায় আরও দুটি ঘণ্টা বিস্ময়ের আবেশে একবারে বিহ্বল হয়ে বসে থাকে রামতনু। বনদেবীকে চোখে দেখতে পাওয়া গেল না বটে, কিন্তু কেউ একজন তো এল আর চলে গেল। কে সে?

আবার একবার চমকে ওঠে রামতনু? এটাও একটা শব্দ-শোনা চমক। মনে হলো, অনেক দূরে কোথাও কেউ যেন বন্দুকের গুলি ছেড়েছে। ভুট্ ভুট্, দুটো ভোঁতা শব্দের আঘাতে রাতের শান্ত জ্যোৎস্না আহত হয়েছে। কাছারিবাড়ির আঙিনায় নিমগাছের মাথায় পাতাজড়ানো আবছায়ার মধ্যে কয়েকটা কাক ছটফট করে উঠলো।

॥ তিন ॥

একটা সমস্যায় পড়েছে রামতনু। পুরো একটা মাস পার হয়ে গেল, তবু সমস্যাটা মিটছে না। খয়ের গাছ ভাঙবার সব লোক ভিতর-জঙ্গলের ছাউনি ছেড়ে পালিয়ে এসেছে আর দূর গাঁয়ে নিজের নিজের ঘরে ফিরে গিয়েছে। ছাউনির চারদিকে বাঘের পায়ের বড়-বড় থাবার ছাপ দেখে সবাই ভয় পেয়েছে। চাতরা

বাজারের মহাজনের গো গাড়ি মাঝে-মাঝে আসছে। কিন্তু মাল না পেয়ে আবার ফিরে চলে যাচ্ছে। রামতনুর মনের ভয়, ঠাকুরসাহেবের কাছ থেকে একটা বিরক্ত চিঠি এসে পড়লো বলে। কৈফিয়ত দিতে হবে, কাজের এরকম গোলমেলে অবস্থা আর কতদিন চলবে? বাঘের পায়ের ছাপ দেখে ভয় পায়, এমন লোককে খয়ের ভাঙবার কাজে লাগিয়েছো কেন?

এই একটা মাসের কোন রাতের কোন মুহূর্তে ঘুঙুরের শব্দ শুনতে পায়নি রামতনু। তবু মনের ভিতরে প্রশ্নটা যেন একটা তেষ্টার মতো ছটফট করে, সত্যি ওটা কার ঘুঙুরের শব্দ?

রামতনুকে দেখতে পেয়েই চেঁচিয়ে ডাক দিল জীবনলাল—একবার এসে শুনে যাও ভাই রামতনু। অনেক খবর আছে, ভাল ভাল খবর।

—বলুন, কী খবর।

—প্রথম খবর, মালতী কবিতা করে একটা চিঠিতে লিখেছে: শীতের এই দুটি মাস ফুরিয়ে গেলেই তো বসন্ত। সেই বসন্তেরই একটি দিনে চামেলী লতায় নতুন ফুল ফুটবে, অলি উড়বে আর কোকিলও ডাকবে।

—ভাল কবিতা।

—কিন্তু কবিতার মানেটা বুঝতে পেরেছো কি? পারনি। মানে হলো আর দুটি মাস পরে ফালগুন মাসের কোন একটি দিনে মালতীর সঙ্গে আমার বিয়ে হবে!

—ভাল, খুব ভাল।

—কে জানে কেমন করে আমার আর মালতীর ভালবাসার কথা জানতে পেরেছেন খুড়ো। তাই মালতীর বাবাকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছেন, বিয়েটা আসছে ফাল্গুনেই হয়ে যাক, আর দেরি করবার কোন মানে হয় না। আমাকেও চিঠি লিখেছেন খুড়ো: আর ওই জঙ্গলের মধ্যে পড়ে থাকবার দরকার নেই। আঃ কী যে আনন্দ বোধ করছি; রামতনু! বলে বোঝাতে পারবো না! আগের জন্মে অনেক পুণ্যি করেছিলাম বলে এই জন্মে মালতীর ভালবাসা পেয়েছি।

জীবনলালের ঘরের দরজার বাইরে পথের উপর একটা আগন্তুক সাইকেলের ঘণ্টির শব্দ বেজে উঠেছে। দেখতে পায় রামতনু, সার্কেল অফিসার জগদীশবাবু আসছেন। খাতাপত্র হাতে নিয়ে একজন দফাদার তাঁর সাইকেলের পিছু ধরে দৌড়ে দৌড়ে আসছে।

ঘরে ঢুকলেন আর চেঁচিয়ে হেসে উঠলেন জগদীশবাবু—মিঠাই খাওয়া জীবনলাল, আমি তোমার জীবনের নতুন খবর শুনেছি।

রামতনু হঠাৎ বলে ওঠে।—শুনেছি স্যার, আপনি নাকি জঙ্গলের ভিতরে এক ঘুঙুরের ছুটোছুটির শব্দ শুনেছেন?

জগদীশবাবু—হ্যাঁ শুনেছিলাম। আপনিও শুনেছেন নাকি?

রামতনু—হ্যাঁ।

—কবে?

—এক মাস আগে।

—তাই বলুন। আর কখনও শুনতে পাবেন না। সব ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছে। এই একটা মাস এই নিয়েই তো ব্যস্ত ছিলাম।

—ওটা কার ঘুঙুরের শব্দ স্যার?

—জানেন না? শোনেননি কিছু?

—না।

—ওটা একটা বাঘিনীর গলায় বাঁধা ঘুঙুর।

চেঁচিয়ে হেসে ওঠে জীবনলাল—এখন বুঝলে তো রামতনু? কোন দেবীর ঘুঙুর নয়, কোন মানবীর ঘুঙুরও নয়, একটা ··যাকে বলে, একটা পাশবীর ঘুঙুর।

সার্কেল অফিসারও হাসেন, কিন্তু অন্য রকমের হাসি।—পাশবী বলুন আর যাই বলুন, এই বাঘিনী কিন্তু বেশ জমিয়ে প্রেম করতে জানে। এই জঙ্গলেরই একটা বাঘের সঙ্গে প্রেম জমিয়ে তুলেছে বাঘিনীটা।

—কী যে বলেন জগদীশবাবু! আবার হেসে ওঠে জীবনলাল।—এসব ভাং-খাওয়া গল্পের কথা আপনিও বিশ্বাস করেন দেখছি, কী আশ্চর্য।

জগদীশবাবু—না হে, না। আমি সব জানি বলেই বলছি। বাঘিনী ডায়েনার গলার ওই ঘুঙুরের শব্দটাকে একজন অভিসারিকার নূপুরের শব্দ বলে মনে করলে একটুও ভুল করা হয় না।

রামতনু—ডায়েনা?

জগদীশবাবু—হ্যাঁ, বাঘিনীটার নাম ডায়েনা। কেন, তুমি কি ডায়েনার কথা কখনও শোননি?

—না।

—তুমি আমাদের এই চাতরার এস-ডি-ও মিস্টার প্রাইসের নাম শুনেছ কি?

—শুনেছি।

—চাতরা বাজার আর থানা থেকে প্রায় এক মাইল দূরে জঙ্গলের গা-ঘেঁষে একটা টিলার উপর এস-ডি-ও'র চমৎকার বাংলোটাকে কখনও দেখেছো কি?

—না।

—তাই বল, সেই বাংলোর দিকে তাকালেই দেখতে পেতে, প্রাইস সাহেবের পোষা বাঘিনী ডায়েনা বারান্দার কার্পেটের উপর শুয়ে রয়েছে। পোষা কুকুরের চেয়েও বেশী পোষমানা একটা রয়্যাল টাইগ্রেস। ডায়েনা এই জঙ্গলেরই বাঘ-বাঘিনীর মেয়ে। মাত্র এক মাস বয়সের একটা বাচ্চা বাঘিনীকে একদিন জঙ্গলের একটা মহুয়ার ছায়াতে ঘাসের উপর পড়ে থাকতে দেখেছিল প্রাইস সাহেবের ঘোড়ার

ঘাস-কাটা সহিস। বাচ্চা বাঘিনীকে কুড়িয়ে নিয়ে এসে একেবারে সহেবের কোলের উপর বসিয়ে দিয়েছিল। সেই বাচ্চা বাঘিনীটাই হলো আজকের যুবতী-বাঘিনী ডায়েনা। আমি নিজের চোখে দেখেছি আয়ার আঁচল টেনে, মালীর মাথা শুঁকে দুষ্টুমির খেলা খেলছে ডায়েনা। লনের উপর রঙীন বলের সঙ্গে হুটোপুটি করছে। সাহেবের কুকুর, একটা এইটুকু ভুটিয়া ল্যাপডগ সাহেবের কাঁধের উপর বসে ধমক ছাড়ছে। ধমক শুনেই পালিয়ে গেল ডায়েনা, দৌড়ে গিয়ে আস্তাবলের ভিতরে ঘোড়াটার পিছনে লুকিয়ে রইল।

রামতনুর মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলেন সার্কেল অফিসার জগদীশবাবু।—এই বাঙালীবাবুর বয়স খুব কম। তাই বলতে একটু লজ্জাবোধ করছি, কিন্তু বলেই ফেলি।

জীবনলাল—বলুন বলুন! উনি একজন ঝানু তসীলদার, বয়স কম হলেও লজ্জা-টজ্জা হজম করতে জানেন।

জগদীশবাবু—একদিন মাঝ রাতে হঠাৎ একটা শব্দ শুনে সাহেবের ঘুম ভেঙে গেল। কিচেনের পিছনে একটা খোলা জায়গাতে চাতালের উপর ডায়েনার স্নানের জন্য তৈরী করা যে প্রকান্ড টবটা থাকে, সেটাকে কে যেন একটা ধাক্কা দিয়েছে। টর্চের আলো ফেলে দেখতে পেলেন সাহেব, টবের কাছে ডায়েনা বসে আছে। পর মুহূর্তে বুঝলেন, না না, ডায়েনা কেন হবে? ডায়েনা ওই তো পাশের ঘরের কার্পেটের উপর বসে রয়েছে আর ছটফট করছে। ওটা অন্য একটা বাঘ। বাঘের পিঠের মাঝখানে মস্ত বড় একটা কাটা-দাগ।

আবার টর্চের আলো ফেলতেই আগন্তুক বাঘটা লাফ দিয়ে সরে গেল। এক মুহূর্তের মধ্যে উধাও হয়ে গেল। কিন্তু সাহেব আর ঘুমোতে পারলেন না। রাত জেগে অনেক কথা ভাবলেন। ডায়েনাও উঠে এসে সাহেবের পায়ের কাছে চুপ করে বসে রইল। ডায়েনার চোখেও ঘুম নেই। সাহেব বার বার ডায়েনার পিঠে মাথায় ও গলায় হাত বোলালেন।

পর দিন রাতটা একটু ঘনিয়ে উঠতে ফালি চাঁদের ফিকে জ্যোৎস্নাটা যখন একটু নিবিড় হয়ে উঠলো, তখন বাংলোর পিছনের ফটকটা খুলে দিলেন মিস্টার প্রাইস। ডায়েনার গলাতে একটা ঘুঙুর বেঁধে দিলেন। মুহূর্তের মধ্যে সামনের খেজুর জঙ্গলের ভিতরে ঢুকে অদৃশ্য হয়ে গেল ডায়েনা। পিঠ-কাটা বাঘটার সঙ্গে খেলা করে ফিরে আসুক ডায়েনা।

রামতনু—গলায় ঘুঙুর বেঁধে দিলেন কেন?

জগদীশবাবু—চেনবার জন্যে। ঘুঙুরের শব্দ শুনলেই বুঝতে হবে, মাঝে রাতের জঙ্গলে ছুটোছুটি করবার পর শেষ রাতে সত্যি ডায়েনাই ফিরে এসেছে, অন্য কোন বাঘ নয়। যদি ডায়েনার সঙ্গী হয়ে কোন বাঘ এসে পড়ে, তবে তাকেও চিনতে পারা যাবে। কানেস্তরা বাজিয়ে আওয়াজ করবে খানসামা, বাঘটাও পালিয়ে যাবে।

যাক, সেসব ব্যাপার তো চুকেই গিয়েছে। জঙ্গলের ভিতরে ডায়েনার ঘুঙুর আর কোনদিনও বাজবে না। ডায়েনাকে লণ্ডনের জু'তে চলে যেতে হবে। আমিই ডেপুটি কমিশনারের কাছে বেনামে একটা কমপ্লেনের চিঠি পাঠিয়েছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে স্টেপ নিয়েছেন ডি সি।

হেসে ফেলেন সার্কেল অফিসার জগদীশবাবু। —কমপ্লেনের সত্য-মিথ্যা তদন্ত করে রিপোর্ট করবার ভার আমাকেই দিলেন ডেপুটি কমিশনার, জবরদস্ত আই সি এস মিস্টার ব্লেয়ার। বাঘের সায়েন্স তাঁর খুবই ভাল জানা আছে। যা-হোক, তদন্ত করবার ভার পেয়েছিলাম বলেই তো প্রাইস সাহেবকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করবার চান্স পেয়েছিলাম। সাহেবও ডায়েনার পুরো হিস্ট্রি আমাকে শুনিয়েছিলেন। রিপোর্টে আমি সাহেবের উপর কোন দোষ চাপাইনি। সাহেব নিজে নয়, সাহেবের দুই ছোকরা ছেলে স্কুলের ছুটিতে সিমলা থেকে এখানে আসবার পর পনেরো দিনের মধ্যে তিনটে বাঘকে শিকার করেছে। শিকার তো নয়, মার্ডার। এত সহজে কেউ একটা ফড়িংকেও মারতে পারে না। রাত্রিবেলা খেজুর জঙ্গলের ভিতরে মাচান করে বসে থাকতো দুই ছোকরা, গলার ঘুঙুর বাজিয়ে ডায়েনা ভিতর-জঙ্গল থেকে ছুটে এসে বাংলোর দিকে চলে যেতেই দেখা যেতো, একটা নিরেট কালো-ছায়ার পিণ্ড ছুটে এসেছে, তার মানে একটা বোকা বাঘ ছুটে এসে আর লাফালাফি করে যেন ডায়েনার ঘুঙুরের শব্দটাকে খুঁজছে। বুঝতে পারছো তো, রামতনু? কেন কিসের লোভে এক-একটা নতুন বাঘ উতলা হয়ে ডায়েনার পিছনে ছুটে আসতো?

জীবনলাল—হ্যাঁ হ্যাঁ, সবই বুঝেছি, আমি ওকে এই দু'মাসে মধ্যে অনেক কিছু বুঝিয়ে পাকা ক'রে দিয়েছি।

সার্কেল অফিসার জগদীশবাবুর দুই চোখের দৃষ্টিটা হঠাৎ রাগ করে আর দপ্ করে জ্বলে ওঠে। —এই রকম তিনটে বোকা বাঘকে গুলি করে মেরেছে ওই দুটো চ্যাংড়া ছোকরা। আমি আগে জানতে পেলে ওদের হাত দুটোকে ভেঙে দিয়ে ওদের বন্দুকের সুড়সুড়ির সুখ ভেঙে দিতাম। যা-ই হোক, প্রাইস সাহেবের কাছে ডেপুটি কমিশনার ব্লেয়ার সাহেবের কড়া ধমকের একটা চিঠি এসে পৌঁছতেই দুই ছোকরা আবার সিমলাতে পালিয়েছে। আর, প্রাইস সাহেবও ভয় পেয়েছেন। ডেপুটি কমিশনারের অর্ডার ঃ পোষা বাঘিনীকে ঘুঙুর পরিয়ে জঙ্গলে ছেড়ে দেবার খেলা বন্ধ করুন। আর, যত তাড়াতাড়ি পারেন, পোষা বাঘিনীকে লণ্ডনের জু'তে পাঠিয়ে দিন। তিন মাস সময় দিলাম?

জোরে একটা হাঁফ ছেড়ে দিয়ে সার্কেল অফিসার জগদীশবাবু আবার হাসতে থাকেন। মৃদু মৃদু মিষ্টি হাসি।—ভাল কথা, বেশ মজার কথাও বটে, ডায়েনার পীরিতের বাঘটা ওই বজ্জাত ছোকরা দুটোর বন্দুকের গুলির মার থেকে বেঁচে গেছে। কে জানে কেন, ওই পিঠকাটা বাঘটা কোন রাতে ওদের মাচানের ছায়ার ধারে-কাছেও আসেনি। কে জানে, হয়তো ঘুঙুরওয়ালী ডায়েনাই ওকে বুঝিয়ে-

সুঝিয়ে সাবধান করে দিয়েছিল।

জীবনলাল মুখ বেঁকিয়ে হেসে ওঠে। —আহা! উনি তো বাঘিনী নন, উনি একটি লায়লা, একটি শকুন্তলা, নয়তো একটি সাবিত্রী, প্রিয়তম পতির প্রাণ বাঁচাবার আর্ট জানেন।

জগদীশবাবু হাসেন।—না, তা নয়। আমি তা বলছিও না। কিন্তু হতেও তো পারে। ট্রুথ ইজ··কী যেন লাইনটার বাকি কথাগুলি? রামতনু নিশ্চয় বলতে পারবে।

রামতনু—স্ট্রেঞ্জার দ্যান ফিকশন!

জগদীশবাবু—বাস্ বাস্, ভাই জীবনলাল শুনে রাখুন। আমি এ নিয়ে আর তর্কাতর্কি করতে চাই না।

রামতনু—আমার একটা কথা ছিল।

জগদীশবাবু—বলুন।

—আমার খয়েরের কাজ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। খয়ের গাছ ভাঙবার জন্য লোকজন যারা জঙ্গলের ভিতরে ছিল, তারা সবাই পালিয়ে এসেছে।

—কেন?

—ওদের ছাউনির কাছে বাঘের পায়ের অনেক ছাপ ওরা দেখতে পেয়ে ভয় পেয়েছে।

—বলতে পারেন, ছাপগুলি কি সবই একই বাঘের পায়ের?

—সর্দার সিয়ারাম বলছে, দুটো বাঘের পায়ের ছাপ।

দুই চোখ অপলক করে কী যেন ভাবলেন সার্কেল অফিসার জগদীশবাবু। তারপর বিড় বিড় করে কথা বলেন তাঁর গলার স্বর আর কথা বলবার শক্ত ভঙ্গীটা বেশ ঢিলে হয়ে গিয়েছে।—বুঝেছি। মিস্টার প্রাইস আবার একটা চালাকী চেলেছেন। ডায়েনার গলার ঘুঙুর খুলে নিয়ে ডায়েনাকে রাতের জঙ্গলে ছেড়ে দিচ্ছেন। ডায়েনা ওর পীরিতের সেই পিঠকাটা বাঘটার সঙ্গে খেলা করে আবার চলে যায়। যাক, আমি আর এ নিয়ে কোন কমপ্লেন করবো না। প্রাইস সাহেবকেও কিছু বলবো না।···কিন্তু আর, কটাই বা দিন বাকি? ডায়েনা লণ্ডন জু'তে চলে গেলেই পিঠ-কাটা বাঘটা আর জঙ্গলের এই তল্লাটে আসবে না, অন্য জঙ্গলের অন্য তল্লাটে চলে যাবে। আর দশ-বারোটা দিন ধৈর্য ধরে থাক, রামতনু। খয়েরের কাজ আবার চালু করতে পারবে।

॥ চার ॥

সারা সকাল ধরে বৃষ্টি ঝরছে। ঝুমরাটির জঙ্গল ভিজে গিয়ে অদ্ভুত রকমের একটা চবচবে শোভা ধরেছে। সর্দার সিয়ারামকে সঙ্গে নিয়ে আর ভিতর-জঙ্গলে ঢুকে

একবার দেখে এসেছে রামতনু, ছাউনির কাছ আর কাছের চারদিকে বাঘের পায়ের সব ছাপ মুছে গিয়েছে। সাতদিন পার হবার পর আবার দেখে এসেছে, ছাউনির কাছের চারদিকের এখানে-ওখানে কোথাও নতুন করে বাঘের পায়ের ছাপ পড়েনি। প্রাইস সাহেবের পোষা বাঘিনী ডায়েনা নিশ্চয় খাঁচাবন্দী হয়ে লণ্ডনের জুতে চলে গিয়েছে।

চাতরা বাজারের খয়ের-কেনা মহাজন হরিরাম সাহু এসে বললেন—হ্যাঁ, বাঘিনীটাকে বিলাতে চালান করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কট্টর মেজাজের প্রাইস সাহেব কি বাঘিনীটাকে বিলাতের চিড়িয়াখানাতে পাঠিয়ে দিতে সহজে রাজি হয়েছেন? না সহজে রাজি হননি। হাজারিবাগ থেকে ডেপুটি কমিশনার নিজে ছুটে এসে অনেক ধমক-ধামক করেছেন, তবে রাজি হয়েছেন। খুব বাজে একটা ছুতো ধরেছিলেন প্রাইস সাহেব। তাঁর ইচ্ছে, জঙ্গলের বাঘিনীকে জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হোক। চিড়িয়াখানাতে পাঠালে ভুল করা হবে?

গর্জে উঠেছেন ডেপুটি কমিশনার—কেন? কী ভুল হবে?

প্রাইস সাহেব বললেন—মেলামেশা করবার মতো সঙ্গী পাবে না এই বাঘিনী। কিন্তু এখানে এই জঙ্গলের ভিতরে ভাল সঙ্গী পাবে। এই জঙ্গলের একটা বাঘের সঙ্গে ওর খুব ভাল ভাব-সাব হয়েও গিয়েছে। কাজেই আপনার কাছে আমার অনুরোধ …।

আবার রেগে গিয়ে কড়কড় স্বরে চেঁচিয়ে উঠলেন ডেপুটি কমিশনার সাহেব। থামুন; আপনি বোধহয় জানেন না যে, আমি জুলজির ফার্স্ট ক্লাস এম-এ। আমার কাছে এসব বাজে গল্প, মিথ্যে গল্প, একটা অজুহাতের গল্প বলবেন না।

প্রাইস সাহেব—না, একটুও মিথ্যে গল্প নয়।

—মিথ্যে গল্প তো বটেই তা ছাড়া এটা একটা বিপদের গল্প। আপনার পোষা বাঘিনী ছাড়া পেয়ে জঙ্গলে গেলেও মাঝে মাঝে নিশ্চয়ই বাজার বস্তি ও গাঁয়ের আনাচে-কানাচে ঢুকে পড়বে। ওর সঙ্গে অন্য বাঘও আসবে। গরু মোষ ও মানুষকে মারবে। বলুন, ভুল বলছি?

—ঠিক বুঝতে পারছি না। কিন্তু ওর একটা স্বাভাবিক ইচ্ছার ব্যাপারও তো আছে সঙ্গী না পেলে…।

—লণ্ডনের জুতে অনেক ভাল সঙ্গী পাবে আপনার পোষা এই বাঘিনী। ঝুমরাটি জঙ্গলের বাঘের চেয়ে অনেক স্বাস্থ্যবান ভাল জাতের বাঘ।

—হোক ভাল-জাতের বাঘ, তবু তাকে পছন্দ করতে কিংবা মেনে নিতে পারবে না ডায়েনা।

হেসে ফেললেন ডেপুটি কমিশনার।—আপনি বড়ই সরল মনের মানুষ, মিস্টার প্রাইস। ভুল, খুব ভুল ধারণা মনের মধ্যে পুষে রেখে আপনি মিথ্যে সন্দেহের দুঃখ ভোগ করছেন। আমি জোর করে বলছি, এই ডায়েনাকে লণ্ডন জুতে

পাঠিয়ে দেবার পর চারটে মাস পার হতেই আপনি খবর পাবেন, ডায়েনার চমৎকার একজোড়া বাচ্চা হয়েছে।

মহাজন হরিরাম সাহু হেসে ওঠে।—পাগলা প্রাইস সাহেব এর পর আর কোন কথা বলেননি। ছুতোর ডাকিয়ে খাঁচা তৈরী করিয়েছেন। আর গাঙ্গুলী ট্রান্সপোর্ট কোম্পানীর মোটর লরি এসে খাঁচাবন্দী বাঘিনীটাকে বিলাতী জাহাজের কলকাতা অফিসে পৌঁছে দিয়েছে। কিন্তু আমার মাল কই খয়েরবাবু? পাঠাতে আর কত দেরি করবেন?

রামতনু—না, আর দেরি হবে না।

রামতনুর কাজের জীবনটা আবার ব্যস্ত হয়ে ওঠে। সর্দার সিয়ারাম আবার কাজের লোক যোগাড় করে আনে। পুরো দমে খয়ের ভাঙবার কাজ চলতে থাকে। ধকধকে আগুনে ভরা চিতের মতো বড়-বড় উনুনের উপর চাপানো বড়-বড় কড়াইয়ের মধ্যে খয়েরের ডালপালা আর ছাল-বাকলের ক্বাথ ঘন রক্তের ক্ষীরের মতো চেহারা নিয়ে টগবগ করে। এইসব কাটা-ছাঁটা ও ভাঙ্গা খয়ের গাছ আবার পাতা ধরবে, ফুল ফুটবে, ফিকে হলুদ রঙের হাজার হাজার ফুল। কিন্তু বাঘিনী ডায়েনা তার বন্ধু বাঘের সঙ্গে খেলা করতে এখানে আর আসবে না।

প্রায় রোজই বস্তাবন্দী খয়ের গো-গাড়িতে বোঝাই হয়ে চাতরা বাজারে যায়। ওজন করা, চালান লেখা আর হিসেব করার কাজ শেষ করতে সন্ধ্যা হয়ে যায়। তখন কিছুক্ষণ ঝুমরাটির ঘন জঙ্গলের দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে থাকা রামতনুর একটা অভ্যাস হয়ে উঠেছে। নিরেট অন্ধকার হোক কিংবা নিবিড় কুয়াশা হোক, অথবা ঘোলাটে জ্যোৎস্না হোক, দেখে মনে হয় জঙ্গলের গাছগুলি যেন ডায়েনার কথা ভাবছে।

একটি মাস এইভাবে ফুরিয়ে যাবার পর ঠাকুর সাহেবের চিঠি পেল রামতনু—খুব ভাল কাজ হয়েছে, রামতনু। আমি খুব খুশী হয়েছি। হরিরামের হুণ্ডি পেয়েছি। খয়েরের কাজে এতটা লাভ কোন বছরেও আমি পাইনি। কিন্তু আরও দুটো মাস তোমাকে ঝুমুরাটিতে থাকতে হবে। সাবাই ঘাসের চালানী কাজটাও তুমিই সেরে দিয়ে তারপর আবার ভেলাডিতে ফিরে গিয়ে তসীল শুরু করবে।

জীবনলাল রোজই ডাকাডাকি করে তাই মাঝে মাঝে যেতে হয়। গিয়ে দেখতে হয়, মালতীর চিঠি হাতে নিয়ে গুনগুন করে গান গাইছে জীবনলাল। গান গাইবারই কথা। এই তো এই মাঘ মাসের আর দশটা দিন ফুরোলেই ফাল্গুন এসে পড়বে। দিন গুনছে জীবনলাল। কোকিল ডাকা একটি সন্ধ্যায় মালতীর সঙ্গে জীবনলালের বিয়ে হয়ে যাবে। জীবনলাল বলে—একটা আশ্চর্য ব্যাপার হয়েছে রামতনু। আমি স্বপ্ন দেখলাম, মালতী আমার বুকে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। আর এই দেখ, আজই মালতীর এই চিঠিটা পেয়েছি। মালতী লিখছে: আমিই তো তোমার বুকের ব্যথার ওষুধ। কিন্তু আমার বিশ্বাস, এস ডি ও প্রাইস সাহেবেরও ভাং-খাওয়ার অভ্যাস আছে।

রামতনু—এ আবার কী রকমের কথা ?

জীবনলাল—খুব সত্যি রকমের কথা। তুমি তো জান না, ডেপুটি কমিশনার রেয়ার সাহেবকে কীরকম একটা অদ্ভুত বাজে-কথা বলেছেন প্রাইস সাহেব। বলেছেন, তার পোষা বাঘিনী ডায়েনা লণ্ডন জু-এর কোন বাঘকে পছন্দ করবে না। কিন্তু খোঁজ নিলে তিনি জানতে পারবেন, ডায়েনা এখন খুব খোশমেজাজে লণ্ডন জু'এর খাঁচার ভিতরে একটা নতুন সঙ্গী বাঘের গা চাটছে। পশুর স্বভাব যাবে কোথায় ?

॥ পাঁচ ॥

সাবাই ঘাসের চালানী কাজে প্রায় একটা মাস খুব ব্যস্ত থাকতে হয়েছে। রোজ যেমন আজও তেমনি, সারা সকালটা সাবাই ঘাসের গাঁট বাঁধার কাজ করেছে। সারাটা দুপুর ধরে গাঁট ওজন করার কাজ হয়েছে, আর বিকেল হতেই হিসেব লেখার কাজও শেষ হয়েছে। রোজ যেমন আজও তেমনি, কাজের মধ্যেই এক ফাঁকে স্নান করে মকাইয়ের খিচুড়ি খেয়ে নিয়েছে রামতনু।

শুনে চমকে ওঠে রামতনু, কোকিল ডাকছে। কাছারি ঘরের পিছনে পলাশের পাতার আড়ালে লুকিয়ে কোকিলটা ডাকছে। ফোটা ফুলের শোভায় লাল হয়ে গিয়েছে বিকেলের ঝলমলে রোদ। তাই তো, জীবনলালের স্বপ্নের ফাল্গুন মাসটা এতদিনে এসে পড়েছে। আজ ফাল্গুনের ক' তারিখ? সত্যিই তো এই সাত-আটটা দিন জীবনলালের কোন হাকডাক শুনতে পায়নি রামতনু। জীবনলাল কি তবে চলেই গিয়েছে ?

সর্দার সিয়ারাম বলে—আপনি তো এখানে দাঁড়িয়ে আর খুব খুশী হয়ে কোকিলের ডাক শুনছেন। কিন্তু আজই ভোরবেলা ওই টিলার উপর দাঁড়িয়ে আমি কী শুনেছি আর কী দেখছি শুনবেন ?

—বল।

—একটা ময়ূরের ডাক শুনেছি। ময়ূরটা ডেকে ডেকে গাছের মাথায় মাথায় বসছে উড়ছে আর চলে যাচ্ছে। ওই ওদিক থেকে, চাতরার খেজুর জঙ্গলের গা-ঘেঁষা কেঁদ-তেঁতুলের ঠাসা জঙ্গলটার দিক থেকে ময়ূরটা উড়ে উড়ে এদিকে এল আর ওই শিবুয়া পাহাড়ের বাঁশজঙ্গলের দিকে চলে গেল।

রামতনু—তাতে কী হয়েছে।

—আবার বাঘ এসেছে। নীচে বাঘ হাঁটছে তাই উপরে উড়ে উড়ে বাঘের টহল ধরা পড়িয়ে দিচ্ছে ময়ূরটা। খুব হুঁশিয়ার বাবু; সন্ধ্যে হলেই ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ করে দেবেন।

সিয়ারামের চিন্তিত ও ভীরু মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলেও রামতনুর মনের

মধ্যে কোন ভয় ছমছম করে না, একটা আশ্চর্যের সন্দেহ ছমছম করে। এটা কোন্ বাঘ? কেমন বাঘ? ডায়েনার বন্ধু সেই পিঠকাটা বাঘটা নয় তো?

কিন্তু কোকিলটা হঠাৎ ডাক বন্ধ করে দিল কেন! কোকিলটা আছে, না উড়ে চলে গিয়েছে? পলাশের মাথার দিকে তাকবার আগেই রামতনুর চোখে পড়ে, সারা আকাশ কালো মেঘে ভরে গিয়েছে। বিকেলের ঝলমলে রোদটাকে কেউ যেন এক মুহূর্তে শুষে নিয়েছে। মজার ব্যাপার! একটা ধূর্ত চাতকই বুঝি কোকিলের স্বর নকল করে এতক্ষণ ডাকছিল। না আর দেরি করা উচিত নয়। এখনই একবার দেখে আসা উচিত, জীবনলাল আছে, না চলে গিয়েছে।

ভয়ানক ঝড় আসছে, প্রায় এসেই পড়েছে। জীবনলালের কেবিন-ঘরের দেয়ালের রঙীন আলপনার উপর গিরগিটির ভিড় পেট ফুলিয়ে কাঁপছে চালার উপর কাঠ-বিড়ালীর দল ছটফট করে এদিক-ওদিক দৌড়াদৌড়ি করছে।

জীবনলালের ঘরে ঢুকতে গিয়েই থমকে দাঁড়ায় রামতনু। সাইকেল চালিয়ে আর খুব জোরে ঘণ্টি বাজিয়ে সার্কেল অফিসার জগদীশবাবু আসছেন। চেঁচিয়ে ডাকছেন—ও রামতনু, ও খয়েরবাবু রামতনু। ফাল্গুন মাসের আকাশে তুমি এরকম একটা ভয়ানক ঝড় ছাড়লে কেন?

সাইকেল থেকে নেমেই হাঁপ ছাড়েন জগদীশবাবু। —আঃ নিশ্চিন্ত হলাম। যাচ্ছিলাম পিটারপুরা, কিন্তু যাওয়া হলো না। আকাশের অবস্থা দেখে ঘাবড়ে গিয়েছি। মনে হচ্ছে, আজকের রাতটা তোমাদের এখানেই পার করতে হবে।

রামতনু আর জগদীশবাবু দুজনে একসঙ্গে ঘরের ভিতরে ঢুকতেই অদ্ভুত রকমের একটা খুব-খুশির স্বরে হেসে ওঠে জীবনলাল—আসুন আসুন।

মাথার বালিশটাকে বুকের উপর চেপে আর জড়িয়ে ধরে বিছানার উপর বসে আছে জীবনলাল। জগদীশবাবু ভ্রূকুটি করেন—কী ব্যাপার? বুকের ব্যথাটা বেড়েছে বুঝি?

জীবনলাল হাসে। —ছেড়ে দিন ওসব বাজে ব্যথা-ট্যাথার কথা। ওরকম হয়েই থাকে।

জগদীশবাবু—তোমাকে কতবার বলেছি, আজও আবার বলছি। চাতরার কবিরাজ সেনবাবুর কাছ থেকে ওষুধ আনিয়ে খাও।

জীবনলাল খবর বলুন।

—হ্যাঁ, অনেক খবর আছে। যেমন দুঃখের খবর, তেমনই বেশ মজারও খবর। প্রথম খবর হলো আমার বদলির অর্ডার এসেছে। আর এক মাস পরে গুমিয়া সার্কেলে চলে যাব। দ্বিতীয় খবর, এস-ডি-ও প্রাইস সাহেব কেঁদে ফেলেছেন।

চমকে ওঠে রামতনু—কেন? কেন?

—আজই সকালবেলা নতুন খাস জঙ্গলের একটা ম্যাপ নিয়ে সাহেবের কাছে পৌঁছে দিতে গিয়েছিলাম। গিয়েই দেখি, একটা চিঠি হাতে নিয়ে বারান্দার উপর

একটা চেয়ারে একেবারে স্তব্ধ হয়ে বসে আছেন সাহেব। আমাকে দেখেই চেঁচিয়ে উঠলেন সাহেব, যেন রাগ দিয়ে চাপা একটা দুঃখের চিৎকার।—এই চিঠিটা পরশুদিন এসেছে। লণ্ডনের চিঠি। লণ্ডন জু-এর অফিস থেকে লেখা খুব ভাল একটা খবরের চিঠি। ডায়েনা মরেছে।

বাইরে প্রবল ঝড় আর বৃষ্টির শব্দ, তার সঙ্গে তোলপাড় ঝুমঝাটি জঙ্গলের শব্দ যেন ধাক্কা দিয়ে ঘরের ভিতরে জগদীশবাবুর গলার স্বর মিইয়ে দিয়েছে। জগদীশবাবু বলেন ঃ লণ্ডন জু'-এর খাঁচার ভিতরে ঢুকেই পোষা বাঘিনী ডায়েনার শান্ত স্বভাবটা একেবারে ক্ষেপে গিয়ে বন্য বাঘিনীর মতো দুরন্ত হয়ে উঠেছিল। দিনরাত শুধু গর্জন করে আর লাফ-ঝাঁপ করে খাঁচার গরাদ ভেঙ্গে ফেলবার চেষ্টা করেছে, ডায়েনা। ডায়েনাকে শান্ত করবার জন্যে যে বাঘটাকে একই খাঁচাতে ঢুকিয়ে ডায়েনার সঙ্গী করা হয়েছিল, সেই বাঘটাকে একটা মুহূর্তও সহ্য করতে পারেনি ডায়েনা। বাঘটাকে কাছে দেখতে পেয়েই বাঘের টুঁটি কামড়ে ধরেছে, পুরো দুটিঘণ্টা বাঘের সঙ্গে মারামারি করে আর ভয়ানক ঘায়েল হয়ে ডায়েনা শেষে নিজেই মরেছে। প্রাইস সাহেব বললেন ঃ আই সি এস ব্লেয়ারকে আমি এবার জিজ্ঞেস করবো, কী হে জুলজির ফাস্ট ক্লাস এম্‌. এ. বল এবার কার কথা সত্য হলো?

জীবনলাল বলে—আমি ব্লেয়ারকে জিজ্ঞেস করলে অন্য কথা বলতাম?

জগদীশবাবু—কী বলতেন?

জীবনলাল—আমি বলতুম কী হে মানুষ ব্লেয়ার বল শুনি, তোমাদের মানুষীদের প্রাণ কি বাঘিনী ডায়েনার প্রাণের চেয়ে বড় রকমের কোন জিনিস?

জগদীশবাবু ও রামতনু দুজনে বেশ আশ্চর্য হয়ে জীবনলালের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। আজ এ কী কথা বলছে জীবনলাল?

জীবনলাল—আপনি যে বললেন, প্রাইস সাহেব কেঁদে ফেলেছেন? কেন কাঁদলেন, কখন কাঁদলেন সে-কথা তো বললেন না।

জগদীশবাবু—হ্যাঁ, বলছি। আজ আমারই সঙ্গে কথা বলতে বলতে কেঁদে ফেলেছেন। কাল শেষ রাতে একটা ঝনঝনে শব্দ শুনে জেগে উঠেই দেখতে পেলেন সাহেব, কিচেনের পিছনে চাতালটার উপর ডায়েনার শূন্য বাথটবের কাছে বসে আছে একটা বাঘ, সেই বাঘটা, যার পিঠের মাঝখানে একটা কাটা দাগ। বলতে বলতে রুমাল তুলে চোখ মুছলেন সাহেব। বললেন ঃ এর কথা ভাবতে গিয়ে আমার সব চেয়ে বেশী কষ্ট হচ্ছে জগদীশবাবু। পশু বেচারা তো জানে না যে, ডায়েনা মরেছে। মনে করেছে, টবটাকে ধাক্কা দিয়ে একটু শব্দ করলেই ওর অনেক দিনের সঙ্গিনী সেই ডায়েনা আবার ঘরের ভিতর থেকে ছুটে বের হয়ে আসবে। আমি ওই ঢাউস বাথটবটাকে তিন টুকরো করে ভেঙ্গে বাজারের মিস্তিরী ছবিরামের লোহা-লক্কাড়ের দোকানে পাঠিয়ে দিয়েছি। পিঠকাটা পশু বেচারাকে বুঝিয়ে দিতে

হবে তো, ডায়েনা এখানে আর নেই।

জীবনলাল চেঁচিয়ে ওঠে। —এরকম একটা ভুল কথা বলে ফেললেন কেন প্রাইস সাহেব? পশুবেচারা তো নির্বোধবেচারা নয়। আমার বিশ্বাস পিঠকাটা বাঘটা সবই জেনেছে, সবই বুঝেছে।

আবার আশ্চর্য হয়ে জীবনলালের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন জগদীশবাবু ও রামতনু। আজ এ কী কথা বলছে, জীবনলাল?

সন্ধ্যেটা পার হয়ে গিয়েছে অনেকক্ষণ আগে, তবু ঝড়বৃষ্টির কোন বিরাম নেই। ঝুমরাটি জঙ্গলের বুকের উপর ঘন অন্ধকারটাও যেন আছাড় খেয়ে হুটোপুটি করছে। গুমরে উঠছে জঙ্গলের ভয়ানক শব্দ।

গুমরে উঠলো আর একটা ভয়ানক শব্দ। বাঘের ডাক। বাঘের গর্জনের প্রতিধ্বনিটা ঝড়ের বাতাসে ছেঁড়া-ছেঁড়া হয়ে অন্ধকারের বুকের উপর গড়াচ্ছে।

জগদীশবাবু বলেন—পিঠকাটা বাঘটার ডাক। খুব সম্ভব অন্য জঙ্গলে চলে যাচ্ছে বাঘটা।

—কিন্তু আমি কোথায় যাই? কথাটা বলতে গিয়ে বালিশটাকে শক্ত করে বুকের উপর চেপে দিয়ে দুই চোখ বন্ধ করে জীবনলাল।

চমকে ওঠেন জগদীশবাবু। চমকে ওঠে রামতনু।—কেন? কী হলো? আজ হঠাৎ এ আবার কী রকম কথা বলছেন আপনি? আপনার তো এই ফাল্গুন মাসেই…।

হেসে ফেলে জীবনলাল—থামুন থামুন। এই ফাল্গুনেরই পাঁচ তারিখে মালতীর বিয়ে হয়ে গিয়েছে। মালতী এখন সাসারামের ছোকরা কলেক্টর অম্বিকা-প্রসাদের বউ।

জগদীশবাবু ভ্রূকুটি করে চেঁচিয়ে ওঠেন। —এ কী অদ্ভুত কথা; আপনার মালতী শেষে এরকম একটা বিশ্রী কাণ্ড করে বসলো কেন?

আবার হেসে ফেলে জীবনলাল—মালতী তো ডায়েনার মতো ঝুমরাটি জঙ্গলের একটা বাঘের মেয়ে নয়। মালতী হলো, শোনপুরের মানুষ রায়বাহাদুর নাগেশ্বরপ্রসাদের মেয়ে।

বড় ছাড়োয়া ও ছোট ছাড়োয়া, দুই নামে পরিচিত এই দুই জঙ্গল দুই ভিন্ন জমিদারের সম্পত্তি হলেও আসলে একই চেহারা ও একই স্বভাবের যত শাল সেগুন ঘোড়ানিম ডুমুর আর কাঁটা শিরীষের সমাবেশ। পার্থক্য শুধু এই যে, বড় ছাড়োয়ার জঙ্গলে দিনের বেলাতেও অন্ধকার। ছোট ছাড়োয়ার জঙ্গলের ভিতরে ওরকম ঠাসা আর জমাট অন্ধকার নয়, বেশ হালকা রকমের ছায়া-ছায়া অন্ধকার ছড়িয়ে থাকে। বেলে পাথর, লাল কাঁকর আর সিলিকা বালুর যত খোঁড়াখুঁড়ি কারবার ছোট ছাড়োয়ারই ছায়াছায়া অন্ধকারে মধ্যে প্রায় একশো লক্কড় গোগাড়ি নিয়ে আনাগোনা করে। এই সব লক্কড় গো গাড়ির চাকার শব্দ যেন করুণ রকমের একটা ক্যাঁচকেঁচে আর্তনাদ হয়ে সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত যাওয়া আসা করে। সন্ধ্যা ঘনিয়ে উঠবার অনেক আগেই ঠিকেদারের এই সব গোগাড়ি জঙ্গলের ছায়া-ছায়া অন্ধকারের ছোঁয়াচ থেকে সরে গিয়ে একেবারে এই এখানে এসে পৌঁছে যায়। এই জায়গাটা ছোট ছাড়োয়ার চৌহদ্দির ভিতরে জংলী পরিবেশের একটা অংশ বটে, কিন্তু জায়গার চেহারাটা বেশ নিরীহ রকমের, যেমনটি সেকেলে মুনিঋষিদের তপোবনের চেহারা ছিল। বলাই বাহুল্য যে ছোট ছাড়োয়ার জঙ্গলের এই তপোবন রকমের অংশটার কোন ঠাঁই কোন মুনিঋষিকে দেখতে পাওয়া যাবে না। যাদের দেখতে পাওয়া যাবে তারা হল ঠিকেদারের গোমস্তা বাবুদের তিন ঘর পরিবারের মানুষ, এবং শুধু একটি কাছারী ঘর, বদলি হয়ে ঠাকুরসাহেবদের জমিদারীর তসিলদার রামতনু এসে এখন যেখানে ঠাঁই নিয়েছে।

ছোট ছাড়োয়ার অনেক জায়গায় জঙ্গলের যেসব উঁইধরা শালের ভিড় কেটে চেঁছে সরষের আবাদ করা হয়েছে, সেগুলি সবই ঠাকুরসাহেবদের সম্পত্তি। তশীলদার রামতনুকে শুধু ছোট ছাড়োয়ার দশটা জংলী ডিহির মানুঝিদের কাছ থেকে খাজনা উসুল করবার কাজ নয়, সরষে খামারের সব কাজও দেখাশোনা করতে হয়। ঠিকেদারদের তিন গোমস্তা সারা সকাল দুপুরে ও বিকেল এখানেই জঙ্গলের সরু সড়কের আশেপাশে ঘোরাফেরা করে। নজর রাখেন, কোন লকড় গো-গাড়ি যেন মাল না দেখিয়ে আর চিট্ না নিয়ে চুপচাপ সরে পড়তে না পারে। সবাই সব সময় দুই কান সজাগ করে রাখেন, শুনতে চেষ্টা করেন, কোন গো-গাড়ির চাকার ক্যাঁচকেঁচে আর্তনাদ জোচ্চুরি করবার ফিকিরে হঠাৎ কাঠবিড়ালীর গলার শব্দের মত মিহি হয়ে যায় কিনা। সবারই মনে আছে, গত চৈত্রের কালবোশেখী ঝড়ের উথাল-পাথাল শব্দের সুযোগ নিয়ে সিলিকা বালুতে ভর্তি করে তিরিশটা গো-গাড়ি তাদের চাকার শব্দ ঢাকা দিতে আর সরে পড়তে পেরেছিল।

তিন ঠিকাদারের তিন গোমস্তার মধ্যে দুই গোমস্তাই হল বাঙালী। সেনবাব হরেনবাবু। তৃতীয়জন হলেন গোমস্তা বলদেববাবু লাতেহারে যাঁর তিন পুরুষে বাস। সব মাল এই লাতেহারের এক মিনারেল কোম্পানীর আড়তে গি জমা হয়।

দেখে খুশি হয়েছে রামতনু তিন গোমস্তাবাবুদের তিনটে ছোট ছোট কাঁচা বাড় তশীল কাছারীর ঠিক গা ঘেঁসে তিনটে অস্তিত্ব নয়। একটু দূরে দেড় বিঘে আ ক্ষেতের শেষ বেড়া পার হয়ে ওই তিন কাঁচাবাড়ির আঙিনা থেকে মাঝে-মাঝে বাচ্চ বাচ্চা ছেলেমেয়ের হল্লার শব্দ কানে এলেও সেটা দুঃসহ কোন অস্বস্তি ঘটাবা মত ব্যাপার নয়। ছোট ছাড়োয়া জঙ্গলের ভিতরে এই চারঘর মনুষ্য বসতির নাম ছোট ছাড়োয়া। আরও দেখে খুশি হয়েছে রামতনু এখানে তপোবনের মত হালক চেহারার জঙ্গলটা সব সময় যেন সুগন্ধময় নিঃশ্বাস ছাড়ছে। এবং মুনিঋষি না থাকু জঙ্গলের ভিতরের দীর্ঘ ও ঋজু চেহারার যেসব ইউক্যালিপটাস ছড়িয়ে আছে তার যেন দীর্ঘকায় ও সাদা-ফর্সা চেহারার যত মুনি-ঋষি। নিতান্ত অল্প ও মৃদ বাতাসেরই তাড়নায় বেঁকে গিয়ে আর হেলেদুলে এক একটা বাঁশের ঝাড় তা প্রতিবেশী ইউক্যালিপটাসের গায়ের উপর পড়ে যেভাবে পাতাগুলিকে রগড়ে দে তাতেই ইউক্যালিপটাসের মিঠে সুগন্ধ যেন উথলে ওঠে আর বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে প্রফেসার চারুবাবু বলেছিলেন, বিশ্বাস কর রামতনু, গাছকে যদি ভাল লাগে তবে কোন জঙ্গলের নির্জনতাকে সত্যিই আর নির্জন বলে মনে হবে না। মনে হবে নিতান্ত নিরেট কাঠের মোটামোটা গাছ নয়, কত শত খাঁটি বন্ধু যেন তোমাকে ভালবাসতে চায়, তোমার সঙ্গে কথা বলতে চায়। ঠিক, তাই তো মনে হয়। ছোট ছাড়োয়াতে বদলি হয়ে আসবার পর এই এক মাসের মধ্যে অন্তত পাঁচটা দিন রামতনুর মনের ভিতরে শান্ত ও শান্তিময় চিন্তার এই আবেশ যেন ইউক্যালিপটাসের সুগন্ধের আবেশে মিশে গিয়ে রামতনুকে বিহ্বল করে দিয়েছে। এমনও সন্দেহ করেছে রামতনু, এ বুঝি সেই চমৎকার আনন্দের আবেশ, উপনিষদে ও আরণ্যকে যার মহিমার কথা আছে।

সেদিন মনের মধ্যে এ ধরনের কোনো আবেশ তখন ছিল না। তখন সরষের ওজনের হিসেব লেখবার কাজে ব্যস্ত ছিল রামতনুর হাতের কলম আর মন। শুনতে পায় রামতনু ঘরের বাইরের দাওয়ার উপর উঠে কে-যেন ডাক দিয়েছে—তাঁসিলদারজী বাড়িতে আছেন?

হ্যাঁ, আছি। ঘরের ভিতর থেকে উঠে এসে বাইরের দাওয়াতে উঠতেই দেখতে পায় ও বুঝতে পারে রামতনু, নিতান্ত অচেনা কোন লোক নয়, এই লোকটিকে অনেকবার কাছারী বাড়ির সামনের পথ ধরে যাওয়া-আসা করতে দেখেছে রামতনু লোকটা ময়ূরের পালকের একটা বোঝা কাঁধের উপর তুলে নিয়ে প্রায়ই লাতেহার যায়।

রামতনু—কি ব্যাপার ?

লোকটা বলে—আমি গোমস্তা হরেনবাবুর একজন গার্ড সর্দার, জিতরাম।

রামতনু—বেশ তো।

জিতরাম—আপনাকে মাতাজী একবার ডেকেছেন, বলেছেন—

কে বলেছেন ? কি বলেছেন ?

জিতরাম—মাতাজী বললেন, একবার গিয়ে তশীলদারবাবুকে এই কথা বল যে, কাকীমা ডেকেছেন। যেন নিশ্চয়ই একবার আসে।

রামতনু—তিনি কোথায় থাকেন ?

জিতরাম—এই তো আদা ক্ষেতের ওদিকের প্রথম বাড়ি।

রামতনু—আচ্ছা একদিন যাব।

॥ দুই ॥

সন্ধ্যা হতেই হিসাব লেখার কাজ ছেড়ে ঘরের বাইরে এসে দাওয়াব উপর দাঁড়াতেই দেখতে পায় রামতনু ঝলমলে চাঁদের আলোতে আনন্দের নীরব আবেশের সুখে ছোট ছাড়োয়ার জঙ্গলের সব গাছ যেন হাসছে। জঙগলের সেই ছায়া ছায়া অন্ধকার যেন গলে গিয়ে আলো হয়ে গিয়েছে। কিন্তু ওকি! কিসের শব্দ ?

সত্যিই একটা শব্দ, এবং সে শব্দ শুনে রামতনু যেমন আশ্চর্য হয়, তেমনই চমকেও ওঠে। কাছারী বাড়ির আঙিনার ওপারে ইউক্যালিপটাসের গোড়ার কাছে একটা লতাঝোপের কাছে কে যেন কিংবা কি যেন দাঁড়িয়ে থেকে ছটফট করছে, আর পটপট করে লতা ছিঁড়ছে। হ্যাঁ, ওটা জংলী জাতের লতানে জবার একটা ঝোপ। রোজ সকালে অজস্র ফুলে ঝোপটাকে ছেয়ে থাকে। সত্যি আশ্চর্য হবার কথা, এই সন্ধ্যায় এই জঙগলের ভিতর ঢুকতে আর লতানে জবার ফুল ছিঁড়তে কোন্ চোরের ইচ্ছে হবে কিংবা সাহস হবে ?

ছোট ছাড়োয়ার এই তশীল কাছারীতে যথারীতি একজন ভাণ্ডারী থাকেন। সারা দিনে ও রাতে পাঁচবার জপ করেন, প্রত্যেকটি প্রায় এক ঘণ্টার জপ। বেশ শান্তশিষ্ট ও নিষ্ঠাচারী মানুষটি। প্রৌঢ় প্রবীণ এই ভাণ্ডারীজী, বাবু গিরিধর পাঠক।

—আরে ওটা কি ? কে এখানে ঝোপের লতা টানাটানি করে ছিঁড়ছে ? কথা বলতে গিয়ে রামতনুর গলার স্বরে দুরন্ত বিস্ময়টা যেন চেঁচিয়ে ওঠে।

জপ থামিয়ে ও জপের থলি হাতে নিয়ে ভাণ্ডারী পাঠকজী দাওয়ার প্রান্তের এক কোণ থেকে উঠে আসেন আর হাসতে থাকেন। আপনি বোধহয় খুব আশ্চর্য হয়েছেন, তশীলদারজী।

রামতনু—হ্যাঁ।

পাঠকজী—আপনি এই প্রথম দেখলেন, তাই এত আশ্চর্য হয়েছেন। আমি ছমাস ধরে রোজই দেখছি আর শুনছি, তাই আর আশ্চর্য হই না। ওটা একটা চিতল হরিণ। লতার ঝোপের ভিতরে মাথা ঢুকিয়ে খেলা করছে। হরিণটা এই ছমাস ধরে রোজই রাত্রিবেলায় এদিক থেকে ওদিকে যায়।

রামতনু—ওই একই হরিণ? না ভিন্ন ভিন্ন অনেক হরিণ?

পাঠকজী—এই একই হরিণ। দলছাড়া একটা হরিণ একলা ঘুরে বেড়ায় ওর কোন সঙ্গিনী নেই।

রামতনু—হরিণটা এদিক থেকে ওদিকে কোথায় যায়।

পাঠকজী হাসেন।—আমি আর কতটুকুই বা বলতে পারব? ঐ যে গোমস্তা হরেনবাবুর বাড়িতে আপনাকে ডেকেছেন তাঁর স্ত্রী, সেই বাড়িতে গেলেই সব ব্যাপার ঠিক ঠিক জানতে পারবেন।

ছোট ছাড়োয়ার জঙ্গলের একটি সুনাম এই যে, এই জঙ্গলে বাঘের আনাগোনা খুবই কম, নেই বললেই চলে। ওদিকে বড় ছাড়োয়া জঙ্গলেরও একটা সুনাম শিকারীদের প্রাণে প্রাণে আনন্দের গুঞ্জন হয়ে বেজে বেড়ায়। বড় ছাড়োয়ার জঙ্গলে বাঘ গিজগিজ করে। ডোরাকাটা রয়্যাল আর ছোপদার গুলে লেপার্ড, দুই জাতেরই বাঘের ডাকে বড় ছাড়োয়ার বাতাস সারা রাত ধরে গুমরে গুমরে বাজে।

কিন্তু ছোট ছাড়োয়ার হরিণেরা নিরাপদ কেন? বড় ছড়োয়ার জঙ্গল থেকে বের হয়ে ছোট ছাড়োয়াতে ঢুকতে একটা বড় বাঘের পক্ষে বড় জোর দশ মিনিট সময় লাগবে, তার বেশি নয়। পাঠকজী বলেন স্বয়ং ধরিত্রী মাতা ইচ্ছে করে এখানে একটা বাধা সৃষ্টি করে রেখেছে, কোন বাঘ সে বাধা পার হয়ে ছোট ছাড়োয়ার জঙ্গলে ঢুকতে পারে না। ওই যে এখান থেকে মাত্র এক ক্রোশ দূরে দুই জঙ্গলের মাঝখানে যে ছোট নদীটা গড়িয়ে গড়িয়ে শোনের বালিয়াড়ীর কোলে গিয়ে মিলিয়ে গিয়েছে, সেটা শীত গ্রীষ্মের সকল সময় বিচিত্র এক শব্দ করে বাজে,—বল্‌বল্‌ বল্‌বল্‌। টগবগে উষ্ণ জলের অনেক ছোট ছোট উৎস এই নদীর বুকের সব ঠাঁই ছড়িয়ে রয়েছে। কোন জানোয়ার বল্‌বলের জল খেতে সাহস পায় না। বাঘেরা তাই এদিকে আসেই না। তা ছাড়া বর্ষার জলের ঢলে যখন এই ছোট বলবলের স্রোতের বেগ বেশ ভয়াল হয়ে ওঠে, তখন তো বাঘের পক্ষে সমস্যাটা আরও প্রবল হয়ে ওঠে। বর্ষায় বলবলের প্রমত্ত স্রোত পার হতে বাঘেরা সাহস পায় না।

পাঠকজী বলেন—ধরিত্রী মাতার কথা না হয় ছেড়েই দিলেন তশীলদারজী, কয়লাখনির চিমনীর ধোঁয়া, পাথর ভাঙবার কলের ঘড়াং ঘড়াং আর করাতকলের কাঠ চেরাইয়ের ঘ্যাস ঘ্যাস শব্দ হল আর একটা বাধা। ছোট ছাড়োয়ার সীমা বরাবর এই সব খনি আর কারখানার লাইনটা বাঘের পক্ষে খুবই ভয় করবার আর বিরক্ত হবার একটা লাইন। তাই বড় ছাড়োয়ার বাঘেরা দূরে দূরেই থাকে, ছোট ছাড়োয়ার

ভতরে ঢুকতে সাহস পায় না। বিশ্বাস করুন তশীলদারজী, ছোট ছাড়োয়াকে একটা তপোবন বলে ঠাট্টা করলেও তার মধ্যে কিছু সত্য থাকে। এই বনে হরিণের কোন ভয় নেই। আমার বিশ্বাস, হরিণেরা এই বনকে একটা খাঁটি শান্তির ঠাঁই বলে বুঝতে পারে।

চমকে ওঠে রামতনু। বেজে উঠেছে বন্দুকের গুলি ছোড়বার শব্দ। বেশি দূরে নয়, সামান্য দূরে বনের ভিতরে কে যেন বন্দুকের গুলি ছুঁড়ে শান্ত জ্যোৎস্নার থমথমে হাসিটাকে জখম করে শিউরে দিয়েছে।—একী ব্যাপার।

লতানে জবার ঝোপটা আর ছটফট করে না। হরিণটা নিশ্চয় ছুটে পালিয়ে গিয়েছে। পাঠকজী বলেন—দুঃখের কথা কি আর বলবো তশীলদারজী, বাঘেরা এই জঙ্গলের কোন ভয় নয়। এই জঙ্গলের ভয় হলো একজন মানুষ। গোমস্তা সেনবাবুর একটা বন্দুক আছে, একটা দোনলা ম্যাণ্টন আমাদের মালিক, তার মানে এই জঙ্গলের মালিক ঠাকুর সাহেবই সেনবাবুকে এই জঙ্গলে শিকার করবার হুকুমনামা দিয়েছেন।

॥ তিন ॥

আদা ক্ষেতের সীমা যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানের এই কাঁচাবাড়ি অর্থাৎ মাটির দেয়ালের বাড়িটা হলো গোমস্তা হবেন মুস্তাফির বনবাসী জীবনের ঠাঁই, বেশ গরীব রকমের চেহারা নিয়ে একটা ঠাঁই। ঘরের চালার অনেক খড় উড়ে গিয়েছে। বাঁশের খুঁটির অনেকগুলিই হেলে পড়েছে। ছোট একটা উঠোনের চারিদিকে শুকনো ডালের বেড়া। উঠোনের এক কোণে বেশ বড় চেহারার একটা সূর্যমুখী ফুলের ওপর ভোমরা উড়ে বেড়াচ্ছে। আর সূর্যমুখীর ছায়ার মধ্যে দূর্বা ঘাসের উপর একটি প্রাণী শুয়ে রয়েছে, একটা চিতল হরিণী। হরিণীর চকচকে বাদামী রঙের গায়ের উপর সাদার ছিট দেখে মনে হয়, হরিণী যেন বেশ দামী একটা বুটিদার শাড়ি গায়ে জড়িয়েছে।

উঠোনের বেড়ার কাছে এসে রামতনু দাঁড়িয়ে পড়তেই ঘরের ভিতর থেকে বের হয়ে এলেন, প্রায়-প্রৌঢ় এক মহিলা। খুব রোগা আর খুব ফরসা চেহারার এই মহিলা খুব খুশীর স্বরে ডাক দেন—এসো বাবা এসো। আমি কিন্তু জিতরামের মুখ থেকে কথাটা শুনেও বিশ্বাস করিনি যে আমার মত কে-না-কে এক গরীব কাকীমার ডাক শুনে তুমি আসবে। আমি হলাম গোমস্তাপাড়ার তিন বাড়ির সব ছেলেমেয়ের কাকিমা, মনো কাকিমা! আমার নাম মনোরমা। তুমিও বাবা আমাকে মনো কাকিমা বলে ডাকবে।

এইবার মনো কাকিমা যে কথাটা শোনালেন সেটা রামতনুর পঁচিশ বছর বয়সের প্রাণটার পক্ষে সব চেয়ে মায়াময় বিস্ময়ের আবেশে ভরা একটা অদ্ভুত বৃত্তান্তময়

কাহিনী। মনো কাকিমা বলেন : আজ বুঝতে পারছি বাবা, কি ভুলই না করেছি বনের একটা হরিণীকে নিজের রক্তমাংসের সন্তানের মতো একটা সন্তান বলে ম করেছি। নিজের মেয়ের মত মায়া করে পুষেছি, আর বড় করে তুলেছি। আ বুঝতে পারিনি যে, এই মেয়েকে একদিন ছেড়ে দিতে হবে, আবার বনের কোলে ফিরিয়ে দিতে হবে।

রামতনু উঠোনের সূর্যমুখীটার দিকে আঙ্গুল তুলে কথা বলে, ঐ বুঝি আপনা হরিণী মেয়ে।

—হ্যাঁ বাবা বুড়ি, ও বুড়ি, এদিকে আয়। মনো কাকিমার ডাক শু হরিণীটা একটা লাফ দিয়ে উঠে এগিয়ে এল, মনো কাকিমার গা ঘেঁষে দাঁড়ালো।

আবার ডাক দিলেন মনো কাকিমা—ঘরের ভিতরে তুই কি করছিস রে, ওরে মন এদিকে একবার আয় দেখি।

দেখতে বেশ ফুটেফুটে আর লাজুক, এরকম চেহারার একটা ছোট ছেলে ঘরে ভিতর থেকে বেরিয়ে আসে। মনো কাকিমা হাসেন এটা হলো আমার মানুষ ছেলে। শোন তবে সবটা একটু খুলেই বলি। মাত্র কুড়ি দিন বয়সের মনুকে নিয়ে যখন আঁতুড়ে আছি, তখন আমার ওই চাকর জিতরামের শাশুড়ী জঙ্গলের ভিতরে এইটুকু একটা হরিণ-বাচ্চাকে কুড়িয়ে পেয়ে কাক-চিলের ঠোকরের ভয় থেকে বাচ্চাটাকে বাঁচাবার জন্য শাড়ীর আঁচল দিয়ে ঢেকে আর ছুটতে ছুটতে একেবারে আমার আঁতুড় ঘরের দরজার সামনে দাঁড়ালো। বললে, হেই মা, তু যদি না বাঁচাবি তবে এই বাচ্চাটা বাঁচবে না।

—কেন ?

—দেখছো না, হরিণের বাচ্চাটা কত কচি। বুকের দুধ ছাড়া আর কোন কিছু খাওয়ার সাধ্যি নেই ওর। দূর্বা ঘাস নয়, কোন লতাপাতা, নয় ফুলের ছোট্ট একটু পাপড়িও নয়।

—ওর মা কোথা গেল ?

জিতরামের শাশুড়ী বলে—ভগবান জানেন কোথায় গেল! কেউ কেউ বলে গমস্তা সেনবাবুর বন্দুকের শব্দ শুনে ভয় পেয়ে মা-হরিণীটা পালিয়ে গিয়েছে আর ভুল করে একেবারে বড ছাড়োয়ার জঙ্গলে গিয়ে পড়েছে আর বাঘের পেটে চলে গিয়েছে।

মনো কাকিমা বলতে থাকেন—বিছানাতে আমার এ পাশে মনু আর ও পাশে বুড়ি। এইভাবে মানুষের বাচ্চা আর হরিণের বাচ্চা আমার রোগা ডিগডিগে শরীরটার সব মায়া নিংড়ে-শুষে খেয়েছে আর বড় হয়েছে। তখন তো একটুও বুঝতে পারিনি যে, মায়ায় পড়ে হরিণীকে আমার নিজেরই মেয়ে বলে একদিন বোধ করতে হবে।

রামতনু—বোধ তো করেই ফেলেছেন। তবে আর কি ? আর চিন্তা করবা

কি আছে ?

মনো কাকিমা—চিন্তা করার অনেক কিছু আছে বলেই তোমাকে ডেকেছি। একটা পরামর্শের জন্য একটু সাহায্যের জন্য তোমাকে ডেকেছি।

হাতে খেরো বাঁধানো একটা খাতা আধময়লা ফতুয়া আর ধুতি পরা এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক বেড়ার আড় খুলে নিয়ে ভিতরে ঢুকলেন আর উঠোনের ভিতর এসে দাঁড়ালেন। হরিণী বুড়ি সেই মুহূর্তে একটা লাফ দিয়ে সরে গিয়ে আগন্তুক ভদ্রলোকের গা ঘেঁষে দাঁড়ালো। ভদ্রলোক কিন্তু হরিণীটার দিকে একবারও তাকালেন না।

প্রচণ্ড রুষ্ট স্বরে আর চেঁচিয়ে ধমক ছাড়েন মনো কাকিমা—কীরে গোমুখখু মেয়ে তোর লজ্জা করে না ? কিসের আশায় তুই কসাই বাপের গা ঘেঁষে দাঁড়াস ?

মনো কাকিমা তাঁর হরিণী মেয়ে ওই বুড়িকে ধমকাচ্ছেন বটে কিন্তু ধমকের ভাষার মধ্যে যে ধিক্কারটা খুব স্পষ্ট হয়ে বেজে ওঠে সেটা তো হরেনবাবুরই বিরুদ্ধে একটা কঠোর ভর্ৎসনার কর্কশ ধ্বনি। কিন্তু হরেনবাবু যেন এই ভর্ৎসনার একটি শব্দও শুনতে পাচ্ছেন না। তাঁর চোখে মুখে যেন অবিকার এক পরম নির্লেপের প্রলেপ। কাশলেন হরেনবাবু, ফতুয়ার পকেট থেকে একটা বিড়ি বের করে ধরালেন, লম্বা-লম্বা সুখটান দিয়ে আরামের ধোঁয়া ছাড়লেন। তারপর উঠোনের ওদিকের একটা ঘরের ভিতর ঢুকে চৌকীর উপর বসলেন। ঘরের চেহারা একটা খোঁয়াড়ের মতো। আর চৌকীটা হলো চার কোণে চার থাক ইঁটের উপর বসানো একটা তক্তা।

মনো কাকিমা বলেন—দেখলে তো রামতনু, নিজের চোখেই তো দেখলে, লোকটা কত অভদ্র। তোমাকে দেখেও তোমার সঙ্গে দুটো কথা বলে একটু আলাপও করলো না।...এই, এই সমস্যারই হেস্তনেস্ত করবার জন্য তোমার সাহায্য চাই।

রামতনু—আমি এর মধ্যে আপনাকে কীভাবে ও কেমন করে কী সাহায্য করতে পারি ?

মনো কাকিমা—তুমি ওকে প্রতিজ্ঞা করাও, কবুল করাও যে, মেয়ের কথাটা একটু চিন্তা করবে, আর, আরও বড় কসাই ওই সেনবাবুর সঙ্গে কোন সম্বন্ধ রাখবে না। কাঁচুমাচু হয়ে সেনবাবুর সঙ্গে কথা বলবে আর বিড়ি খাবে, সে আর চলবে না। তারপর, তোমাদের মালিক ঠাকুর সাহেবকে বলে সেনবাবুকে শাসিয়ে দাও, এই জঙ্গলে তার আর হরিণ শিকারের আমোদ চলতে দেওয়া হবে না।

রামতনু—আমাকে ক্ষমা করুন কাকিমা, এসব করবার কোন ক্ষমতা আমার নেই !

মনো কাকিমার দুই চোখ এইবার ছল-ছল করে।—শুনলে তুমি অবাক হবে, রামতনু। বুড়ি একদিন সেনবাবুর বাড়ির উঠানে পুঁইমাচার উপর দুই পা তুলে দিয়ে, এই বড়জোর সাত-আটটা পাতা খেয়েছিল। তাই দেখে শুধু একা সেনবাবু নন, তার ওই ধাড়ি মেয়ে নীতাও সপসপ করে বেত চালিয়ে বুড়িকে মেরেছে। বুড়ির ঠোঁটের মাঝখানটা কেটে গিয়ে রক্ত ঝরে পড়েছে। যাই হোক, আমি ওদের

দোষ দিই না। আমি বলি এই কসাই বাপই আসল দোষী। যদি রোজ বুড়ির জন্য দু পয়সার ছোলা কিংবা মটর কিনে এনে বুড়িকে খেতে দিত, তবে বুড়ি এরকম হ্যাংলা হয়ে পরের বাড়ির পুঁই মাচাতে মুখ লাগাতো না।

রামতনু—আমি একটা কাজ করতে পারি, কাকিমা। বুড়িকে খাওয়াবার জন্য আমাদের সরষে খামার থেকে কিছু সরষে শাক আপাতত একটা-দুটো মাস রোজই আনিয়ে দিতে পারি।

মনো কাকিমা জোরে একটা নিঃশ্বাস ছাড়েন। —তাই দিও। কিন্তু আসল সমস্যা এখন তা নয়, রামতনু।

—আসল সমস্যাটা কী?

মনো কাকিমা—বুড়ি বড় হয়েছে। ওর একটা গতি করে দেবার দায় আছে। ওকে চিরটাকাল আমার কাছে রেখে ওর ভাগ্যটাকে বঞ্চিত করে রাখা যে খুবই অন্যায় কাজ, সেটা তোমাকে বুঝিয়ে না বললেও নিশ্চয় বুঝবে।

হেসে ফেললেন মনো কাকিমা, অবার আঁচলের খুঁট তুলে দুই চোখ মুছতেও থাকেন।—আমি এই কথাই বলছি, বুড়িকে এখন পাত্রস্থ করতে হবে তো। আমার একটা মানুষ মেয়ে থাকলে তাকেও তো পাত্রস্থ করতে হতো।

রামতনু—তাহলে কি করতে চান? বুড়িকে একদিন মুক্তি দিয়ে জঙ্গলের ভিতরে ছেড়ে দিলেই তো পারেন।

মনো কাকিমা—না রামতনু, তা হয় না। সেটা হবার নয়। একটা হরিণ আজ ছ'মাস ধরে রোজই রাত্তিরে এখানে এসে বেড়ার কাছে দাঁড়িয়ে থাকে কখনও আমাদের চোখে পড়ে, কখনও পড়ে না। কিন্তু রোজ রাতে ঘরের ভিতরে বুড়ির ব্যবহারের রকম-সমক দেখে বুঝতে পারি, হরিণটা এসেছে, নিশ্চয় বেড়ার কাছে এসে দাঁড়িয়ে আছে। ঘরের ভিতরে বুড়ি ছটফট করে বন্ধ দরজার গায়ের উপরে মাথা ঘষতে থাকে, বুঝতে পারি বাইরে যেতে চাইছে বুড়ি।

রামতনু—বুড়ীকে ছেড়ে দিলেই তো পারেন।

মনো কাকিমা—তাও করে দেখেছি। বেড়া খুলে রেখে বুড়িকে ছেড়ে দিয়েছি। কিন্তু বুড়ি শুধু বেড়ার কাছ পর্যন্ত গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, বাইরে চলে যায় না।

—কেন?

মনো কাকিমা—বলতে পারি না, রামতনু। বুঝতে পারি না বুড়ির ইচ্ছাটা কি? আমার এই এক জ্বালা ঠিক ঠিক কিছুই বুঝতে পারছি না।....আমার মনে হয় ভিকু যা বলে সেটাই ঠিক।

—কে?

মনো কাকিমা—গোমস্তা বলদেববাবুর ছেলে ভিকু। মাস তিন আগে বলদেববাবুর মেয়ের বিয়ে হয়ে গিয়েছে। ভিকু বলে, আমার দিদির যেমন ঘটা করে বিয়ে হয়েছে, বুড়ির বিয়েতেও সেরকম ঘটা করতে হবে। ভদ্রলোকের বাড়িতে যেরকম

করে মেয়ের বিয়ে দেওয়া হয়, বুড়িকেও সেই রকম করে বিয়ে দেবার ব্যবস্থা করা হবে, তবে তো বুড়ি চলে যেতে চাইবে। একটা বুনো প্রাণী বলে কি ওর প্রাণে কোন ইয়ে নেই।

রামতনু এইবার হেসে হরিণী-বোনের মানুষ-ভাই মনুর মাথায় হাত বুলিয়ে প্রশ্ন করে।—বুড়ির বিয়ে দেবার দেবার জন্য কি করতে হবে বলো তো খোকা।

মনু মুখ টিপে অদ্ভুত এক লাজুক হাসি লুকিয়ে আস্তে আস্তে যে-কথা বলে, সেটা একটা উৎসবের পরিকল্পনার কথা। যে শুনবে তাকে উৎকট রকমের একটা কৌতুকের আবেগ দিয়ে হাসিয়ে দেবার মত কথা। মনু বলে ভিকুদা বলছিল, রঙ্গোলি আঁকতে হবে, শাঁখ বাজাতে হবে, বুড়ির কপালে চন্দনের টিপ দিতে হবে।

রামতনু—খুব খাঁটি কথা বলেছে ছেলেটা, মনুর বন্ধু ভিকু।

মনোকাকিমা—কিন্তু ওসব করলে বন্দুকধারী বর্বরটা টের পেয়ে যাবে, বুঝে ফেলবে যে হরিণটা এসে দাঁড়িয়ে আছে। তখুনি তেড়ে আসবে আর গুলি ছুঁড়ে হরিণটাকে মেরে ফেলবে। এই দু'মাস ধরে সেনবাবু এই চেষ্টাই করে আসছে।

রামতনু—তবে, কি যে বলবো বুঝতে পারছি না। তবে এটুকু করতে পারি। সেনবাবুকে খুব অনুরোধ করে বলতে পারি, আপনি দয়া করে হরিণটাকে মারবেন না।

॥ চার ॥

হো হো করে হেসে উঠলেন সেনবাবু।—তুমি বোধহয় জানো না যে, হরিণের মাংসের কাবাব খেতে কত ভাল লাগে। বিশেষ করে সামনের দিকের রাং আর সনার মাংসের স্বাদ কাবাবে সবচেয়ে ভাল খোলে। আমি আজ ছ'মাসের মধ্যে অন্তত সাতবার ঘোর রাতের অন্ধকারের মধ্যেই ঐ ব্যাটা লম্পট হরিণটার ওপর গুলি চালিয়েছি। কিন্তু প্রত্যেকবারই ব্যাটা পালিয়ে যেতে পেরেছে, একটুও ঘায়েল হয়নি।

রামতনু—আমার মনে হয় আপনার মত বিজ্ঞ মানুষের পক্ষে জঙ্গলের হরিণ-টরিন শিকার করবার শখ ছেড়ে দেওয়াই ভাল।

সেনবাবু—বেশ তো ধরে নাও ছেড়েই দিলাম। তারপর কি করব? আদাক্ষেতের যত কেন্নো আর কেঁচোগুলিকে শিকার করবো হ্যাঁ একটা কথা জিজ্ঞেস করি, তুমি কি লাতেহার অয়েল মিলের সামন্তবাবুকে চেনো?

—না।

—কম করে তিন লাখ টাকা জমিয়েছেন সামন্তবাবু। তাঁরই একমাত্র ছেলে রতন সামন্ত শিগ্‌গিরই আমাদের জামাই হবে। আরও একটা কথা। নীতা সামন্ত নামে একটি মেয়ে কলকাতার একটা বড় কম্পিটিশনের আসরে ঠুংরী গেয়ে মেডেল পেয়েছে, এ খবরটাও কি কখনো শুনতে পাওনি?

—না।

—আমারই মেয়ে নীতা। কলকাতাতে মামারবাড়িতে থেকে পড়াশুনা করেছে আর ম্যাট্রিক পাশ করেছে। এখন এখানে আমাদেরই কাছে থাকে গানের চর্চা ক'রে দিন পার ক'রে দেয়। নীতাকে সেই গানের কম্পিটিশনের আসরে প্রথম দেখতে পেয়ে রতন সামন্ত তখুনি নীতাকে পছন্দ করে ফেলেছিল। সেই রতনকে তুমিও হয়ত দেখেছ। প্রতি সপ্তাহে একবার না হোক, প্রতি মাসে তিনবার লাতেহার থেকে মটরসাইকেল ছুটিয়ে আমার এখানে আসে রতন সামন্ত। এখানে চা খায় আর নীতার গলায় ঠুংরী শুনে আবার লাতেহার ফিরে যায়।

কাছেই দাঁড়িয়েছিলেন গোমস্তা বলদেব প্রসাদ। তিনি একেবারে খোলাখুলি ভাষায় ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিলেন!—লাখপতির ছেলে কিন্তু এই গোমস্তাবাড়ির নীতাকেই বিয়ে করবার জন্য যেন প্রতিজ্ঞা করে বসে আছে। তাই সে এখানে এই ছ'মাস ধরে বার বার আসছে। বেচারা তো ভালবাসারই টানে ছুটে আসছে। ভালবাসা এমনই জিনিস। আর আমাদের এই সেনবাবুর বাড়ির ভাগ্য ও তাঁর মেয়ের ভাগ্য দেবতার কৃপার মত আশ্চর্য জিনিস।

সেনবাবু—তোমাকে দেখে আমার মনে আর একটা শখ যেন প্রতিজ্ঞারই মত চেপে বসছে, রামতনু। নীতার বিয়ের দিনে যেন জামাই রতন সামন্তকে আর তসীলদার রামতনুকে টাটকা শিকার-করা হরিণের মাংস খাওয়াতে পারি। গর্দানের মাংসের সঙ্গে কিসমিস মিশিয়ে একটা মিষ্টি রকমের কারি হবে, আর পেছনের দুই টেংরীর মাংস দিয়ে রোষ্ট। শিরদাঁড়ার নরম দিকটার মাংস দিয়ে তৈরী করব সামান্য একটু টক মেশানো ভিন্দালু।

কথার আবেগের সঙ্গে একটা চমৎকার গর্বের আবেগ মিশিয়ে দিয়ে হেসে ফেললেন সেনবাবু।—জঙ্গলে থাকতে হলে বাঘের মেজাজ নিয়ে থাকতে হয় আর খেতে হয়, রামতনু। দেখেছো তো, আমার ষাট বছর বয়সের চেহারাটা কত শক্ত। আর আমার চেয়ে দশবছর বয়সের ছোট হরেনের চেহারাও তো দেখেছো। কি বিশ্রী রোগা ও দুর্বল, একটা রাবিশ চেহারা। হরেনগিন্নীর চেহারাখানাও তো দেখেছো। কি আর বলবো, সত্যি কথা বললে ভালো শোনাবে না, যেন ডিগডিগে এক খ্যাংরা সুন্দরী।

পাশের ঘরের ভিতরে দুই মেয়েলী হাসির স্বর বেশ জোরে বেজে উঠলো। বেশ মোটা স্বরের হাসির সঙ্গে একটা পাতলা স্বরের হাসি। বুঝতে অসুবিধা হয় না রামতনুর, নিশ্চয় মা ও মেয়ের হাসি।

সেনবাবু—শুনলে তো, ওরাও না হেসে থাকতে পারলো না। যাই হোক, একটু কাণ্ডজ্ঞান ওদের আছে তো। একটা পোষা হরিণকে মেয়ে মেয়ে বলে চেঁচামেচি করে লোক হাসিয়ে লাভ কী? হরেনগিন্নীর কথায় আর ব্যবহারে একটা ন্যাকামি মার্কা আহ্লাদ এই ছ'মাস ধরে যেন উথলে উঠছে। হরিণী মেয়েকে নাকি পাত্রস্থ

করতে হবে, পছন্দমত একটা পাত্রও পাওয়া গিয়েছে। এই ছ'মাস ধরে সেই পাত্র নাকি প্রায় রোজই রাত্তিরে আসে আর হরেনের বাড়ির উঠোনের দিকে তাকিয়ে থাকে! মাথাতে এক ঝাড় শিং, সেই পাত্র নাকি হরেনের বাড়ির পোষা হরিণীটাকে খুব পছন্দ করে ফেলেছে।

ঘরের ভিতরে আবার মা ও মেয়ের মিলিত হাসির শব্দ যেন একটা ঠাট্টার উল্লাসের মত ভঙ্গিতে কেঁপে কেঁপে বাজতে থাকে।

হরেনবাবু—তুমি বলো, এটা কি একটা নির্জলা মিথ্যের আষাঢ়ে গল্প নয়। ছোট ছাড়োয়ার একটা বুনো হরিণ, একটা জন্তু। সেটাও যেন আমাদের······এই এই ইয়ের মত একটা মানুষ।

গিরিধরবাবু কিন্তু চেঁচিয়ে হেসে ওঠেন আর চেঁচিয়ে কথা বলেন—নেহি নেহি। কভি নেহি। জঙ্গলের জানোয়ার কখনো মানুষের মত, যেমন আমাদের লাতেহারের নওজোয়ানের মতো লাভার হতে পারে না। লাভ্ হলো তো হলো, না হয় না হলো, জন্তু তার জন্তুনীকে ছেড়ে দেবেই দেবে।

ঘরের ভিতরে আবার দুই মেয়েলী হাসির মিলিত উচ্ছ্বাস কলকল করে বেজে ওঠে।

রামতনুর মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করেন সেনবাবু—বলো এইবার, যা বলতে চাও তুমি।

রামতনু—আমার যা বলবার তা তো বলেইছি।

সেনবাবু—আমিও তো আমার যা বলবার ছিল সবই বলেছি। আমি হরিণ শিকার না করে পারবো না।

রামতনু—আচ্ছা, আমি তবে যাই।

সেনবাবু—যাই না, বলো আসি। আশা করছি এই ফাল্গুনের মধ্যেই আমার নীতুর বিয়ের নেমতন্ন তুমি পেয়ে যাবে।

মনোকাকিমার ভয় দূরে যাবে এমন একটি কথাও সেনবাবুর কাছ থেকে আদায় করা গেল না। নিজের কাছারীতে ফিরে যাবার পথে আদা ক্ষেতের কিনারা ধরে চলতে চলতে রামতনুর হতাশ মনের ভার যেন আরও ভারী হয়ে ওঠে। হঠাৎ মনোকাকিমারই ডাক শুনে চমকে ওঠে রামতনু—একবার এসে শুনে যাও রামতনু।

মনোকাকিমা হাসছেন দেখে রামতনু খুশি হয়। মনো কাকিমা একটা মস্ত খুশির কথা শোনালেন। আজই বুড়ীকে পাত্রস্থ করা হবে। যে-কথার সোজাসরল অর্থ হল বুড়িকে ছেড়ে দেওয়া হবে। মনোকাকিমার ইচ্ছে আর আশা পূর্ণ করে দিয়ে তাঁর হরিণী মেয়েটি তার পছন্দের পাত্রটির সঙ্গে ছোট ছাড়োয়ার জঙ্গলের গভীরে, কে জানে কোথায় কত গভীরে চলে যাবে।

মনোকাকিমার গলার স্বরটা বড়ই করুণ।—তুমি ঠিক জানো তো বাবা, এই জঙ্গলে বাঘটাঘ নেই।

রামতনু—তাই তো শুনেছি। সবাই তো তাই বলে।

মনোকাকিমা—কষ্ট করে আজ রাত্তিরে তুমি একবার এসো বাবা। আজ বুড়িকে বিদায় করে দেবো। তাই তোমাকে যেমন করে হোক একটা শক্ত কা করতে হবে। তুমি নজর রাখবে আর দেখতে পেলে বাধা দেবে, ভয়ানক মেজাজে সেনবাবু যেন বন্দুক নিয়ে তেড়ে আসতে আর গুলি চালাতে না পারে।

রামতনু—তা আমি নিশ্চয়ই দেখবো।

মনোকাকিমা—দেখ রামতনু নিজের চোখে একবার দেখে নাও। কসাই বা কেমন নির্বিকার হয়ে আর আরাম করে বিড়ির পর বিড়ি খেয়ে চলেছে। সবই শুনেছে আর সবই জেনেছে ওই গোমস্তা মশাই, তবু ওর চোখে মুখে ও কথায় মধ্যে একটুও কি মায়া দেখতে পাওয়া গেল? একটুও না। বুড়ি আজ রাত্তিরে বিদায় হবে শুনতে পেয়ে জিতরামের শাশুড়ীর মত বাইরের একটা মানুষ তবু বুড়ির জন্য এক গাদা পাকা ডুমুর দিয়ে গিয়েছে। কিন্তু তোমার ঐ অদ্ভুত স্বভাবে কাকাবাবু কি বুড়ির জন্যে দু-চারটে বটপাতাও এনে দিয়েছে? না কিচ্ছু না। বি নিরেট প্রাণ, তার মধ্যে একটুও মায়া-মমতার ছোঁয়াচ নেই। হোক না একট হরিণী তবু সে তো তোমারই ঘরের পোষা একটা জীব। বললে তুমি বিশ্বাস করবে না রামতনু, আজ এখনো বুড়ির দিকে একটিবার একটু মায়া করে তাকায়নি পর্যন্ত ঐ মানুষটা। যাই হোক তুমি কিন্তু ভুলে যাবে না। অবিশ্যি আজ রাত্তিরে একবার আসবে।

॥ পাঁচ ॥

ব্যবস্থা মন্দ নয়। যে রকম ব্যবস্থা চেয়েছিল মনু, সেই রকমই ব্যবস্থা করেছে ভিকু আর মনু। মনু নিজের হাতে বুড়ির মাথাতে লাল চন্দনের একটা টিপ এঁকে দিয়েছে। উঠোনের ওপর বেশ বড় করে একটা রঙ্গোলি এঁকেছেন মনো কাকিমা। আর উঠোনের বেড়ার একদিকের তিনটে আড় বাঁশ নামিয়ে দিয়ে বুড়ির চলে যাবার পথ একেবারে অবাধ ও মুক্ত করে দিয়েছে মনু। ভিকুর হাতে একটা শাঁখও আছে। ভিকু বলে, বাঙালীর বিয়েতে শাঁখ বাজাতে হয়।

কিন্তু ঠিকই মনোকাকিমার রাগ দুঃখ আর অভিযোগ একটুও মিথ্যে নয়। হরেনবাবু তাঁর ঘরের ভিতরে সেই তক্তার উপরে বসে বিড়ি খাচ্ছেন। ভিকু যে একটা ময়লা চেহারার লণ্ঠনকে সূর্যমুখীর কাছের ছোট আমগাছের ডালে ঝুলিয়ে দিল সে দৃশ্যটাও যেন হরেনবাবুর চোখে একটা নতুন কিছু বলে বোধ হচ্ছে না। উঠোনের উপর এই রকম একটা ব্যস্ততার দৃশ্যকে যেন দেখবার মত একটা বস্তু বলেই মনে করছেন না হরেনবাবু। মনোকাকিমা বিড় বিড় করেন—ওর কাছে বুড়ি তো চিরকালই একটা আপদ বলে বোধ হয়েছে। লোকটা চিরকাল মনে মনে এই

কামনাই করে এসেছে, বুড়ি যেন বাঘের কিংবা বনডাইনীর কামড় খেয়ে মরে যায়।

রামতনু—যাক এসব কথা এখন আর বলবেন বা।

চুপ করলেন মনোকাকিমা। একেবারে নিথর নিশ্চুপ একটা অবসন্ন মূর্তি, দাওয়ার খুঁটির গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন।

ওদিকে রাত বাড়ছে। ছোট ছাড়োয়ার সব সেগুন আর ইউক্যালিপটাসের পাতার বুকে যেন উতলা হাওয়ার গান বাজতে শুরু করেছে। সেই হাওয়ার গায়ে গায়ে খুব মিষ্টি একটা সুগন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছে।

চমক লাগবার মত একটা দৃশ্য বটে। দেখে সত্যিই চমকে ওঠে রামতনু। একটা হরিণ এসে উঠোনে বেড়ার বন্ধন খোলা অবাধ পথের কাছে দাঁড়িয়েছে। মাথার এক ঝাড় শিং-এর সঙ্গে আটক হয়ে জংলী লতাপাতার দুটো লম্বা লম্বা টুকরো ঝুলছে।

ফুঁপিয়ে কেঁদে ফেলেন মনোকাকিমা। —না দেখলে তুমি তো বিশ্বেস করতে না রামতনু। এইবার দেখে নাও, আমাদের বুড়ির বর যে সত্যিই রাজপুত্তুরের মতো মালা নিয়ে এসেছে।

ভিকু শাঁখ বাজালো। চলে গেল বুড়ি। ছুটে চলে গেল। হরিণ বর আর হরিণী কনে সেই মুহূর্তে ছোট ছাড়োয়ার অন্ধকারের মধ্যে উধাও হয়ে গেল। রঙিন রঙ্গোলির কাছে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে উঠলো মনু—বুড়ি চলে গেল মা, সত্যি চলে গেল।

যাক সবই ভালয় ভালয় হয়ে গেল। সেনবাবু নিশ্চয় এই বাড়ির এই উৎসবের কোন সাড়া শুনতে পান নি। জঙ্গলের হরিণটাকে মারবার জন্য দোনলা ম্যান্টন হাতে নিয়ে তেড়ে আসেন নি। রামতনুরও কোন ঝামেলা সহ্য করবার দরকার হলো না।

আঁচল দিয়ে দুই চোখ চেপে অনেকক্ষণ এক ঠাঁই দাঁড়িয়ে রইলেন মনোকাকিমা। হঠাৎ এই গরিব চেহারার ও মেটে দেয়ালের ছোট বাড়িটাই যেন একটা বুক ফাটা চিৎকারের মত শব্দ করে কেঁদে উঠলো। কি আশ্চর্য কি ব্যাপার, চলে যেতে গিয়েই থমকে দাঁড়ায় রামতনু। কে, কে অমন করে কেঁদে উঠলো।

ছোটো ঘরের ভিতরে তক্তার উপর বসে সেই নির্বিকার হরেনবাবু তাঁর দুই হাত দিয়ে বুকটাকে চেপে রেখে আর আকুল হয়ে কাঁদছেন। মনোকাকিমাও আশ্চর্য হয়েছেন। চোখের উপরচাপা আঁচল সরিয়ে দিয়ে ছোট ঘরের তক্তার উপর হরেনবাবুর কান্নায় ভেঙে পড়া মূর্তিটার দিকে তাকিয়ে থাকেন। এ আবার কি ব্যাপার? মানুষটা কাঁদে কেন? কি হলো যে অমন করে কাঁদতে হবে।

বুঝতে পারা যায় বেশ অপ্রস্তুত আর আশ্চর্য হয়েছেন মনোকাকিমা।

হঠাৎ আবার চমকে ওঠে রামতনু। বেশ শক্ত হয়ে দাঁড়ায়। বুঝতে পারে সব শেষে সেনবাবুর সঙ্গে একটা ঝামেলা করতেই হবে। হরিণটাকে মারবার জন্য বন্দুক হাতে নিয়ে তেড়ে আসছেন সেনবাবু, যদিও হরিণ চলে গিয়েছে, হরিণটাকে

শিকার করবার বা না করবার কোন প্রশ্ন এখন আর নেই। তবু সেনবাবু তাঁর স্বভাবের আর মেজাজের অহংকারে একটা ঝামেলা নিশ্চয়ই বাধাবেন। সেনবাবুর সঙ্গে কথা কাটাকাটি হবেই হবে, হয়ত হাতাহাতিও হবে।

এই দৃশ্যটা আরও অদ্ভুত। দুই চোখ অপলক করে দেখতে থাকে রামতনু। সেনবাবুর হাতে বন্দুক নেই। তিনি বাঘের মেজাজ নিয়ে তেড়েমেড়ে আসছেন না। খুব আস্তে আস্তে হেঁটে আসছেন। যেন একটা চরম ক্লান্তির ভারে অলস হয়ে গিয়েছে তাঁর প্রাণ আর শক্তপোক্ত ঐ শরীরটাও।

হরেনবাবুর বাড়ির উঠোনের ওপর উঠেই অদ্ভুত কথা বলেন সেনবাবু, মেয়েকে বোধহয় বিদায় করা হয়েছে ?

রামতনু—হ্যাঁ।

সেনবাবু—আঁ, হরেন বুঝি খুব কাঁদছে ? আমি জানি মেয়ে বিদায়ের সময় বাপেরই বেশী কষ্ট হয়। মায়ের চেয়ে বাপই বেশি কাঁদে।

ছোট ঘরটার ভিতরে ঢুকে সান্ত্বনা দেবার জন্য হরেনবাবুর একটা হাত ধরে চুপ করে বসে রইলেন সেনবাবু। যেন তিনি হরেনবাবুকে সান্ত্বনা দেবার কোন ভাষা খুঁজে পাচ্ছেন না।

অনেকক্ষণ পরে একটা রাতপাখি অনেকক্ষণ ধরে ডাকাডাকি করে চলে যাবার পর হরেনবাবুর কান্না শান্ত হলো।

এইবার সেনবাবু হেসে ফেললেন—আমার খুব শিগগির মেয়ে বিদায়ের কান্না কাঁদবার সৌভাগ্য হবে না।

রামতনু এ কথা বলছেন কেন ?

সেনবাবু আজই বিকেলে একটা চিঠি পেলাম। লাতেহার থেকে আমার নিবারণ ভাইপো লিখেছে, রতন সামন্তর বিয়ে হয়ে গেল! কলকাতার এক আটর্নীর মেয়ের সঙ্গে রতনের বিয়ে হয়ে গিয়েছে।

রামতনু শুনেছিলাম, এই রতন সামন্ত আপনাদেরই পছন্দের পাত্র, আর আপনার মেয়ে নীতা হলো রতন সামন্তর পছন্দর পাত্রী। কিন্তু কই ? এটা আবার কি হয়ে গেল ? ব্যাপারটা এরকম করে উল্টে গেল কেন ?

এইবার চমকে উঠলেন হরেনবাবু, সেনবাবুর একটি হাতকে দু' হাত দিয়ে, আঁকড়ে ধরেন।—খুব দুঃখ করবেন না দাদা।

সেনবাবু—না, না, আর দুঃখটুঃখ বোধ করে কোন লাভ নেই। এরকমটা হয়েই থাকে।

রামতনু—শুধু মানুষেরই স্বভাবে ও ব্যবহারে এরকমটা হয়ে থাকে, কাকাবাবু। জঙ্গলের হরিণ-টরিণের স্বভাবে নয়; ব্যবহারেও নয়।

সেনবাবু—ঠিক, তুমি খুব ঠিক কথা বলেছ রামতনু।